আত্মকথা ১৯৭১

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৭১

নজরুল ইসলাম শাহ্
স্মরণে

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল।
জিঞ্জিরায় গণহত্যা চলাকালে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।
কুমিল্লার নির্জন কবরে সে এখন চিরনিদ্রায় শায়িত।
আজ সে স্মৃতি। শুধুই স্মৃতি।

উপক্রমণিকা

এক, নয়, সাত, এক। ১৯৭১। মাঝে মাঝে আমি খুব অবাক হয়ে অংকশাস্ত্রের এই চারটি বাংলা সংখ্যা দ্বারা সূচিত সময়খণ্ডকে মহাকালের ভিতর থেকে পৃথক করে আমার অনুভবের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করি। সারা পৃথিবী জানে, বাংলাদেশের আকাশ, বাতাস ও মৃত্তিকা-জল জানে; ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক সাক্ষী– ১৯৭১ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্মসাল।

কী সৌভাগ্য আমার, আমি বাংলাদেশকে আমার চোখের সামনে জন্মাতে দেখেছি। এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তেই শত শত মানব শিশুর জন্ম হয়। কিন্তু একটি দেশের জন্ম তেমন সহজে হয় না। পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে প্রায় ৬০০ কোটির মতো সেখানে এই ভূমণ্ডলে দেশের সংখ্যা মাত্র দুই শ'র কাছাকাছি। তাই একটি দেশের জন্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। এখানে দেশ বলতে আমি স্বাধীন দেশকেই বুঝাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ শাসন কবলিত পরাধীন ভারতে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর মরণপণ আন্দোলন তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া স্বাধীন ভারত তিনি দেখে যেতে পারেননি। ভারতীয় বা বাঙালি হিসেবে নয়, ১৯১৩ সালে তিনি কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পোয়েট হিসেবে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান প্রায় দুই শ' বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্ব-শাসনের অধিকার লাভ করে ১৯৪৭ সালে। তার ছয় বছর আগে ১৯৪১ সালে বিশ্বকবির মৃত্যু হয়। এই একটা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আমি নিজেকে নিশ্চিত-কারণে সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে পারি। বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নিঃস্বকবিসম্রাট হয়েও আমি সেই অপার সৌভাগ্যে সিক্ত হয়েছি।

আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...। ভাবতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো এক অনির্বচনীয় অজানা আবেগে শিহরিত হয় প্রাণ। মানুষের জন্মসময় যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই ঈশ্বরকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। হা ঈশ্বর, আপনার উদ্দেশে জানাই আমার চিরপ্রণতি।

সাল বিচারে আমার জন্মের সূচক সংখ্যাটি হচ্ছে ১৯৪৫। ১৯৭১-এর মতো, এই সংখ্যাটিও আমার খুব প্রিয়। আমি জানি, মানুষ হিসেবে আমার জন্ম না হলে, পাকিস্তান নামক নব্য-কলোনির আগ্রাসন থেকে মুক্তিলাভের মাহেন্দ্র মুহূর্তটিকে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। আমার হাজার বছরের জাতি-সত্তার ভয়ঙ্কর সুন্দর মুক্তিসংগ্রামের এই সাফল্যকে আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। আমি যে তা পেয়েছি, সে যে আমার কতো বড় গর্ব! সে যে আমার কতো বড়ো আনন্দের ধন! এ যে আমার কতো বড়ো পাওয়া!

পৃথিবীর খুব কম কবির ভাগ্যেই জোটে স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারার দুর্লভ সুযোগ। আর তার সফল পরিসমাপ্তি নিজ চোখে দেখার সুযোগ তো জোটে আরও কম কবির ভাগ্যে। আমি সেই সৌভাগ্যবান, হাতে গোণা বিরল কবিদের একজন। এই আনন্দকে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, এই বিষয়টি উপলব্ধিতে আসতেও অনেক সময় চলে যায়। বর্তমান রচনাকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার পূর্বে আমিই কি আমাদের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের সফল পরিণতিতে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা লাভের বিষয়টির অন্তর্নিহিত গোপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলাম? না পাইনি। ফুলকে দেখা যায় চোখ দিয়ে, কিন্তু তার গন্ধ তো দেখা যায় না। সে হাওয়ার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে বেড়ায় ফুলের চারপাশে। ১৯৭১ সালটিও আমার কাছে তেমনি একটি ফুল। তার চারপাশে কাঁঠালিচাঁপার মৌ মৌ করা গন্ধ।

আসলে স্বাধীনতা জিনিসটার দুটো আস্তর আছে, এর একটি আমাদের বহির্জীবনকে বিন্যস্ত করে; সে সমৃদ্ধ করে আমাদের বৈষয়িক জীবনকে। তাঁর দ্বিতীয় আস্তরটি অন্তর্মুখী, দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় অতোটা, কিন্তু আমাদের চিত্তকে সে-ই নিত্য শুদ্ধ করে চলে। তার মাতৃছায়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের ভাবজগত। ভাষার সাহায্যে সেই অনুভূতির যথার্থ প্রকাশ অসম্ভব। সন্তানের জন্মের পর জনক-জননীর যে আনন্দ, আমার আনন্দও তারই কাছাকাছি। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর মুখে যা মানাতো, মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে, তাঁর কণ্ঠের অমূর্ত ভাষায় বলি, 'আমি বাংলাদেশকে জন্মাতে দেখেছি। বাংলাদেশ আমার সন্তান।' ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম খণ্ড বলি 'আমার ছেলেবেলা'কে) 'আমার কণ্ঠস্বর' পড়ে কেউ কেউ আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আমার আত্মজীবনী রচনা অব্যাহত রাখি। আমার প্রকাশকও আমাকে অনুরোধ করেছেন তৃতীয় খণ্ডটি লেখার জন্য। কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি জানি আমার প্রকৃতি। আমি অলস গোত্রের মানুষ। 'আমার কণ্ঠস্বর' লেখার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বাংলা একাডেমীর পুরনো পত্র-

পত্রিকা ঘেঁটে আমার বুকে 'কফ' জমে গিয়েছিল। হাই পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক খেয়ে সেবার কোনোক্রমে জীবনটা বাঁচিয়েছি। হলফ করেছিলাম আর নয়। এটা আমার কাজ নয়। এটা ইতিহাস রচয়িতাদের কাজ। যার কাজ তারে সাজে। আমি কবি। আমি লাঠি হতে যাবো কেন? ইতিহাসনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনায় আমি বাধ্য নই। আমার কণ্ঠস্বরের ভূমিকায় আমি বলেছি সে-কথা।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনটি, ভবিষ্যতে যদি কখনও একটি ভুল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত না হয়; তা হলে, আমার এই দাবি অবশ্যই গ্রাহ্য হবে যে, আমার যৌবন এই বঙ্গীয় ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর জীবন ও মৃত্যুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময়কেই প্রত্যক্ষ করেছে। খ্রিষ্টিয় সময়-রীতি অনুসারে যদি ঐ সময়কে চিহ্নিত করি, তাহলে ১৯৬৬—১৯৭১, এই অর্ধদশক-ব্যাপ্ত সময়কেই আমি বলব আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সময়।

এই সময়খণ্ডের শুরু ১৯৬৬ থেকে বলব এজন্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ বছরই বাঙালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা ক'রে এমন এক আণবিক সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, যা লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে, রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই ভূখণ্ডকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।

শিশুর জন্মের আবশ্যিক পূর্ব-শর্তগুলো যেমন মাতৃদেহের নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনি একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের লক্ষণগুলোও দৃশ্যমান হতে শুরু করে সমাজরূপী মাতৃদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সমাজরূপী মাতৃদেহের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনসমূহ যে শিল্প-প্রত্যঙ্গে সবচেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে, তার নাম কাব্য। মানবজাতির ইতিহাস আর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস তাই এমন অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের ষাট দশকের কাব্য-আন্দোলন আর আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল তাই মূলত একই আন্দোলনের অভিন্ন প্রকাশ।

'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি যখন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিষয়ক এই লেখাটি লিখতে শুরু করেছিলাম— তখন আমার সামনে স্মৃতি ছাড়া আর কোনো প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। ভেবেছিলাম কয়েক পাতার মধ্যেই আমি আমার লেখাটি শেষ করব। কিন্তু নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিখতে লিখতে, পেছনে ফেলে আসা ধূসর স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে কীভাবে যে আমার সময় চলে যায়, আমি টেরই পাইনি। লেখাটি

ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। আমি আমার ভিতরে কবির পাশাপাশি একজন ইতিহাসবিদের অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইতিহাস প্রণেতার একাডেমিক প্রশিক্ষণ বা ধৈর্য কোনোটাই আমার নেই। ফলে, পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতনের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচনের কাছাকাছি পৌঁছে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার রচনার আপাতত সমাপ্তি টানি। আমি ১৯৭১-এর সামনে এসে থমকে দাঁড়াই, সমুদ্রের কাছে পৌঁছে মানুষ যেমন থমকে দাঁড়ায়। আমার ধারণা, ১৯৭১ একটি পৃথক খণ্ড দাবি করে। আমার খুব ইচ্ছে আছে, বর্তমান গ্রন্থটির মতো অন্তত আরও দু'তিনটে খণ্ড রচনা করার।

'আমার কণ্ঠস্বর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। রচনাকাল ১৯৯৪। পুরো একযুগকাল আলস্য যাপন শেষে, এবার ২০০৬ সালের অন্তিম পর্যায়ে এসে আমি ১৯৭১ নিয়ে লিখতে বসেছি। পাঠক আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার জন্য দোয়া করুন— আমি যেন কারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে আমার রচনাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি।

মার্চ-গাছের পাতাগুলি

পাকিস্তানের ললাটে চিরকালের জন্য অমোচনীয় কলংকের তিলক এঁকে দেয়া পঁচিশে মার্চের কালরাতে আমি ঢাকায় ছিলাম। আমি তখন জনাব আবিদুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক পিপল পত্রিকায় কাজ করি। সাব এডিটর। মাসিক বেতন ২৫০ টাকা। তখনকার টাকার মূল্যে বলতে হয় অনেক বেতন। আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিমে ও পরিত্যক্ত ইরাকী কবরস্থানের উত্তরে নিউ পল্টন লাইনের একটি মেসে থাকি। টিনের চাল, বাঁশের বেড়া, পাকা মেঝে। ঐ মেসে আমি অন্য একজনের সঙ্গে একটি রুম শেয়ার করতাম। আমার সিট ভাড়া ছিল মাসে কুড়ি টাকা। মেসের মালিক এলাহী সাহেব। তার নামানুসারে মেসের নাম এলাহী সাহেবের মেস। মেসের সামনের ছোট্ট রাস্তাটির নাম গ্রীন লেন। এতো ছোটো রাস্তারও যে এতো সুন্দর আর ভারিক্কী নাম থাকতে পারে, তা বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি ঐ মেসে ১৯৬৯-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিলাম। আমার তিনটি কবিতায় (মেস প্রতিকৃতি, ভাড়া-বাড়ির গল্প ও গ্রীন লেনে রাত্রি : কবিতা, অমীমাংসিত রমণী, প্রকাশকাল ১৯৭৩) আমি জায়গাটাকে যথাসম্ভব অমরত্ব দানের চেষ্টা করেছি।

আমাদের মেসের পাশের তিন তলা বাড়িটি শরিয়তউল্লাহ চেয়ারম্যানের। শরিয়তউল্লা চেয়ারম্যান আসলে কোথাকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তা কখনও আমার জানা হয়ে উঠেনি। তাঁর মুখের ভাষা শুনে জেনেছিলাম, তাঁর দেশের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী। মনে হয়, ওখানকারই কোনো একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ঐ বাড়ির নিচ তলায় থাকতেন পাকিস্তান টিভির প্রযোজক জনাব বেলাল বেগ। টিভিতে কবিতা পড়া আর নাটক করার কারণে বেলাল বেগের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর প্রযোজিত কোনো অনুষ্ঠানে আমি কখনও অংশ নিইনি বটে, কিন্তু কাছাকাছি বয়সের ছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর কথা পরে আবারও আসবে।

পঁচিশে মার্চের কথাই যখন লিখছি, তখন পুরো মার্চ মাসটির ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেয়াটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বরং তাতে পাঠকের কিছু উপরি পাওয়া হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা খণ্ডিত চিত্রও পাওয়া যাবে। আমাদের জাতীয় জীবনে মার্চ মাসের একটা পৃথক মূল্য আছে। ঐ মাসের প্রায় প্রতিটি দিনই গৌরবদীপ্ত। একসময় আমি 'মার্চ

গাছ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটি হারিয়ে গেছে। কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সম্ভবত ইত্তেফাকে মার্চ মাসের প্রতিটি তারিখই কোনো না কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি তারিখই মার্চ গাছের এক একটি উজ্জ্বল পাতা বাঙালির জাতীয় জীবনে এতো গুরুত্ববহ মাস আর নেই। বিজয় দিবস সমৃদ্ধ ডিসেম্বর আর ভাষা দিবস সমৃদ্ধ ফেব্রুয়ারির কথা মনে রেখেই আমি বলছি।

মার্চ মাসের একটা উপরি পাওনা আছে, যা অন্য মাসগুলোর নেই। এই মার্চ মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ। ৭ মার্চ তিনি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমবেত পাঁচ লক্ষাধিক ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ প্রদান করেন। আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সকল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে, অখণ্ড পাকিস্তানের কফিনে শেষ-পেরেকটি ঠুকে দিয়ে এই মার্চ মাসের ২৫ তারিখ রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিজ দেশের স্বাধিকারকামী নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর চালিয়েছিল ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর আক্রমণ। ঢাকা নগরীর নিদ্রিত নাগরিকদের ওপর চালিয়েছিল নির্বিচার গণহত্যা আর আমাদের ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্য আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্রুদ্ধ হিংস্র-ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো। সেই বর্বর আক্রমণের পটভূমিতেই, ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুসারে পরদিন, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তান ভাঙ্গার দায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে একজন যথার্থ দূরদর্শী দেশনায়কের মতো পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ করেন

তাঁর পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণের ঘটনাটিকে নিয়ে যারা তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এরকম তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী ও অনুসারীদের দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে পাক-বাহিনীর হতে গ্রেফতার বরণের যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন, পুরোটা সময় পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়ে, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে এসে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল তাঁর অবর্তমানে কিছুই থেমে থাকেনি তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব মুহূর্তের জন্যও প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি রামের অবর্তমানে রামানুজ ভরত যেমন সিংহাসনে অগ্রজ রামের পাদুকা রেখে ভারত শাসন করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর বেলাতেও তেমনটিই ঘটেছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রবাসী সরকারের

নেতৃত্বদানকারী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ বা সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমার্থক বা সমান গুরুত্বপূর্ণ বলেই জ্ঞান করেছিলেন। একইসঙ্গে গাছেরটা ও তলেরটা খাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। কিন্তু তিনি হালে পানি পাননি।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানীরা কোনো ফায়দা লুটতে পারেনি। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিঘ্নকারী বা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বিবৃতি আদায় করতে পারেনি। তাঁর কারাগারের পাশে তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছে দেখেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর চাপের কাছে। জেলের ভিতরে কবর খোঁড়ার দৃশ্য দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখাতে আসা সামরিক কর্মকর্তাদের তিনি বলেছিলেন— 'আমার শেষ-ইচ্ছের প্রতি যদি সত্যিই তোমরা সম্মান প্রদর্শন করতে চাও তো আমার মৃতদেহটিকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিও। আমাকে যেন আমার জন্মভূমিতে কবর দেয়া হয়।'

এমন একজন নির্ভয়চিত্ত দেশনায়কের দেশপ্রেমকে যারা কটাক্ষ করেন, 'সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, দিয়েছে জাতীয় পতাকা, দিয়েছে জাতীয় সঙ্গীত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নির্ভয়চিত্ত এক জাতীয় নেতা। মার্চ আমাদের দিয়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের মতো একজন সৈনিককে, যিনি ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে পুনঃপ্রচার করে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শেখ মুজিবের ৬ দফা : পাকিস্তানের দফা রফা

অনেকেই বলেন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নিহিত ছিল আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ভিতরে, কথাটা আমিও অস্বীকার করি না খুবই সত্য কথা। বীজ না থাকলে প্রাণের উদ্ভব হবে কোথা থেকে? আমি মনে করি, কবি হিসেবে আমি একুশের জাতক আমার জন্ম-রাশি একুশ। ঢাকার কাগজে প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতাটি ছিল আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচিত। একুশ নিয়ে আমি অনেক ক'টি কবিতা রচনা করেছি কম করেও দশটি তো হবেই আবৃত্তিকারদের কণ্ঠকৃপায় একটি কবিতা (আমাকে কী মাল্য দেবে দাও. কবিতা অমীমাংসিত রমণী : ১৯৭৩) বেশ জনপ্রিয় হয়েছে ছোটো ও একটি প্রত্যন্ত গ্রামে শৈশব কাটানোর কারণে একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না থাকতে পারলেও, আমার ঐ কবিতাটি সময়কে অতিক্রম করে একুশের সঙ্গে যুক্ত-কবিদের লেখা কবিতার সারিতে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। 'তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে দাও. .'। আমার অন্য একটি কবিতায় আমি বলেছি :

'না, আমি নির্মিত নই বাল্মীকির কাল্পনিক ক্রৌঞ্চে—,
আমাকে দিয়েছে জন্ম রক্তধারা অমর একুশে।'

(আমার জন্য পৃথিবীজোড়া গান)

আমরা জানি, আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারি ধরে। ইংরেজী বর্ষের সবচেয়ে ছোটো মাস হচ্ছে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু মহান একুশে ফেব্রুয়ারির মতো একটি উজ্জ্বল দিনকে বুকে ধারণ করে ইংরেজী বর্ষের সবচেয়ে ছোটো মাসটিই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় মাস। স্বাধিকারের স্বপ্নাঞ্জনমাখা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন ঐ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতায় উন্নীত করেছে আমাদের পরবর্তীকালের দীর্ঘ সংগ্রাম। লক্ষ-লক্ষ প্রাণের মূল্যে, বীরের রক্তধারায়, মায়ের অশ্রুজলে সেই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছে ১৯৭১ এ। আমরা অর্জন করেছি ২৬ মার্চ আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা-দিবস। তারপর নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয় দিবস, দখলদারমুক্ত একটি নিজস্ব মুক্ত-ভূমণ্ডল, বাংলাদেশ।
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাঝখানে উজ্জ্বল হাইফেনের মতো বিদ্যমান বা সংযোগ রক্ষাকারী যে-অধ্যায়টির প্রতি আমরা কিছুটা উদাসীন,

আমার বিবেচনায় সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি। আমি মনে করি, ভাষা আন্দোলনকে এক দফার স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত করার পেছনে একটি উজ্জ্বল সিঁড়ির ভূমিকা পালন করেছে ৬ দফা কর্মসূচি ঐ সিঁড়িটি না থাকলে আমরা এতো দ্রুত আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রক্ত-সরোবরে নামতে পারতাম না। তাই বঙ্গবন্ধু-প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচিটি কী ছিল, কীভাবে ঐ কর্মসূচিটি আমাদের চেতনায় ধীরে ধীরে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষকে জাগ্রত করেছিল, তা আমাদের সবারই জানা দরকার। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের ইতিহাস প্রণেতারা সেখানে খুব কার্যকরভাবে আলো ফেলতে পারেননি বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতকারীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা তো লুকাবেই। যেখানে তাদের কোনো কৃতী নেই, সেখানে তারা ইতিহাসের আলো ফেলবে কেন? আমি মনে করি, আওয়ামী লীগের শাসনামলেও ৬ দফার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে যতটা আমলে নেয়া দরকার ছিল, বাস্তবে ততটা আমলে নেয়া হয়নি। ৭ জুনকে ৬-দফা দিবস হিসেবে আওয়ামী লীগ পালন করে বটে কিন্তু শুধু ঐটুকুর ভিতর দিয়ে ৭ জুনের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় না। আমি মনে করি, ঐ-দিনটিকে সরকারি ছুটির আওতায় আনা দরকার এবং নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশদভাবে জানবার জন্য স্কুল কলেজের পাঠ্য-সূচিতে ঐ দিনটির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করা দরকার।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিটি এখানে তুলে দিচ্ছি

১৯৬৫ সনের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ দিন স্থায়ী যে পাক-ভারত যুদ্ধটি হয়, তার পটভূমিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং স্বাধিকারের প্রশ্নটি তীক্ষ্ণভাবে সামনে চলে আসে। সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা ছিল সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। ভারত ইচ্ছে করলেই তখন পূর্ব পাকিস্তানকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দখল করে নিতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে সেই ভয়টা জেঁকে বসেছিল। শেখ মুজিব (তিনি তখনও বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাগ্রত ভারত-ভীতিকে অত্যন্ত কৌশলে পুঁজি করে তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচীটি প্রণয়ন করেন পাকিস্তানের আংশিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিনই তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কোন্ড স্ট্রোকে মারা যান। শান্তি চুক্তির চেয়ে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণেই তাসখন্দ দ্রুত বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। তাসখন্দ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো দ্রুত ভারত-বিরোধীদের সমর্থন লাভ করেন। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারতের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে এমনিতেই প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, ভুট্টোর বিরোধিতার কারণে আইয়ুবের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ে ঐরকমের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, পাকিস্তানের লৌহমানব বলে খ্যাত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতার মসনদ যখন কিছুটা দুলে উঠেছে, তখন তৎকালীন পাকিস্তানের বিরোধীদলগুলি লাহোরে একটি রাজনৈতিক কনভেনশন বা গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। শেখ মুজিব ঐ সময়টাকেই তাঁর কর্মসূচি 'বাঙালির মুক্তি-সনদ' পেশ করার মাহেন্দ্রক্ষণ বলে মনে করে, ঐ কনভেনশনে তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর কর্মসূচির নাম দেন 'বাঁচার দাবি ৬-দফা'।

বাঁচার দাবি ৬ দফা

প্রস্তাব-১

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি :

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।

প্রস্তাব-২

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি :

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দু'টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩

মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা :

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যেকোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে–

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে

(খ) সমগ্র দেশের জন্য কেবল একটি মুদ্রা চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আর্থিক বা অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব ৪

রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

ফেডারেশনের অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রের রাজস্বের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সকল করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যিক পৃথক হিসাব করতে হবে।

(খ) বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারে থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৬ দফায় বর্ণিত পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার ধারণাটি আমার খুব পছন্দ হয়। পৃথক মুদ্রার মানে যে পৃথক দেশ, তা আমার বুঝতে দেরী হয় না।

শেখ মুজিব ভেবেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত প্রদেশগুলির নেতারা তার ৬ দফা সমর্থন করবে, কিন্তু বাস্তবে তা হল না। পরদিনের কাগজে তার ৬ দফার কঠোর সমালোচনা ছাপা হলে তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ঢাকায় ফিরে

আসেন। তিনি স্মরণ করলেন কবিগুরুর কবিতা– 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

পূর্ব বাংলাতেও ৬ দফার সমালোচনা নেহায়েত কম হয়নি। মওলানা ভাসানী বললেন, ওটা আসলে আর কারুরই নয়, ওটা সিআইএ-র দলিল। তিনি এ ব্যাপারে তার কাছে দলিল আছে বলে জানালেন। কিন্তু সাংবাদিকদের চাপের মুখে তিনি প্রমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হন। তিনি জানান যে, ঐ দলিলটি তিনি তার দলের সাধারণ সম্পাদক তোয়াহাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তোয়াহা জানান, মওলানা ভাসানী কোনোদিনই ওরকম কোনো দলিল তাঁকে দেননি।

শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচিটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারা দেশে বিলি করা হয় এবং তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। ২০ মার্চ থেকে শেখ মুজিব দেশব্যাপী জনসংযোগ শুরু করেন। ৩৫ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ৬ দফার পক্ষে বক্তব্য দেন।

৬ দফা নিয়ে দেশের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। তাজউদ্দিনসহ আরও বহু আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীকে পাঠানো হল জেলে। আওয়ামী লীগের ওপর নেমে আসে জেল-জুলুম আর নিপীড়ন। সারাদেশে আওয়ামী লীগের ৩ হাজার ৫ শ' জন নেতা কর্মী গ্রেফতার হন কিন্তু ৬ দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমি তখন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বিএসসি পড়ি। '৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন খোলা ফার্মেসী বিভাগে ভর্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ভর্তি হতে না পারার কারণে আমার মন খুব খারাপ। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের দিকে আমি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ আমি ছাড়া, ঐ বছর প্রথম বিভাগ পাওয়া আর কেউ পাস কোর্সে ডিগ্রী পড়তে বাধ্য হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। পরের বছর ১৯৬৫ সালে আমি বুয়েটে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। রিটেনে পাশ করলেও আমাকে ভাইভাতে আটকে দেয়া হয়। ভাইভা বোর্ডে একজন শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলে ফেলেছিলাম যে আমার বড় ভাই ভারতে বসবাস করেন। আমার মনে হয় সে-কারণেই আমার হয়নি। পাশ করে আমি যদি ভারতে চলে যাই। ভারত তখন নবঘোষিত এনিমি স্টেট আর পূর্ব বাংলার হিন্দুরা পাকিস্তানের অঘোষিত এনিমি।

এরকম পরিস্থিতিতে আমি শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচিটি ভালো করে পড়লাম। পড়ে আমার মনে হল, পাকিস্তান নিধনের ওষুধ পাওয়া গেছে

'বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।'

শেখ মুজিব এই প্রবচনতুল্য কবিতাটি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার উদ্দেশ্যে প্রায়ই জনসভায় আওড়াতেন। আমিও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই।

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল ডাকে আওয়ামী লীগ। সেই হরতালের ডাকে অভাবিতভাবে সাড়া দেয় পূর্ব বাংলার মানুষ। হরতাল সফল করতে গিয়ে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে মারা যায় তেজগাঁর শ্রমিক মনু মিয়াসহ মোট ১১জন। নিহত শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুট মিলের শ্রমিক। সেদিন সন্ধ্যার দিকে ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে প্রবেশ করে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেন। ট্রেনটি প্রায় যাত্রীশূন্য। আমি সেই যাত্রীশূন্য ট্রেনের ভিতরে তাকিয়ে আমার ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে দেখতে পাই। সেদিনই আনন্দমোহন কলেজের হোস্টেলে ফিরে গিয়ে রাত জেগে আমি লিখি শেখ মুজিবের ৬-দফার পক্ষে আমার প্রথম কবিতা- 'সুবর্ণ গোলাপের জন্য'।

'শীতের রোগীর মতো জবুথবু নয়,
'গঞ্জের জনতার মতো নির্ভীক হতে হবে।
রক্তের রঙ দেখে ভয় নেই,
স্বাধীন দেশের মুক্ত জনতা উল্লাস করো সবে।'

(প্রকাশ ১৯৬৬। প্রথম দিনের সূর্য)

উনিশশ'একাত্তর হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি, সমুদ্রের মতো উত্তাল এবং হিমালয়ের মতো বিস্তৃত বিশাল একটা সময়খণ্ড। এই বছরের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি গুরুত্ববহ বছর, পৃথিবীর আর কোনো জাতির জীবনে আছে বলে আমার মনে পড়ছে না। রুশ বিপ্লবের বছর ১৯১৭ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম বছর ১৯৪৫ সালের সঙ্গেই হয়তো তার তুলনা চলে। আমি একাত্তর নিয়ে লিখতে বসে বড় বিপদে পড়েছি। পড়ব যে তা আমি বিলক্ষণ জানতাম আমার কণ্ঠস্বর লিখেই তাই আমি আমার আত্মজীবনীর ইতি টানতে চেয়েছিলাম। লিখতে চাইনি। আমার যুক্তি ছিল, জীবন থাকলেই জীবনী লিখতে হবে, এই কথা কে বলেছে? আমার অনুরাগী পাঠক বা আমার প্রকাশকরা যখন আমাকে আরও লেখার জন্য অনুরোধ করত, আমি তাদের সেকথাই বলতাম বলতাম আমার পক্ষে আর লেখা সম্ভব নয়। বলতাম বটে লিখব না, কিন্তু মনে মনে ঠিকই লিখতাম। না লিখে পারতাম না মনে মনে লেখার বড় সুবিধা হল এই যে, সেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে না। সেখানে ভাষার দুর্বলতা বা তথ্যের বিভ্রাট নিয়ে বিচলিত বোধ করার কিছু নেই। আমাদের চিন্তা জগতে প্রতিনিয়ত কতো কিছুই না ঘটে চলেছে। তার খোঁজ কে রাখে? মানব মনের সেই গহীন অরণ্যে প্রবেশ করার সাধ্য নেই কারও। সেখানে বানান ভুল বলে কিছু নেই। চিন্তার জন্য কি শব্দের নির্ভুল বানান জানবার দরকার পড়ে? এক মানুষের অলিখিত-অব্যক্ত চিন্তাভাবনার বিচিত্র-বর্ণিল জগতের ওপর অন্য মানুষের মালিকানা থাকে না। অধিকার থাকে না। অজাত শিশুর মতো অলিখিত রচনাও থাকে আমাদের সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন একজন তার মনের ভিতরের চিন্তাভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে বসে। মানুষের মনের অপ্রকাশিত ভাবনারাশিকে আমি তুলনা করি– পৃথিবীর আলো দেখার আগেই, ভূপৃষ্ঠে অবতরণের অধিকারবঞ্চিত, অ-ভূমিষ্ঠ শিশুদের সঙ্গে। নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে, নিজেদের জীবনকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রস্বার্থে যাদের আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্ম নিতে দেইনি আমি খুব বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছি এই নির্মম সত্য, যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। মানুষের যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই প্রাণিজগতের অন্য সদস্যদের শক্তি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়তো থাকবে না, এই সুন্দর পৃথিবীতে টিকে থাকবে মানবেতর প্রাণীরাই।

আমি আত্মজৈবনিক ধারার লেখক আমার সমস্ত রচনাই এক অর্থে আমার আত্মজীবনীরই খণ্ডিত অংশ তা গদ্যেই হোক বা পদ্যেই হোক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিকে পাবে না তুমি জীবন চরিতে'। আমি কবিগুরুর এই কথাটাকে সত্য বলে মনে করি না। আমি ভাবি, একথা বলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর রচিত সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। রক্ষণশীল বাঙালির চরিত্র বিবেচনা করেই হয়তো তিনি তাঁর পাঠককে বিভ্রান্ত করাটা জরুরী বলে ভেবেছিলেন। আত্মজৈবনিক ধারার একজন দীন বাদেম বা স্বঘোষিত প্রবক্তা হওয়ার পরও, মাঝে মাঝে আমিও তা করি। মাঝে মাঝে আমিও রণে ভঙ্গ দেই। বলি, না আর পারি না। কবি হিসেবে আমি আমার আর্টফর্মের মধ্যে যে বেনিফিট অব ডাউট এনজয় করি, গদ্য রচয়িতা হিসেবে আমি তা করতে পারি না। ভেবেছিলাম, অনাগত সন্তানের জন্য নিয়ন্ত্রণ করে আমরা যে অন্যায় করি, অন্তরে জাগ্রত ভাবনাগুলোকে অপ্রকাশিত রেখে নিজেকে শাস্তি দিলে মন্দ হয় না। তাই, আমার কণ্ঠস্বর-এর কিঞ্চিৎ সফল পরিসমাপ্তির পর, যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ১৯৬২—১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়খণ্ড, আত্মজীবনীর পরবর্তী অধ্যায় অলিখিত রেখেই আমার ধরাধাম ত্যাগ করার গোপন বাসনা ছিল কিন্তু বিধি বাম। তাঁর ইচ্ছা অন্য আমার ইচ্ছাই তো আর শেষ কথা নয়। যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নানা ছুতায় যিনি আমাকে লেখান, লিখিয়ে আসছেন; খেলতে খেলতে যিনি আমাকে লেখক বানিয়েছেন, তিনিই বা আমাকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ না করে ছাড়বেন কেন? আমার ভেতর দিয়ে তাঁর দাবি তিনি মিটিয়ে নেবেন বৈকি।

প্রথম আলো-র সাহিত্য সম্পাদক তরুণ কবি জাফর আহমদ রাশেদের উপর্যুপরি তাড়ায় উক্ত পত্রিকার বিজয় দিবস সংখ্যার জন্য আমার শরণার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোটো একটি লেখা লিখতে বসেছিলাম। তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, মাস্টার পড়াচ্ছে। বুঝতে পারিনি, ঐ রচনা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় আমার খুব শীতের ভয় ছিল। যে আমি গরমের দিনে পুকুর ছেড়ে উঠতেই চাইতাম না, সেই আমি শীতের দিনে ছিলাম একেবারে উল্টো। স্নান করতে চাইতাম না। পুকুরের জলে সহজে নামতে চাইতাম না। যেন আমি জলাতঙ্ক রোগী। শীতের দিনে গায়ে তেল মেখে অনেকক্ষণ পুকুরের পাড়ে রোদে বসে থাকতাম। রোদ পোহাতাম। আমার মা-বাবা বা ভাই-বোনরা পেছন থেকে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিতো। বা আচমকা আমার মাথায় এক ঘড়া জল ঢেলে দিতো। প্রথমে রাগ করলেও, জলে গা ভিজে যাওয়ার পর আমার শীতের ভয়টা যেতো কেটে। দেহ আরাম পেতে শুরু করত। তখন আর আমাকে পায় কে? পুকুরের ধোঁয়া ওঠা জলেও দিব্যি ডুব বা সাঁতার কাটতে

পারতাম প্রাণ ভরে। স্নান শেষে যখন পুকুর ছেড়ে উঠতাম, বেশ ভালো লাগত। শুধু যে শরীরে ভালো লাগত তাই নয়, একটা পবিত্র ভাবও জাগত মনে। মনে পড়ত বেদমন্ত্র 'অপবিত্র পবিত্রবা'। মনে হতো পুণ্য জলের স্পর্শে আমি পবিত্র হয়ে উঠেছি।

বড় লেখায় হাত দেয়ার জন্য আমার একটা ধাক্কা দরকার পড়ে। বড় কিছু লেখায় হাত দেবার জন্য মনকে রাজি করাতে আমার অনেক সময় চলে যায়। আসলে আমি হচ্ছি অলস পৃথিবী। মহাশূন্যে তার যে পথপরিক্রমা আজ আমরা দেখছি, তা তো আর আদিতে ছিল না। দীর্ঘদিন সে স্থির ছিল। স্থির থেকেই সে অস্থির হয়েছে। কীভাবে হয়েছে? মহাশূন্যের গ্রহ-তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতরে গতি সঞ্চারের পেছনে আইনস্টাইনও একটা প্রচণ্ড ধাক্কার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন আমি কোন ছার যে ধাক্কা ছাড়া চলি? তাই, আমার আত্মজীবনীর পরবর্তী খণ্ড, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ১৯৭১ নিয়ে লেখার জন্য যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে ঠেলা-ধাক্কা দিয়েছেন, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধাক্কায় বিশাল মুক্তিযুদ্ধের অতল সমুদ্রজলে প'ড়ে হাবুডুবু খেলেও আমি তাদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এই ধারাবাহিকের কয়েকটি অধ্যায় রচনার পর লক্ষ করছি যে, আমার রচনাটি সময়-ক্ষণ বা দিন তারিখের ধারাবাহিকতা মেনে পূর্বের গ্রন্থটির মতো অগ্রসর হচ্ছে না। তার রকম সকম ও প্রকৃতি যেন অনেকটাই আলাদা ঠেকছে। তার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমি রীতিমত হিমশিম খাচ্ছি। তাই স্থির করেছি বা নিরিখ বেঁধেছি এই মর্মে যে, প্রচণ্ড প্লাবনের তোড়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটো যেমন নিজেকে তরঙ্গের কাছে সমর্পণ করে, আমিও তেমনি নিজেকে সঁপে দেবো একাত্তরের সেই সময়ের হাতে–, যা একই সঙ্গে উত্তাল ও উন্মাদ; সুন্দর ও ভয়ংকর। একই সময়ে সে একার এবং অনেকের। ধরেছি স্মৃতির কালো ধুসর নৌকায় পাল তুলে দিয়ে নাও ছেড়ে দেয়ার কৌশল। স্মরণ করি প্রয়াত সুরস্রষ্টা সমর দাশের অমর সৃষ্টি 'নোঙর তোল তোল/ সময় যে হল হল।' আমার নোঙড় তোলা ভালোবাসার এই নৌকাটি আমাকে যেভাবে, যে-পথে নিয়ে যাবে, আমি সেভাবেই সেই পথ ধরে অগ্রসর হবো বেহুলার মতো। আমি জানি, আমার নৌকায় আমি যে স্বপ্নের শবকে বহন করে নিয়ে চলেছি, বেহুলার স্বামী লখিন্দরের মতোই আমার কাছে সে প্রিয় বাংলাদেশ।

লেখাটি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জন্মকথা থেকে আমি আমার জীবনকথাকে পৃথক করতে পারব বলে মনে হয় না আমি সে চেষ্টা করবও না মিলছে মিলুক, যার আত্মকথা তার দেশের জন্মকথার সঙ্গে মিলে যায়, তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে!

দি পিপল পত্রিকায় আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় নিউজ এডিটর জনাব আবদুস সোবহান। চমৎকার আমুদে মানুষ। তাঁকে বলে আমি নাইট শিফটের ডিউটি চেয়ে নিয়েছি। তিনি আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। ফলে, অন্যদের শিফট বদল হলেও আমার কখনও শিফট বদল হতো না। তরুণ কবি হিসেবে তিনি আমাকে খুব খাতির করতেন। স্নেহ করতেন। সোবহান সাহেব ভালো ইংরেজি জানতেন। তাঁর টেবিলে একটি অক্সফোর্ডের ইংরেজি ডিকশনারি থাকত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে তিনি সেটা ব্যবহার করতেন না। নিউজ এডিটর হিসেবে পিপল পত্রিকায় যোগদানের আগে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। করাচী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ডন পত্রিকায় কাজ করতেন। আমাদের ইংরেজি শিখতে খুব সাহায্য করতেন আমার ইংরেজি শেখার পেছনে তাঁর ভালো অবদান ছিল। নাইট শিফটে আমি কাজ করতাম বলে সারাদিন আমার কোনো কাজ থাকত না। নিউ মার্কেটের রেস্টুরেন্টে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীফের কেন্টিনে চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারতাম অথবা টৌ টৌ করে ঘুরে বেড়াতে পারতাম ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে। আমি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা পিপলে কাজ করতাম, সেখানে আমার বাংলা লেখা ছাপার কোনো সুযোগ ছিল না আমার কবিতা বা সামান্য গদ্য যা লিখতাম, সেগুলো ছাপা হতো দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, আজাদ বা পূর্বদেশ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হতো কথাশিল্পী হুমায়ুন কাদির সম্পাদিত 'পাক জমহুরিয়াত' ও পুশোত্তন আনোয়ার আলী সম্পাদিত 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকায় ঐ পত্রিকাগুলোকে হাতে রাখার জন্য ঐসব পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হতো তাঁদের স্নায়ুর ওপর চাপ রাখতে হতো। দিনে ঐ কাজটা আমি সারতাম। তারপর সন্ধ্যাবসানে ছুটতাম পরীবাগে পিপলের অফিসে। রাত আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত চলতো আমাদের নাইট শিফটের কাজ।

একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি পিপল পত্রিকা গ্রুপ থেকে 'গণবাংলা' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আনোয়ার জাহিদ। তিনি ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মওলানা ভাসানীর খুব ঘনিষ্ঠজন। জাহিদ ভাইয়ের কল্যাণে গণবাংলায় আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানও কাজ পায়। জাহিদ ভাইও ছিলেন কবিতামোদী মানুষ। আমাদের পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক জনাব আবদুর রহমান ছিলেন একজন বেশ ভালো গীতিকার। উত্তর বাংলার বেশকিছু শিল্পী তাঁর লেখা গান গেয়েছেন পিপল হাউস থেকে বাংলা সাপ্তাহিক গণবাংলা প্রকাশিত হওয়ার ফলে আমার লেখা প্রকাশের একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে গণবাংলা একটি চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

ঐ বিশেষ সংখ্যাটির জন্য আমি আর হুমায়ুন কবির দু'জনে মিলে প্রখ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। গণবাংলার একুশে সংখ্যায় একটি পুরো পাতা জুড়ে আমাদের নেয়া সেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। মনে হয়, ওটিই ছিল শহীদ মুনীর চৌধুরীর শেষ সাক্ষাৎকার। গণবাংলা পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি পারলে মুনীর স্যারের শেষ-সাক্ষাৎকারটি আমরা আবার পড়তে পারতাম। আমার নিজেরও মনে নেই তিনি আমাদের কোন প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছিলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর তিনি আল বদরের জল্লাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। হায় কী করুণ।

মুনীর স্যারের কথা যখনই আমি ভাবি, আমার মনে পড়ে একটি সুখস্মৃতি। আমার প্রথম কবিতার বই 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। মুনীর চৌধুরী খুব চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে তিনি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, সেই সন্ধ্যায় মিলনায়তন ভর্তি শ্রোতার পিনপতন নীরবতার মধ্যে বসে আমি তাঁর দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হই। শামসুর রাহমানের দুঃখ কবিতাটি যে এতোটাই ভালো, তা আমি মুনীর চৌধুরীর আবৃত্তি শুনে নিশ্চিত হই। মনে মনে ভাবি, আহা তিনি কি কখনও কোনোদিন আমার কোনো কবিতা আবৃত্তি করবেন? আমি কি তাঁর আবৃত্তিযোগ্য কোনো কবিতা কখনও লিখতে পারব?

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। একদিন বিকেলে নিউ মার্কেটের নওরোজ কিতাবিস্তানে গেলে ঐ দোকানের মালিক কাদির খান সাহেব আমাকে সহাস্যবদনে জানান যে, মুনীর চৌধুরী আমার কবিতার বইটির একটি কপি খুব আগ্রহ সহকারে কিনে নিয়ে গেছেন। আমি দাম ছাড়াই আপনার বইটি তাঁকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছেন, না আমি ওর বইটি কিনব বলেই এসেছি। শুনে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি। সবাই জানে, মুনীর চৌধুরী যার কবিতার বই গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনেন, সে কবি না হয়ে পারে না। কবি হিসেবে আমার কনফিডেন্স বেড়ে যায়। আমি মনিকোতে আমার বন্ধুদের চা পানে আপ্যায়িত করি। পরে কেন করেছি, তা বলি রসিয়ে রসিয়ে।

সেই থেকে দু'দিনও যায়নি, বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সামনে বসে আছি। বিকেলের দিকে মুনীর স্যার তাঁর টয়োটা গাড়িটিতে চড়ে লাইব্রেরিতে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে, গাড়ি লক করতে করতে তিনি আমাদের

দিকে দূর থেকে তাকান। আমার বুক কেঁপে ওঠে, ভাবি তিনি আমাকে ডেকে খারাপ কবিতা লেখার জন্য সুন্দরী মেয়েদের সামনে বকবকা করবেন নাতো? তাঁর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছেন তাঁর বোন। উনি ইংরেজি বিভাগে পড়েন। বেশ সুন্দরী। তখন সত্যি সত্যিই তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকেন। আমি দুরুদুরু বুকে তাঁর দিকে এগিয়ে যাই। তখন মুনীর স্যার আমাকে অবাক করে দিয়ে জানান যে, আমার কবিতার বইটি তিনি নওরোজ থেকে সংগ্রহ করে পড়েছেন। আমি আমার স্বপ্নপূরণের লজ্জায় মাথা নত করে থাকি। তিনি তখন আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে জানান যে, আমার 'লজ্জা' কবিতাটি একটি অত্যন্ত ভালো কবিতা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তোমার লজ্জা কবিতাটি আমার বাসার সবাইকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। তাঁর সুন্দরী ভগিনীটি, যিনি আমার দিকে আগে কোনোদিন ফিরেও তাকাননি, সলজ্জ হাসিতে তিনি স্যারের কথা সমর্থন করেন। স্যার জানান যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মৃতা-নগ্নিকার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাঠ করে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। তিনি জানান যে আমার কবিতা নিয়ে তিনি সহসাই লিখবেন। আমি প্রশংসার লজ্জায় তাঁর সামনে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। স্যারও সেটা বুঝলেন। বললেন, ঠিক আছে যাও। পরে দেখা হবে। আমার বাসায় এসো।

কিছুদিনের মধ্যেই গণবাংলার একুশে সংখ্যার জন্য আমি আর আমার কবিবন্ধু হুমায়ুন কবির তাঁর বাসায় যাই এবং তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ভেবে আশ্চর্য হই যে, মাত্র দশ মাসের ব্যবধানে আমার 'লজ্জা' কবিতায় বর্ণিত সন্তানসম্ভবা নগ্নিকার মতোই মুনীর স্যারের মৃতদেহও আবিষ্কৃত হয় রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। তিনি কি তাঁর চোখে জল আনার মতো ভালো লাগা আমার ঐ 'লজ্জা' কবিতাটির মধ্যে তাঁর নিজ জীবনের সমকরুণ সমাপ্তির প্রচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন?

আনোয়ার জাহিদ ভাই গভীর রাতে প্রায়ই আমাদের নিয়ে যেতেন রাস্তার ওপারে অবস্থিত হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে, যার বর্তমান নাম হোটেল শেরাটন। ঐ হোটেলে সবকিছুরই দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া। আমরা সেখানে কিছু খাওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। জাহিদ ভাই সেখানে আমাদের কফি খাওয়াতেন। হোটেলের কর্মচারীরা জাহিদ ভাইকে খুব সম্মান করত। তাঁর সঙ্গে থাকায় বলে ক্রমশ আমারও সেই সম্মানের ভাগ পেতে শুরু করি। তখন ওটাই ছিল ঢাকার একমাত্র পাঁচ তারা হোটেল। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলটি তখনও হয়নি। ইন্টারকনের ক্যাফেতে বসে কফি খেতে খেতে আমরা সাংবাদিকতা, কবিতা ও রাজনীতি নিয়ে উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা করতাম।

আমার চেয়ে আবুল হাসানের সঙ্গেই জাহিদ ভাইয়ের চিন্তা-ভাবনার মিল ছিল বেশি। আমি ছিলাম বঙ্গবন্ধুর অন্ধ-ভক্ত। জাহিদ ভাইয়ের প্রিয় নেতা ছিলেন ভাসানী, আবুল হাসানেরও কিছুটা। জাহিদ ভাইয়ের স্ত্রী কামরুন নাহার লাইলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা এডভোকেট। স্মার্ট, সুন্দরী ও বিদুষী। মনে পড়ে, জাহিদ ভাইয়ের পুরানা পল্টনের বসায় আমরা তাঁর হাতের চা খেয়েছি। তিনি আজ নেই অল্পবয়সে মারা গেছেন।

একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় আসেন, তখন সদলবলে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে এই হোটেল ইন্টারকনে উঠেন। ২৩ মার্চ আমি আর আমার কবিবন্ধু হুমায়ুন কবির যে ভুট্টোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'জয়য়য়য়য়য়য়য়য় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ব্যাটাকে কিছুটা হলেও ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছিলাম, তার পেছনে জাহিদ ভাইয়ের পরোক্ষ ভূমিকা কার্যকর ছিল। তাঁর কারণেই ঐ হোটেলের কর্মচারীরা আমাকে চিনত এবং ২৩ মার্চের দুপুরে আমাদের দু'জনকে ঐ হোটেলে প্রবেশ করতে দিয়েছিল।

এক নয় সাত এক সালের মার্চ মাসে প্রায় রাতেই ঢাকায় কার্ফু বলবৎ থাকত। কার্ফুর ভিতরে নগরীতে চলাচলের সুবিধার জন্য তখন পত্রিকা অফিস থেকে আমাদের প্রত্যেককে পরিচয় পত্র দেয়া হয়। যা কার্ফু পাস হিসেবে বিবেচিত হতো পাক-আর্মির ভাষায় ঐ কার্ফু-পাসের নাম ছিল 'ডান্ডি কার্ড'। আমার নিজের হাতে বিশেষ যত্নসহকারে তৈরি করা ডান্ডি কার্ডটি ছিল একটু অন্যরকম। মার্কার পেনের লাল কালি দিয়ে আমি আমার পরিচয় পত্রটির ওপর একটি মোটা ক্রস চিহ্ন আঁকি এবং বড় বড় কালো হরফে লিখি নিজের নাম প্রথমে লিখি আমার পদবী, পরে নাম। অর্থাৎ গুণ নির্মলেন্দু। গুণ বানানটা আমি ইংরেজিতে লিখি GUN। এমনিতে আমি গুণের বানান লিখি goon; কিন্তু পাক-আর্মির সঙ্গে শয়তানি করার উদ্দেশ্যে আমি আমার পদবীর ইংরেজি বানানটা পাল্টে দেই। আমার নামের ভিতরে যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, সেটা ঐরূপ বানানে সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়। নগরীতে টহলরত পাক-সেনাদের ডান্ডি কার্ড দেখিয়ে কিছুটা ভড়কে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য। বিশ্বখ্যাত পেশাদার পাক আর্মির সঙ্গে মশকরা করার ফল যে ভয়াবহ হতে পারে, তা তখন আমি ভাবিনি।

সঠিক তারিখটা মনে পড়ছে না। মনে হয় ২৫ মার্চের কাছাকাছি কোনো দিনই হবে। রাতের ডিউটি সেরে আমরা পত্রিকা অফিসের গাড়িতে করে যার যার আস্তানায় ফিরছি। আমাকে আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিম পাশে নিউপল্টনে নামিয়ে দিয়ে জাহিদ ভাই যাবেন পুরানা পল্টন। আমাদের গাড়িতে সেই রাতে আর কে কে ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না

আমাদের গাড়িটি যখন নিউ মার্কেটের উত্তর দিকের চার পথের মোড়ে পৌঁছেছে, তখন উদ্ধত আটোমেটিক রাইফেল উঁচিয়ে একদল পাক সেনা আমাদের গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। নিয়ম হল না চাইতেই মিলিটারিদের দিকে যার যার আইডেন্টিটি কার্ডটি বাড়িয়ে ধরা। আমরাও তাই করলাম। সবার আইডেন্টিটি কার্ড দ্রুত ফিরিয়ে দিয়ে আমারটি নিয়ে সৈনিকটি চলে গেলো একটু দূরে পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়ানো জিপে বসে থাকা তার অফিসারের কাছে। আমার বুক একটু কেঁপে উঠল। বুঝলাম বিপদ আসছে। জাহিদ ভাই বললেন, খাইছে। এইবার ঠেলা সামলাও। সৈনিকটি তাঁর অফিসারকে নিয়ে দ্রুত ফিরে এল আমাদের গাড়ির কাছে। অফিসারটি আমাদের গাড়ির কাছে এসেই দরজায় মারল একটা লাথি। বলল, বাহার নিকলাও সব। গাড়ি সার্চ করো পা। আপকা সাথ গান হায়? আমরা গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বাইরে দাঁড়ালাম। সৈনিকরা টর্চ লাইটের আলো ফেলে আমাদের গাড়িটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তারপর কিছু না পেয়ে আমার কাছে এসে বলল, আপকা গান কিধার রাক্‌খা? আমি প্রাণ ভয়ে কোনোমতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে বললাম, মেরা সাথ কুই গান ফান নেহি ভাইয়া, গান মেরা ফেমিলি টাইটেল হায়। ক্ষুদ্রবুদ্ধির ঐ অফিসারটি তখন আমার চোখে টর্চের আলো ফেলে আমার ছবির সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিয়ে বলল, তুম জার্নালিস্ট হো? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে বললাম, জ্বি স্যার। অফিসারটি তখনও আমাকে ছাড়ছে না দেখে, আমার পরিত্রাণার্থে জাহিদ ভাই গাড়ি থেকে নেমে অফিসারটির কাছে এগিয়ে এলেন। আমি বললাম, স্যার, হি ইজ মাই বস। জাহিদ ভাই ভালো উর্দু বলতে পারতেন। তিনি বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন। বললেন এই মুলুকে এরকম খতরা টাইটেলও হয়। দিস ইজ নট এ গান লাইসেন্স। তাঁর কথায় কাজ হল। সৈনিকটি আমার হাতে আমার আইডেন্টিটি কার্ডটি ফিরিয়ে দিয়ে, আমাদের গাড়িতে ঢুকিয়ে, গাড়ির দরোজাটি পা দিয়ে সজোরে বন্ধ করতে করতে বলল– ওকে, গো। ভাগো হিয়াসে।

আমাকে আমার বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে জাহিদ ভাই বললেন, কালকেই আপনার গান লাইসেন্সটি ফেলে দিয়ে নতুন একটা আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি করে নেবেন।

আমি বললাম, আর বলতে হবে না জাহিদ ভাই। আমি কালকেই...

পুনশ্চ গণবাংলা : দু'টি কংকাল ও একটি চুরিপরা হাত

বছরের শুরু থেকে নয়, সাপ্তাহিক গণবাংলা পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। বড় কলেবরের ঐ বিশেষ সংখ্যাটিতেই আমার ও কবি হুমায়ুন কবিরের নেয়া শহীদ মুনীর চৌধুরীর শেষ-সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সংখ্যায় আমার কবিতা ছিল কি না, মনে পড়ছে না। পঁয়ত্রিশ বছর পর, আমি গণবাংলা পত্রিকাটির সন্ধানে প্রথমে গণবাংলার নির্বাহী সম্পাদক জনাব আনোয়ার জাহিদ ও পরে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ফোন নম্বর নিয়ে পত্রিকার মালিক-সম্পাদক-সাহিত্যিক জনাব আবিদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি দীর্ঘ বিরতির পর আবিদ ভাইয়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যখন একাত্তরের স্মৃতিসমুদ্রে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, তখন আবিদ ভাইয়ের সন্ধান পেয়ে মনে হল আমার সামনে দিয়ে একটা গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে। আমেরিকা আবিষ্কারের দীর্ঘ সমুদ্রপথে কলম্বাসের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল আমার কাছে আবিদ ভাই হচ্ছেন সমুদ্রতীরের বাতিঘরের মতো। আমি সেই ডাল আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম, তার পুরোটা পূর্ণ হল না। জানলাম, তাঁর কাছে গণবাংলা পত্রিকার কোনো কপি নেই। তবে পত্রিকার কোনো কপি না থাকলেও দেখলাম বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড় হলেও তাঁর স্মৃতি এখনও খুব প্রখর। তিনি তাঁর অতিক্রান্ত জীবন নিয়ে আগেও লিখেছেন, এখনও লিখে চলেছেন। তাঁর লেখা গান যে গেয়েছেন হেমন্ত আর লতার মতো বিখ্যাত শিল্পীরা সেকথা পূর্বে বলেছি। বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষাতেই তিনি বেশি লিখেছেন। তাঁর ইংরেজি কবিতা অতি উচ্চমানের। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি আমার বর্তমান রচনাকর্মে প্রভূত সাহায্য পাচ্ছি।

গণবাংলার সন্ধানে বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি ও ইত্তেফাক পত্রিকার সংগ্রহশালায় অনুসন্ধান চালিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কোথাও পত্রিকাটি নেই। বাকি আছে ন্যাশনাল আর্কাইভ। যদি সেখানে গণবাংলার হদিস পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী অধ্যায়ে মুনীর চৌধুরীর সেই সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করার বাসনা থাকলো। গণবাংলা পত্রিকাটি আমি সন্ধান করছিলাম আরও একটি কারণে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর গণবাংলা সন্ধ্যায় একটি টেলিগ্রাম প্রকাশ করেছিল। ঐ বিশেষ টেলিগ্রাম-সংখ্যাটিতে আমার তাৎক্ষণিকভাবে লেখা একটি কবিতা ছাপা হয়। আমি কী লিখেছিলাম ঐ কবিতাটিতে, আমার একটুও মনে পড়ছে না। একটি বর্ণও না। একাত্তর নিয়ে আত্মকথা লিখতে বসে আমার কবিতাটির কথা হঠাৎ মনে পড়লো। মনে পড়লো

সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছিলাম। সেদিনের ঐ তিল ঠাঁই নাই মাঠে, মঞ্চের কাছাকাছি সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আমার মতো তরুণ কবি ও নবীন সাংবাদিকের বসবার কথা নয়। জাহিদ ভাইয়ের কল্যাণে আমি সেই সুযোগ পাই। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রেসকোর্সে যান এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। পূর্বেই স্থির হয়েছিল যে, আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর একটি টেলিগ্রাম সংখ্যা প্রকাশ করবো। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণ-মঞ্চে আসতে বেশ দেরি করছিলেন। লক্ষ লক্ষ ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল তাঁর সম্ভাব্য আগমন পথের দিকে তাকিয়ে। ঐ বিলম্বের ফাঁকে আনোয়ার জাহিদ ছাত্রনেতা আসম রবকে কাছে ডাকেন।

'কী রব সাহেব, আপনার নেতা কি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন?'

জাহিদ ভাইয়ের সূক্ষ্ম উসকানির ফাঁদে পা দিয়ে, বঙ্গবন্ধুর মতো পাজামা-পাঞ্জাবি পরা রব হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি যদি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা না দেন, তবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা আজই স্বাধীনতা ঘোষণা করবো।'

রবের কথা শুনে বিদ্রুপের হাসি হেসে আনোয়ার জাহিদ বললেন, 'হুম, নেতা আসলে আপনেরা তো ভিজা বিড়াল হইয়া যাবেন। দেখবো।'

জাহিদ-রব সংলাপ চলার মধ্যে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স মাঠে প্রবেশ করলেন। রব দৌড়ে চলে গেলেন মঞ্চের দিকে। আমরা কাগজ কলম নিয়ে আমাদের যার যার আসনে বসলাম। রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে নেতার ভাষণ শুরু হল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে তাঁর ভাষণ শুনলাম। অপূর্ব। এমন হৃদয়কাড়া যাদুকরী ভাষণ আমি আগে কখনও শুনিনি। ইহজনমে আবার কখনও শুনবো বলেও মনে হয় না। পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ পিন পতন নীরবতার মধ্যে তাঁদের প্রিয় নেতার ভাষণ শুনছে। আর গগণবিদারী শ্লোগান তুলছে— 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'জয়য়য়য়য় বাংলা'। 'জয়য়য়য়য় বঙ্গবন্ধু।' আমাকে এক ঘোরের ভিতরে নিক্ষেপ করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন এই বলে— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

অফিসে ফিরে গিয়ে তাঁর ভাষণের সেই অন্তিম চরণ দু'টিকে হেড লাইন করে [illegible]ম আমার রিপোর্ট তৈরি করলাম। আমার রিপোর্ট পড়ে জাহিদ ভাই হাসলেন। বললেন, কবি আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে শেখ সাহেব চারটি শর্ত দিয়েছেন? বললাম, কোথায়? কখন? তখন জাহিদ ভাই বললেন যান, আপনি বরং একটি [illegible] লেখেন টেলিগ্রামের জন্য। আমি রিপোর্ট লিখছি।

তখন আমি রিপোর্ট লেখা বাদ দিয়ে বসে গেলাম কবিতা লিখতে। আমি সেই কবিতাটির কথাই বলছি। কী ছিল সেই কবিতায়? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। ৭ মার্চ সন্ধ্যায় প্রকাশিত গণবাংলা পত্রিকার ঐ টেলিগ্রাম সংখ্যাটি কি কারও সংগ্রহে আছে?

আবিদ ভাইও আমার ঐ কবিতাটির কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তবে তাঁর কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী তথ্য জানা হল। তিনি বললেন, ২৫ মার্চের রাতে পিপল ও গণবাংলা অফিসটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পর তিনি আর সেখানে যাননি রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তিনি সেই রাতে পিপল অফিসে ছিলেন তারপর গ্রেফতার হতে পারেন এমন ভয়ে তিনি বাসায় ফিরে যান। রাত বারোটার দিকে পিপলের সাংবাদিক আবু তাহের তাঁকে ফোন করে জানায় যে, পিপল পত্রিকার দিকে পাক বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কবহর এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিপল পত্রিকার অফিসটি আক্রান্ত হয় অফিসের টিন শেডগুলিতে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ কালরাতে পিপল ও গণবাংলার চার-পাঁচজন কর্মচারী পাক সেনাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও শেলের আঘাতে নিহত হয়। কেউ কেউ ঘরের ভিতরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। তিনি তাঁর বাসায় বসে পূবাকাশে তাকিয়ে দীর্ঘসময় ধরে আগুনের শিখা জ্বলতে দেখেন, কিন্তু তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে ঐ আগুনের লেলিহান শিখার উৎস ছিল তাঁরই প্রিয় পত্রিকা পিপল ও গণবাংলার অফিস। ঐ অফিসে সেই রাতে যারা মারা গিয়েছিলেন, তাদের কারও কারও শবদেহ কিছুদিন পর তাদের পরিজনরা নিয়ে যান দুটো মৃতদেহ অফিসেই পড়ে ছিল। মৃতদেহগুলি সেখানে পড়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ পচে গলে শুকিয়ে শেষে নরকংকালে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের পর, ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর আবিদ ভাই কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং পিপল অফিসে তিনি যে ঘরটিতে বসতেন সেখানে প্রবেশ করে ঐ দুটো কংকাল দেখতে পান। তাঁর মতে ঐ দুটো কংকাল ছিল তাঁর পিয়ন কজলু ও তাঁর পাচক এবার।

২৭ মার্চ ২ ঘন্টার জন্য কার্ফু তুলে নিলে আমি ২৫ মার্চের রাতে আমার প্রাণ-বাঁচানো বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ ও ২৭ মার্চে ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে উদ্ধারকৃত তরুণ কবি হেলাল হাফিজকে নিয়ে পিপল অফিসের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অফিস পর্যন্ত যেতে পারিনি। আর্ট ইনস্টিটিউটের কাছে দেখা হয় আমাদের পত্রিকা অফিসের একজন পিয়নের সঙ্গে। কর্মচারিটি ঐ রাতে পাক হায়েনাদের বর্বর আক্রমণ থেকে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তার কাছেই আমি আমাদের পত্রিকার বেশ ক'জনের করুণ মৃত্যুর খবর জানতে পারি। তাদের সবাই ছিল পিয়ন ও প্রেসের কর্মচারী। সাংবাদিক বা কর্মকর্তারা

সেই রাতে কেউ অফিসে যাননি বা গেলেও অফিসে থাকেননি। আমি আমার বন্ধু নজরুলের দিকে তাকাই। নজরুলই ২৫ মার্চের রাতে আমাকে জোর করে অফিসের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল আমি জানি, তোদের পত্রিকাটি আর্মির প্রথম টার্গেট হবে। শেরাটন হোটেলে ওর কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল, তাদের কাছেই সে এই তথ্য জেনেছে। শেরাটন হোটেলে ভুট্টোর পাহারায় নিয়োজিত পাক আর্মিরা পিপল পত্রিকা পড়তো আর তাদের পবিত্র উর্দু ভাষায় আমাদের গালাগাল করতো। ২৩ মার্চ দুপুরে লাঞ্চ করতে শেরাটনে ফিরে আসা ভুট্টোর সামনে দাঁড়িয়ে আমি ও আমার বন্ধু কবি হুমায়ুন কবির জয়বাংলা শ্লোগান দিয়েছিলাম, ঐ ঘটনাটিও পাক-আর্মির মনে প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল। দু'দিনের মধ্যেই ভুট্টোর চোখের সামনে, পিপল পত্রিকার অফিস আক্রমণের ভিতর দিয়েই অপারেশন সার্চলাইট তার শুভ মহরত সম্পন্ন করে।

সন্ধ্যার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা খেলা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিয়েই পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি বিশেষ বিমানে করে করাচীর উদ্দেশ্যে তাঁর জীবনের শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান ইচ্ছা করলে ভুট্টোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতেন, তাতে পাকিস্তানের তেল খরচ কিছুটা হলেও বাঁচতো। কিন্তু তিনি ভুট্টোকে নিয়ে যাননি। কেন নিয়ে যাননি?

'ইয়াহিয়াকাল' গাল্লাকাব্যে আমি সেই রাতের বর্ণনা দিয়েছি এভাবে—

'২৫ মার্চের রাতে ভুট্টো কোথায় ছিলেন ভাইজান?'

'২৫ মার্চের গণহত্যার ঐ কালরাতে
ইয়াহিয়া বিদায় নিয়া চইল্যা গেলেও,
নিজের চোখে গণহত্যা দেখার জন্য
ভুট্টো থাইক্যা গেছিলেন ঢাকাতেই
সবসময় তো আর গণহত্যা দেখার
এইরকম সুযোগ আসে না!'

(ইয়াহিয়াকাল)

সেই বিবেচনা থেকে বলা যায়, পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক অনুমোদিত, জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ও পাক-সেনাবাহিনী কর্তৃক অভিনীত 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির সম্মানিত প্রধান অতিথি ছিলেন পিপিপি নেতা, লারকানার নবাব, চরমপত্রখ্যাত [illegible] আর আখতার মুকুল ভাইয়ের ভাষায় শাহনওয়াজ ভুট্টোর 'ডাউটফুল পোলা' জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি রাত জেগে, শেরাটন হোটেলের ভারী পর্দা সরিয়ে, [illegible] নিয়ে, আরাম কেদারায় বসে, ইয়াহিয়া খানের রেখে যাওয়া 'ব্ল্যাক ডগের

লেফ্টওভার খন রকস'-গান করতে করতে ঢাকার বুকে লেলিয়ে দেয়া তার পেয়ারে পাক-সেনাদের উলঙ্গ-উন্মাদ-উদ্বাহু নৃত্য প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করেন। অনেকটা ফ্রন্ট স্টলে বসে নাটক দেখার মতো। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মতো জেনারেল ভুট্টোও ২৫ মার্চের সেই কাল রাতে বুঝতে পারেননি যে, ওটাই ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ রজনী আখতার মুকুল ভাইয়ের ভাষায় 'পাকিস্তানের খতম তারাবি'।

আমাদের পত্রিকা অফিসটি শেরাটন হোটেলের নিকটবর্তী ছিল বলে, ২৫ মার্চ রাতের বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরও বর্বর পাক সেনারা বিশেষ নজর রেখেছিল তাদের পিতৃপরুষের ঐ ভিটেবাড়িটির ওপর। তারা লক্ষ্য রাখছিল, ২৭ মার্চ পত্রিকা অফিসে কারা প্রবেশ করে, তা দেখতে। তারা চাইছিল, যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মীয় পরিজনরা আসুক। তাদের প্রিয়জনের মৃতদেহ নিয়ে যাবার চেষ্টা করুক। প্রিয়জনরা মৃতের জন্য কাঁদুক, তাহলে পাকিস্তানের অনিষ্টকারী আরও কিছু 'চুতিয়া-বাঙালি'কে পরমানন্দে নিধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

নাম ভুলে যাওয়া পিপল পত্রিকার ঐ পিয়নের কথা শুনে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা আর পিপল পত্রিকার অফিসের দিকে এগোতে সাহস করিনি। রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে, নীলক্ষেত-নিউমার্কেট হয়ে আমরা নিউপল্টনে আমার মেসে ফিরে আসি।

আসার পথে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা বাঙালি নারী-পুরুষের লাশ বহনকারী একাধিক মিলিটারি ট্রাক আমাদের চোখে পড়ে। ঐ ট্রাকগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির ভিতর থেকে বেরিয়ে ময়মনসিংহ সড়ক ধরে সম্ভবত কেন্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছিল মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকার নিহত নারী পুরুষের বহু লাশ জড় করা হয়েছিল টিএসসির ভিতরে। ২৭ মার্চ সেই লাশগুলি পাচার করা হচ্ছিল দূরে কোথাও গণকবর দেবার জন্য জগন্নাথ হলের ভিতরে একটি গণকবর থাকার পরও কিছু লাশকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে দূরে কবর দেবার চিন্তাটা পাকসেনাদের মাথায় হয়তো এসেছিল এইরূপ বিবেচনা থেকে, যেন কোনো একটি গণকবরে খুব বেশি সংখ্যক লাশের সন্ধান কখনও পাওয়া না যায়

সেদিন মিলিটারি ট্রাক ঢেকে দেয়া ভারী ত্রিপলের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আসা লাল চুরিপরা একটি ফর্সা হাত আমি দেখেছিলাম সেই দৃশ্যটি আজও আমার চোখে ভাসে। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো নয়, কত কিছু আমি ভুলে যাই। ভুলে গেছি। কিন্তু আমার মর্মের গভীরে গেঁথে যাওয়া সেই হাতটিকে চোখ বুজলেই আমি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। মনে হয়, নিকটবর্তী রোকেয়া বা শামসুন্নাহার হলের কোনো অসহায় ছাত্রীর ডান হাত ছিল সেটি

জগন্নাথ হল : ২৭ মার্চ ১৯৭১

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেয়া হল।
দেড় দিন, দেড় রাত্রি গৃহবন্দী থেকে আমরা দু'জন
নগরীর রূপ দেখতে বাইরে বেরুলাম।
আজিমপুরের মোড়ে বেয়নেট বিদ্ধ এক তরুণের লাশ
স্বাগত জানালো আমাদের। তারপর বৃদ্ধ একজন।
অগ্নিদগ্ধ, মর্টারবিধ্বস্ত এই প্রাচ্য নগরীকে
মনে হল প্রাণস্পন্দনহীন এক মৃত প্রেতপুরী।

অপসৃত অদম্য প্রাণের গর্ব, ডানে-বাঁয়ে
সর্বত্র মৃত্যুর হাতছানি। যুবতী কন্যাকে নিয়ে
পালাচ্ছেন পিতা, মা'র কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু।
প্রিয়জনদের খোঁজে উদ্বিগ্ন মানুষ ছুটিছে সতর্ক,
যেমন সন্ত্রাসবিদ্ধ বনের হরিণ
হিংস্র নেকড়ের তাড়া খেয়ে ছোটে।

কারো পুত্র, কারো বন্ধু, কারো পিতা, কারো ভাই হয়ে
পথে পথে শুয়ে আছে ছিন্নভিন্ন মানুষের লাশ।
নগরীতে কারা বেশি? যারা মরে গেছে, তারা?
নাকি মেশিনগানের গুলি থেকে বেঁচে গেছে যারা?
সাতাশে মার্চের ভোরে এ-প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।

হত্যাক্লান্ত পাকসেনা বাঙালির রক্তে স্নান করে
সহাস্যে নগরপথে বেরিয়েছে প্রমোদ টহলে।
সাথে তাক করা নির্দয়, নিষ্ঠুর স্টেনগান।
জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণাবিকৃত মুখ, তবু দেশমাতৃকার গর্বে অমলিন।

জগন্নাথ হলের চত্বরে সবুজ ঘাসের বুকে
আক্রোশে খামচে ধরা ট্যাংকের দাঁতের কামড়।
গোবিন্দ দেবের রক্তে ভাসমান লাল শিববাড়ি।
আহা, কী হৃদয় বিদারক! হায়, কী করুণ!

পুকুরে ভাসছে এক যুবকের লাশ, যেন মরা মাছ
এ কি কবি আবুল কাসেম? তুমি কে গো ভাই?

জগন্নাথ হল আজও সেই দৃশ্যে স্থির হয়ে আছে

আমরা যখন ২৭ মার্চ সকাল দশটার দিকে পাক সেনাদের বর্বর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের প্রিয় নগরী ঢাকা-দর্শনে বেরোই, তখন আমাদের হাতে কোনো ক্যামেরা ছিল না। ক্যামেরা ছিল লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার দুঃসাহসী সাংবাদিক, পাকসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে শেরাটন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়া সায়মন ড্রিং-এর কাছে। সায়মন ড্রিং যখন মরহুম এ এস মাহমুদের সঙ্গে মিলে ঢাকায় একুশে টিভি চালু করেন, তখন একদিন আমি তাঁর মুখ থেকেই ২৭ মার্চে দেখা ঢাকা নগরীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমহর্ষক বর্ণনা শুনেছি। রোমহর্ষক শব্দটি পাক সেনাদের 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের মাধ্যমে ঢাকা নগরীর বুকে সংঘটিত বর্বরতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট পারঙ্গম নয়, জানি। কিন্তু কী আর করা যাবে? বাঙলাভাষার শব্দের সীমাবদ্ধতা আমাদের মানতেই হবে। শুধু বাংলাভাষা নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার জন্যই তা সত্য। মানুষের সুকৃতির একটা সীমা হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি সীমাহীন। জন্মের অনন্য পথ, মৃত্যু শতভাবে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে? এই প্রশ্নে আমাদের ভিন্ন মত থাকতে পারে, তবে তার সবচেয়ে বড় শত্রুটি যে মানুষ, তাতে কারও ভিন্ন মত নেই। রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইরাক আগ্রাসন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিশ্বের ইতিহাস থেকে বর্বরতার এমন বহু দৃষ্টান্ত আমরা স্মরণ করতে পারি। স্মরণ করা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মুখে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি নগরীতে আমেরিকার পরমাণু বোমাবর্ষণের ঘটনাটি। রোমহর্ষক শব্দটি দিয়ে আমরা আমেরিকা কর্তৃক সাধিত ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্টের পারমাণবিক-বর্বরতার ব্যাপকতাকে অতি সামান্যই বোঝাতে পারি। আমাদের জীবনে একনম্বসাত্তএক সালে উন্মাদপ্রায় পাকসেনাদের দ্বারা সাধিত বর্বরতাও ছিল সমগোত্রের। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, তখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা ছিল না। থাকলে আমি নিশ্চিত সেই পরমাণু-বোমা ওরা বাঙালির ওপর বর্ষণ করতো। পরমাণু বোমা ব্যবহারের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরাশক্তি আমেরিকা তো পাকিস্তানের পক্ষে ছিলই।

সায়মন ড্রিং ২৫ মার্চের রাতে শেরাটন হোটেলে ছিলেন। ভুট্টোর মতো সেই রাতে তিনিও নিজের চোখে দেখেছেন ঢাকার বুকে পরিচালিত পাক সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। দেখেছেন আগুনের লেলিহান শিখা। শুনেছেন পাক সেনাদের নিক্ষিপ্ত অগণিত গুলির গর্জন, আর নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যুচিৎকার। আর্তের গোঙানি। ঢাকার সংবাদ সংগ্রহ করে ড্রিং ব্যাংকক চলে যেতে সক্ষম হন এবং সেখান থেকে তাঁর পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠান। তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টের মাধ্যমে তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে জানান,

'In a despatch' from Bankok, published in the Daily Telegraph on March 29, Mr Dring described Dacca as a crushed and frightened city after 24 hours of ruthless shelling by the Pakistan Army, saying that as many as 7000 people were dead and that large areas had been levelled.

ধন্যবাদ সায়মন। আমার হাতে ক্যামেরা না থাকলেও, ক্যামেরা ছিল আমার চোখে। কবি বলে সেই ক্যামেরাটি কিছুটা সেনসেটিভ ছিল বলেই ধরে নিতে পারি। কে যেন আক্ষেপ করে বলেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্র বা সুনীতি চট্ট হবেন), লেখকদের বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের দুই চোখ দিয়ে যা দেখি, এক হাত দিয়ে তা লিখতে হয়। ইতিহাস বা ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করতে বসে আমি ঐ মহাজনবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেছি। অনেকগুলো দৃশ্যকে আমি বন্দি করে নিয়েছিলাম আমার স্মৃতির মণিকোঠায়। তাই বেশকিছুকাল পরে আমি যখন উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করি, তখন সাতাশে মার্চে প্রত্যক্ষ করা ঢাকা নগরীর একটি ক্ষুদ্র এলাকার লোমহর্ষক চিত্র আমার স্মৃতিভাণ্ড থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। সায়মন ড্রিং আমার এই কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিলেন এবং একুশে টিভির ২৫ মার্চের রাতে প্রচারিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ কবিতাটি বহুবার প্রচার করেছিলেন।

আমার কবিতায় আমি যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছি, ঐ এলাকার মধ্যে পড়ে আজিমপুর, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল। কবিতায় আছে, আমরা দু'জন.. । আমরা দু'জন বলতে, একজন ছিলাম আমি, দ্বিতীয়জন ছিল আমার বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ, পঁচিশের রাতে যে আমাকে গাওছিয়া মার্কেটের সামনের রাস্তা থেকে জোর করে ধরে আমার নিউ পল্টনের মেসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। রাত নয়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাজউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিনের বড় ভাই ক্যাপ্টেন কিবরিয়া সাহেবের বাসায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে, ঢাকা কলেজের সামনের চিটাগাং হোটেলে ভাত খেয়ে সর্বশেষ খবর জানবার জন্য আমি আমার পত্রিকা অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম আমার হাতে ঘড়ি না থাকলেও অনুমান করি, তখন রাত সাড়ে দশটার মতো হবে। পথে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয় আমি নিশ্চিত যে, ঐ রাতে নজরুল আমাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, আমি আমার পত্রিকা অফিসে যেতাম এবং পাক সেনাদের আক্রমণে পত্রিকা অফিসের আরও অনেকের সঙ্গে আমারও নির্ঘাৎ অপঘাতে মরণ হতো।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথিত আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক সেনাবাহিনীর ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির ক্যান্টনমেন্ট বলে বিবেচিত ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে

রাখা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। অপারেশন সার্চ লাইট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকসেনারা জহুর হলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তারা ধারণা করেছিল জগন্নাথ হল ও জহুর হল থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আসতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ঐ দুই হলের মাঠে ছাত্রদের সামরিক ট্রেনিং দেয়া হতো। ফলে ঐ হল দু'টিতে পাকসেনাদের আক্রমণের ভয়াবহতা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা আমাদের নিউপল্টনের মেসে বসে ঐ হলে পাকসেনাদের আক্রমণের খবর পাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছিল পুরো হল এলাকাটি। আমরা ঐসব রকমারি প্রাণকাঁপানো শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। হলের আগুনও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার অনুজপ্রতিম তরুণ কবি হেলাল হাফিজ তখন ঐ হলে থাকত। আমি, নজরুল আর আবুল হাসান বহুদিন হেলালের রুমে রাত্রি যাপন করেছি। আমরা হেলালের জন্য খুব চিন্তিত বোধ করি। হলে থাকলে তার পক্ষে মরণ এড়ানো কঠিন হওয়ারই কথা। হেলাল কি বেঁচে আছে? রাস্তায় টহলরত পাকসেনাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে ২৭ মার্চ সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমরা হেলালের সন্ধানে জহুর হলের ভিতরে প্রবেশ করি। অনেকেই প্রাণের ভয়ে সেখানে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছিল না। সামান্য কিছু লোক তখন সেখানে জড় হয়েছিল। আমরা এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি মাঠের একপাশে বেশ ক'টি মৃতদেহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাদের দেহ রক্তাক্ত। মুখ যন্ত্রণাবিকৃত ও আগুনে ঝলসানো। ভালো করে চেনা যায় না। দেখলাম মৃতদের মধ্যে আমাদের প্রত্যাশিত কবি হেলাল হাফিজ নেই কিন্তু আমাদের আরেক বন্ধু আছে, তার নামও হেলাল। সে ছিল ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক চিশতি শাহ হেলালুর রহমান। চিশতিও কবিতা লিখত। দু'দিন আগেও কবিতা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথাকাটাকাটি হয়েছিল শরীফের কেন্টিনে। আজ আমি ওর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। হলের সবুজ ঘাসের ওপর মোট বারোটি লাশ ছিল পাশাপাশি শায়িত। আমি শুনেছিলাম অন্যদের মধ্যে হলের ছাত্র ছাড়াও ছিল হলের কিছু কর্মচারী। মনে পড়ছিল ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি আবদুল গণি রোডে পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোর শহীদ মতিউরের কথা মতিউরের নামাজে জানাজা হয়েছিল এই হলের মাঠে। সেদিন ছিল মাঠ ভর্তি মানুষ। আজ ঐ একই মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে আছে এক ডজন যুবকের লাশ কিন্তু সেখানে কেউ আসছে না। সেখানে আজ আর নামাজে জানাজার কোনো আয়োজন নেই। ওদের নামও কেউ জানবে না কোনোদিন। ওই মৃতের সারিতে হেলাল হাফিজকে না দেখে আমরা খুশি। ওর বেঁচে যাবার সম্ভাবনা বাড়ল। তখনই হঠাৎ হল গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি হলের ভিতর থেকে হেলাল হাফিজ একটি ছোট্ট ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, হেলাল হাফিজই তো! আমরা দু'জন ছুটে গিয়ে হেলাল

হাফিজকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমাদের তিনজনের চোখেই যমের চোখে ধুলো দিয়ে বেঁচে যাওয়ার আনন্দাশ্রু।

পাকসেনাদের টহলগাড়ি হলের ভিতরে যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। কিছুক্ষণ আগে একটি মিলিটারি ভ্যান গেছে পলাশীর রাস্তা ধরে। আমরা তিনজন দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম জগন্নাথ হলের উদ্দেশ্যে। জগন্নাথ হলের মাঠে কবর খুঁড়ে নিহতদের গণকবর দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি। ঐ হলের পাশে, শিববাড়ি সংলগ্ন একটি একতলা বাড়িতে থাকতেন দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব। তাঁর পালকপুত্র সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও তৎপত্নী পূরবীর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আমাকে তিনি কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নেহ করতেন। অনিচ্ছার কথাটা বললাম এজন্য যে, আমার বেপরোয়া জীবনযাপনের কারণে তিনি বলতেন, তোমার পেছনে সিআইডির লোক ঘোরে। তুমি বিপজ্জনক। আমরা একসঙ্গে টেবিলে বসে খেতাম। আকৃতদার এই দার্শনিক ছিলেন একজন সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী মানুষ। তাঁর একজন পালিতা কন্যাও ছিল আমি তাঁকে দেখেছি। তাঁর নাম সম্ভবত জাহানারা তিনি অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ঘরের দেয়ালে তিনি কায়দে আজমের একটি ছবি টানিয়ে রেখেছিলেন এই নিয়ে তাঁকে আমরা একদিন খাবার টেবিলে খুব হেনস্তা করেছিলাম। বহুদিন আমি তাঁর গৃহে অন্নপাশ করেছি। আমি তাঁর বাড়িতে বেশি গেলে তিনি আমাকে ভয় পেতেন আবার বেশিদিন না গেলেও আমার খোঁজ করতেন। তাঁর অপত্য স্নেহ আমিও ভোগ করেছি। জহুর হল থেকে বেরিয়ে যখন শুনলাম যে জি সি দেবকে পাকসেনারা মেরে ফেলেছে, তখন আমি তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার দায়িত্ববোধ করলাম জ্যোতিপ্রকাশ ও পূরবী তখন আমেরিকায়। বাড়িতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন একা। আমরা ছুটলাম তাঁর বাড়িতে। গিয়ে দেখি তাঁর বাড়িটি জনশূন্য। খোলা বাড়ি পড়ে আছে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে বাড়ি ছেড়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। আমি তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম তাঁর রক্তাক্ত শয্যা। মেঝেতে নীল হয়ে পড়ে আছে জমাটবাঁধা রক্ত। টেলিফোনের রিসিভারটি শূন্যে ঝুলছে। তারের গায়ে লেগে আছে রক্তের ফোঁটা অন্তিম মুহূর্তে সরল বিশ্বাসে হয়তো কাউকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি যখন তাঁর মরদেহ সন্ধান করছি তখন বাড়ির পরিচারকদের মধ্যে একজন, আমি তার নামটা ভুলে গেছি, আমাকে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে জগন্নাথ হলের মাঠে খোঁড়া গণকবরে জগন্নাথ হলের ছাত্র-কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁকেও সমাহিত করা হয়েছে মধুর ক্যান্টিনের মালিক আমাদের প্রিয় মধুদাকেও হত্যা করেছে পাকসেনারা। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন হলের প্রোভোস্ট ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আমরা

জগন্নাথ হলের দিকে তাকালাম দেখলাম পূব দিকের দেয়ালটি ভাঙ্গা বুঝলাম ঐ দেয়ালটি ভেঙেই পাকসেনাদের ট্যাংকগুলি ঢুকেছিল হলের মাঠে গণকবর তৈরি করে নিহতদের কবর দিতে। হলের ভিতরে ঢুকে দেখি হলের পুকুরে বেশ ক'টি লাশ ভাসছে। পরে জেনেছি আমাদের কবিবন্ধু আবুল কাসেম ঐ রাতে জগন্নাথ হলে কবি অসীম সাহার রুমে ছিল। সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে অসীম পালিয়ে গেলেও কাসেম ভেবেছিল, নির্জন হয়ে আসা জগন্নাথ হল তাঁর কবিতা লেখার জন্য অনুকূল হবে। তার হিসেব মিলেনি। হেলাল হাফিজকে আমরা পেয়ে গেলেও আবুল কাসেম সেই রাতে নিহত হল। আমার মনে হয়েছিল জগন্নাথ হলের পুকুরে আমি সেদিন যে লাশগুলি ভাসতে দেখেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন ছিল কবি আবুল কাসেম।

বুড়িগঙ্গার ওপারে, স্বাধীন বাংলায়

ডক্টর গোবিন্দ দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবার কথা ভাবছিলাম। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক মানবেন্দ্র রায়ের শিষ্য। আমার পিসেমশাই স্বর্গীয় যতীন্দ্র বল মানবেন্দ্র রায়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁর রেফারেন্সেই আমি একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। আমি যে কবিতা লিখি, তিনি জানতেন। সেদিন তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলেছিলেন। আজ যাবো কাল যাবো করে আমার আর তাঁর বাসায় যাওয়া হয়নি। ডক্টর দেব রিটায়ার করার পর তিনি জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট হন। শহীদ মিনার সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে তিনি থাকতেন। জানতাম তাঁর পুত্র নেই, আছে একমাত্র কন্যা মেঘনা আর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা। বাসন্তী দেবী মনিজা রহমান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ২৬ মার্চের সকালে জ্যোতির্ময়বাবু পাকসেনাদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। পাকসেনারা ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তিনি তখনও মারা যাননি। ডক্টর দেবের বাসায় গিয়ে একজনের কাছে জানলাম, কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন–। এই খবরটি জানার পর আমার খুব ইচ্ছে হল, হাসপাতালে গিয়ে স্যারকে দেখে আসি। আমার প্রস্তাবে হেলাল ও নজরুল হাসপাতালে যেতে রাজি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

আমরা তিনজন যখন ডক্টর গোবিন্দ দেব-এর বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একটা রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে ডক্টর দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা যেই পথে নেমেছি, তখনই দেখতে পাই একটি মিলিটারি কনভয় পলাশির দিক থেকে আমাদের অর্থাৎ উত্তরের দিকে আসছে। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। ততক্ষণে আমরা মিলিটারিদের দৃষ্টিসীমার ভেতরে পড়ে গেছি এখন আমাদের পক্ষে তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। সে চেষ্টা আমাদের জন্য আরও ক্ষতির কারণ হতে পারে। তখন ক্ষীণকণ্ঠে নজরুল বলল, আমরা ঐ মিলিটারি কনভয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পথের পাশে দাঁড়াই, লেট দি কনভয় গো। নজরুলের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা তিনজন তখন ঐ পথের পাশে জমিয়ে রাখা নুড়িপাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যাই।

মিলিটারি কনভয়টি আমাদের দিকে যতই এগিয়ে আসে, আমাদের ভয় ততই বাড়ে। আমি আমার লম্বা গোঁফ নিয়ে পড়ি মহাবিপদে। ২৩ মার্চ দাড়ি কেটে ফেলার সময় আমার গোঁফগুলি কেন যে আমি কেটে ফেলিনি! দীর্ঘদিন দাড়ির সঙ্গে মিশে ছিল বলে আমার গোঁফের ঘনত্ব ও দৈর্ঘ্যটা টের পাওয়া যায়নি মুখমণ্ডল থেকে ঘনকৃষ্ণ দাড়ির আড়াল অপসৃত হওয়ার পর আমার গোঁফের ঔদ্ধত্য প্রকাশ্যে চলে আসে। তাই দেখে, ২৫ মার্চের রাতে ক্যাপ্টেন কিবরিয়া আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি অবশ্যই আপনার গোঁফগুলো ছেঁটে ফেলবেন। মিলিটারিরা সিভিলিয়ানদের বড় গোঁফ একেবারেই টলারেট করতে পারে না। ওদের সামনে পড়লে আপনার কিন্তু খুব বিপদ হবে। যিনি কথাটা বলেছেন, তিনি নিজে একজন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা। আমার মনে হল, তিনি যথার্থ বলেছেন। আরও আগেই তাঁর নির্দেশ আমার পালন করা উচিত ছিল। মনে হল, বেটার লেট দেন নেভার। আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আমার গোঁফ যতটা পারি আমার ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করব। দাঁত দিয়ে পুরো গোঁফটা কাটা হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু সেও হবে আমার জন্য মন্দের ভালো। পাকসেনাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে আমি যে আমার গোঁফগুলি দাঁত দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করেছি, পাকসেনারা হয়তো আমার সেই ভয়ার্ত উদ্যোগটাকে তাদের ক্ষমতার প্রতি আমার আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করলে করতেও পারে কথায় বলে জান বাঁচানো ফরজ। জান বাঁচলে তো গোঁফ আগে তো জানটা বাঁচাই। আমি দ্রুত আমার গোঁফগুলি মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করলাম। বুঝলাম, আমার বাঁচামরার প্রশ্নটি এখন আমার গোঁফের ওপর নির্ভর করছে। মানুষ যে কী পারে আর কী পারে না, তা মৃত্যুর মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত জানা যায় না স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁতকে ক্ষুর বা কাঁচির মতো বানিয়ে নিজের গোঁফ কাটার কথা, জানি কারও পক্ষে কোনোদিন ভাবাও সম্ভব হতো না। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মুখে পড়ে, যমসদৃশ পাকসেনাদের ভয়ে আমার পক্ষে সেই অভাবিত ও অসম্ভব-বিবেচিত কর্মটি কত অনায়াসেই না সম্পন্ন করা সম্ভব হল মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার দীর্ঘঘনকৃষ্ণ গোঁফের অনেকটাই ছেঁটে ফেলতে সক্ষম হলাম।

ততক্ষণে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে মিলিটারি কনভয়টি আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো। মুখে-চোখে, হাতে-পায়ে, গায়ে-গতরে যতটা সম্ভব বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে আমরা তাদের এমনভাবে সেলাম ঠুকলাম, যাতে মনে হয় যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় কর্তব্য পালনরত বীর পাকসেনাদের দেখা পেয়ে আমাদের জীবন সত্যিই ধন্য হয়েছে। আকস্মিকভাবে নয়, বহুপুণ্যবলেই আমরা আজ এতো কাছে থেকে তাঁদের দর্শন পেয়েছি। সামনের জিপটিতে ছিল একজন বালুচ ক্যাপ্টেন। খুব

সুদর্শন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি স্বর্গ থেকে কার্তিকের চেহারাটা কেড়ে নিয়ে এসেছেন। আমি পৌত্তলিক। চিরকুমার হলেও কার্তিক আমার অন্যতম প্রিয় দেবতা। আমি করজোরে নিজেকে সমর্পণ করে ভক্তবৎ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম কোনো কারণে যদি আমার লিঙ্গপরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন যেন গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, প্রভু, আপনাকে আমি হত্যাক্রান্ত পাকসেনারূপে মোটেও বিবেচনা করছি না। আপনি আমার কার্তিক ঠাকুর আমি আপনার পূজারী একজন সাচ্চা পাকিস্তানী হিসেবে আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না। শুধু আমাকে আপনার পূজা করার সুযোগ দিন।

নজরুল আর হেলাল তখন কী করেছিল আজ আর তা মনে করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একা ভক্তের পরীক্ষা নেবার জন্য আমার সামনে আপাতত বালুচসন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন পার্বতীপুত্র কার্তিক। যদিও কার্তিকের বাহন ময়ূর, কিন্তু সেদিন তাঁর বাহন হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করা ট্রাকে কোনো ময়ূর ছিল না, ছিল সিভিল পোশাক পরা ময়ূরপুচ্ছধারী কিছু বিহারি। তাদের হাতে ছিল গুলিভর্তি রাইফেল তারা আমাদের দিকে সেই রাইফেল তাক করে আমাদের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করছিল। তারা ছিল তাদের ক্যাপ্টেনের অর্ডারের অপেক্ষায় আদেশ পাওয়ামাত্র তারা আমাদের ওপর গুলি চালাবে— এমন ভাবই ছিল তাদের চোখে মুখে। নজরুল করাচীতে অনেকদিন হোটেলের ফ্রন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে এসেছে। উর্দু তো ভালো জানতোই, কিছুটা বালুচও জানত মনে হয়, আমার পৌত্তলিকবিনয়ভঙ্গিটি নয়, নজরুলের বালুচ ভাষা জানাটাই সেদিন আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিল। উর্দু মেশানো বালুচ ভাষায় নজরুল বলল, আমরা হাসপাতালে যাচ্ছিলাম আমাদের একজন নিকট আত্মীয়ের খোঁজ নিতে ঐ মিথ্যা কথাটা বালুচ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল বলেই সত্যের মতো মনে হল। ফলে বিহারিরা আমাদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ আর পেলো না। ক্যাপ্টেন সাহেব তাদের নির্দেশ দিলেন, পথের ওপর পড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের বেরিকেডটিকে সরানোর জন্য অগত্যা আমাদের মতো তিনতিনজন জোয়ান মর্দ বাঙালিকে বাগে পেয়েও বধ করতে না পারার বেদনা নিয়ে অধস্তন জোয়ান ও 'অপারেশন সার্চ লাইট মিশন' বাস্তবায়নের জন্য রিক্রুটকৃত সিভিল বিহারিরা মিলিটারি ট্রাক থেকে নেমে পথের বেরিকেড সরাতে হাত লাগালো। আমরাও ক্যাপ্টেনের কাছে ঐ বেরিকেড সরানোর রাজকাজে হাত লাগানোর অনুমতি চাইলাম।

তখনই একটি পরিবার ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে ঐ পরিবারে ছিল একজন মধ্যবয়সী মহিলা একটি কিশোরী ও একটি কিশোর। যে কিশোর ছেলেটি তাঁর ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের একটি পুঁটলা মাথায় নিয়ে পথ চলছিল,

আকস্মিকভাবে পাকসেনাদের সামনে পড়ে তার চলৎশক্তি হারিয়ে মাথার পুটলা-পুটলি সহ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তখন ঐ পুটলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা কাঁসার থালা-বাটি, আলু-মরিচ আর কাঁথা-বালিশ পথের ওপর গড়াতে থাকে। পলায়নপর পরিবারের সদস্যরা এভাবে হঠাৎ যমসদৃশ পাকসেনাদের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় কিছুতেই লুকাতে পারে না। পথের ওপর আছড়ে পড়া কাঁসার থালা-বাসন আর ঘটিবাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে ছেলেটি মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাকসেনাদের দৃষ্টি তখন ঐ পরিবারটির ওপর স্থানান্তরিত হয়। তারা একটি সন্ত্রস্ত বাঙালি পরিবার কর্তৃক সৃষ্ট দৃশ্যটিকে সানন্দে উপভোগ করে। আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেই। আমাদের উদগত চোখের জল সাত হাত মাটির নিচে চাপা দিয়ে আমরাও হাসি। তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের শেষ-পরীক্ষায় আমরা তিনজনই উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হই ঐ বালুচ ক্যাপ্টেনটি তখন আমাদের পিঠে তার হাতের বেতটি দিয়ে মৃদু প্রহার করে বলেন, –ভাগো হিয়াসে '

আত্মীয়দর্শনে হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বকথা ভুলে গিয়ে, ক্যাপ্টেনকে একটা দীর্ঘ স্যালুট জানিয়ে আমরা টিএসসির দিকে পা বাড়াই। পা বাড়াই বটে কিন্তু আমাদের পা চলে না। ভয়ে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। পিঠ শিরশির করে, এই বুঝি গুলি আসে। ভাবি, ওরা হয়তো ভিন্ন রকমের মজা পাওয়ার জন্য সামনে দিয়ে না মেরে আমাদের তিন বন্ধুকে পেছন দিক দিয়ে মারবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত ঐ ক্যাপ্টেন কী এক অজানা খেয়ালে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়। জন্মসূত্রে বালুচ বলেই মনে হয়, পাঞ্জাবিদের মতো নির্বিচারে বাঙালি নিধন করার ব্যাপারে তার ততোটা আগ্রহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা পাকসেনা ও বিহারিদের স্যুটিং রেঞ্জের বাইরে চলে আসি।

পাকসেনারা ঐ দিনই সলিমুল্লাহ হলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া তিনজন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। আমার ধারণা, যে মিলিটারি কনভয়টির সঙ্গে জগন্নাথ হলের পূর্বদিকের বকশীবাজারমুখী রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল, ওরাই ওই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকবে। যে সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্বিচার গণহত্যার ছাড়পত্র নিয়ে নিজদেশের নিরস্ত্র নাগরিকের বিরুদ্ধে মাঠে নামে, দায়বদ্ধতাহীন সেই সৈনিকদের যমের সঙ্গে তুলনা করলে, যমেরও মর্যাদা হানি হবে। ১৯৭১ সালে প্রখ্যাত পটুয়া কামরুল হাসান ইয়াহিয়া খানের একটি বীভৎস প্রতিকৃতি এঁকে ঐ ছবির নিচের ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'এই জানোয়ারটি মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা এই জানোয়ারটিকে হত্যা করি।' আমার মনে হয় না, ইয়াহিয়া খানের বর্বর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনা করার মতো সত্যিই কোনো বিশেষ জানোয়ারের ধারণা কামরুল হাসানের মাথায় ছিল না। কী করে থাকবে? বর্বর

ইয়াহিয়া খানের মতো কোনো জানোয়ার তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। আমার মনে হয়, তুলনা করার মতো আর কিছু না পেয়ে, অনন্যোপায় হয়েই তিনি সেদিন ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে 'জানোয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

পলায়নপর ঐ পরিবারটির ভাগ্যে সেদিন শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, আমরা জানি না আমরা স্থির করি, আর ঢাকায় নয়। সময় থাকতেই ঢাকা ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে। আমরা দ্রুত আমাদের মেসে ফিরে যাই। কামরাঙ্গীর চর তখনও আজকের মতো পরিচিতি লাভ করেনি। ঢাকার মানুষজন নবাবগঞ্জ হয়ে, নদী পেরিয়ে ঐ পথে ঢাকা ত্যাগ করছিল। আমরাও তাদের অনুসরণ করি। ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে আমি চায়না বিল্ডিংয়ের সামনের একটি দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে এক প্যাকেট থ্রি ক্যাসেল সিগারেট কিনি। সামর্থ না থাকলেও আমি মাঝে মাঝে ঐ সিগারেটটি খেতাম। ভাবি, কী আছে জীবনে? মরার আগে ভালো সিগারেট খেয়ে নেই।

নবাবগঞ্জ বাজার পেছনে ফেলে, খোলামোড়া হয়ে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে আমরা নদীর ওপারে চলে যাই। নদী পার হয়ে দেখি ওপারে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করছে। সেখানে আমরা আমাদের কিছু পরিচিত মানুষজনকেও দেখতে পাই। সবাই ছুটে চলেছে অজানার পথে। কারও কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। নদীর ওপারের মানুষরা এপারের মানুষদের সাদরে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল, ফলে ঢাকা ছেড়ে ওপারে চলে যাওয়া লোকজনের কোনো অসুবিধা হল না। অনেক পরিবারই অপরিচিত মানুষদের ঘর-বাড়িতে আশ্রয় নিলো দেখলাম ওপারের ছেলেরা দল বেঁধে ঢাকা থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা পথক্লান্ত মানুষজনকে সাগ্রহে পানি খাওয়াচ্ছে। যেন বেদনাকে পাশে ঠেলে প্রধান হয়ে উঠেছে একটা উৎসবের ভাব বাঙালি যেখানে একত্রিত হয়, সেখানেই বসে তার প্রাণের মেলা। 'নদীর ওপারে সুখ আমার বিশ্বাস' - কবির এই কাব্যকথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেলো। আমরা তিনজনই ঝাড়া হাত পা। আমাদের সঙ্গে পরিবারের বোঝা নেই আমাদের যেখানে রাত সেখানেই কাত।

বেবী নামে আমাদের একজন বন্ধু ছিল। সে তার পরিবারের বেশ ক'জন সদস্যকে নিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে ছিল একটি ব্যাটারি চালিত রেডিও সন্ধ্যার দিকে ঐ রেডিওর নব ঘুরাতে গিয়েই আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি নতুন বেতার কেন্দ্রের সন্ধান পাই। সেই বেতার কেন্দ্র থেকেই মেজর জিয়া নামে একজন বাঙালি-সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। মেজর জিয়া নামটি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের প্রাণে গেঁথে যায়। প্রলম্বিত জয়বাংলা বাংলা ধ্বনিতে আমরা তাঁর সেই ঘোষণাকে চিৎকার করে স্বাগত জানাই। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনো তথ্য না পেয়ে

আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। তিনি কি বেঁচে আছেন? পাকসেনারা কি তাঁকে গ্রেফতার করেছে? আমরা কিছুই জানতে পারছিলাম না মেজর জিয়ার সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি শুনে আমরা জানতে পারলাম যে, মুজিব বেঁচে থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়ে গেছে এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে আমাদের একটি নিজস্ব বেতার কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি কোথায়, তখন তা জানার উপায় ছিল না।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে বলে আমি এ-ব্যাপারে একটু বিস্তৃত করে ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী মনে করছি বিএনপি দাবি করে চলেছে যে, জিয়াই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। তাদের স্লোগান –'স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া লও লও লও সালাম।' অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ বলছে, জিয়া হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'যথাযথভাবে' ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণার পাঠকমাত্র। ঘোষক আর পাঠক– এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষকও নন, আবার পাঠকমাত্রও নন বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, তা ঐদিনই গভীররাতে চট্টগ্রামে পৌঁছায় এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরবর্তীকালে 'বিপ্লবী' শব্দটা বর্জন করা হয়) থেকে বহুবার পাঠ করা হয়

সম্প্রতি (২৭ ২৯ জানুয়ারি ২০০৭) আমি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক বাংলা কবিতা উৎসব'-এ গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সংগঠক বেলাল মোহাম্মদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনিও অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে এসেছিলেন। আমি একাত্তরের ওপর লিখছি জেনে তিনি মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি তিনি নিজেই বহুবার পাঠ করেছেন পাঠ করেছেন আবদুল্লাহ আল ফারুকও। ফারুক এখন জার্মান বেতারে কাজ করেন। পরে পাকপক্ষত্যাগী বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে কালুরঘাটে আসা জিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলে তিনিই জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করার অনুরোধ জানান জিয়াকে তিনি বলেন, আমরা হলাম মাইনর, আপনি মেজর, আপনি যদি ঐ ঘোষণাটি পাঠ করেন তাহলে তার একটা আলাদা প্রভাব পড়বে। বেলাল মোহাম্মদের প্রস্তাবে জিয়া রাজি হন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি হুবহু পাঠ না করে, নিজেই একটি ঘোষণা তৈরি করেন এবং ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে তা পাঠ করেন। ইংরেজীতে লেখা সেই ঘোষণাটি ছিল এরকম :

'I, Major Zia, Provisional Comander in Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independebce of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal government under Sheikh Mujitur Rahman which pledges to function as per law and constilution. The new democratic government is committed to a policy of non-aligament in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh

The government under Sheikh Mujibur Rahman is the sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world

লক্ষণীয় যে, মেজর জিয়া কর্তৃক প্রণীত ঘোষণাপত্রটিতে তিনবার শেখ মুজিবের নাম এসেছে। মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে তা যে হালে পানি পাবে না, একাত্তরের বাস্তবতায় জিয়ার তা অজানা ছিল না। মেজর জিয়া তখন শুধু একটি সৈনিক-নাম বৈ কিছু নয়। জিয়ার জায়গায় মেজর রফিক বা মেজর অলি বা মেজর শওকত হলেও সেই ঘোষণাটির তাৎপর্য একই হতো। যে কোনো বাঙালি মেজরই তখন জিয়ার বিকল্প হতে পারতেন–, কিন্তু শেখ মুজিবের বিকল্প সন্ধান ছিল অচিন্ত্যনীয় তাঁর নামটি ছিল সূর্যের মতো স্থির এবং আকাশের মতো অলঙ্ঘনীয়।

আমি নিজ কানে বিশ্ববাসীর জ্ঞাতার্থে প্রচারিত ইংরেজি ভাষায় রচিত জিয়ার সেই ঘোষণাটি শুনিনি। আমরা বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে ২৭ মার্চ অপরাহ্ণের দিকে জিয়ার যে-ঘোষণাটি শুনি, তা ছিল বাংলায় প্রদত্ত। তাতে তিনি বলেন :

'আমি, মেজর জিয়া, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি দেশের সর্বত্র পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রিয় দেশবাসী, আপনারাও যে যেখানে আছেন হাতের কাছে যা কিছু পান তাই দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ইনশাল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এই সাথে আমরা বিশ্বের সকল মুক্তিকামী দেশ থেকে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি জয় বাংলা

(সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২)

আর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রেরিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল এরকম :

> 'এটা'ই হয়তো আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে, তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'
>
> – শেখ মুজিবুর রহমান

(সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১)

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, মেজর জিয়ার ড্রাফটে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটির সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাবাণীটি চোখের সামনে রেখেই মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণাটি লিখেছিলেন। অনস্বীকার্য যে, মেজর জিয়ার ড্রাফটটি ছিল সুলিখিত। কিন্তু কোনোভাবেই তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার সমার্থক ছিল না। মেজর জিয়ার সেই অধিকারও ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই সেই অধিকার ছিল তাঁর ঘোষণাটিই আমাদের স্বাধীনতা ও সংবিধানের ভিত্তি। সঙ্গতকারণেই তাই, পরবর্তীকালে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুজিবনগরে গঠিত প্রবাসী সরকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এ [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটিকেই 'যথাযথভাবে প্রদত্ত' বলে সন্নিবেশিত করে

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মেজর জিয়া সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার যে সুযোগ লাভ করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। জাতি সে-কথা সানন্দে স্মরণ করবে আমি মনে করি, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে নয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা-প্রচারকারী হিসেবেই তিনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়া যে জয় বাংলা বলে তাঁর ঘোষণাটি শেষ করেছিলেন, এবং তিনবার শেখ মুজিবের নাম নিয়েছিলেন, সেকথা আমরা যেন ভুলে না যাই। যেন ভুলে না যাই এই কথাটি যে, শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হওয়ার আগেই, অর্থাৎ ২৬ মার্চই বাংলাদেশের বিশ্বস্বীকৃত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাযথভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও স্বাধীন বাংলা

বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে তা ২৬ মার্চ বহুবার প্রচার করা হয়। শুধু তাই নয়–শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ট্রু কপিটি সাইক্লোস্টাইল করে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়েও দেয়া হয়। এ-ব্যাপারে আমাদের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহসী-কর্মীদের সাক্ষ্যকে অবশ্যই আমলে নিতে হবে। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও কবি বেলাল মোহাম্মদকে জিরো বানিয়ে মেজর জিয়াকে হিরো বানানো যাবে না। সুখের বিষয় যে, জীবদ্দশায় জিয়া নিজে কখনও তা করেননি। বরং 'অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর রহমান' কথাটা টেপ থেকে ইরেজ করে দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হলে, জেনারেল জিয়া তা বাতিল করে দিয়েছিলেন বলেই আমি জানি।

হিটলারের প্রচার মন্ত্রী জোসেফ পল গোয়েবলস বলতেন, একটি মিথ্যা যদি বারবার উচ্চারিত হয়, তাহলে একসময় সে সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ও মানুষের মন থেকে সত্যকে সরিয়ে দেয়। তাঁর ঐ যুদ্ধকালীন প্রচার-তত্ত্বকেই গোয়েবলসীয় তত্ত্ব বলা হয়। সেই গোয়বলসই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, যখন জার্মানীর পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছিল, তখন তিনি তাঁর সৎপুত্রকে (স্টেপ সান) লেখা একটি পত্রে বলেছিলেন :

> "Do not let yourself be disconcerted by the worldwide clamor that will now begin," he urged in a letter written to his stepson just days before his death. "There will come a day when all the lies will collapse under their own weight, and truth will again triumph."

এই গোয়েবলসের কথা আমরা অনেকেই জানি না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে জিয়াউর রহমানের ভাষ্য

পৃথিবী নামক এই ক্ষুদ্র গ্রহপৃষ্ঠে তিরিশ লক্ষ প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নামের এই দেশটি যতদিন তার প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বর্তমান অবয়ব নিয়ে টিকে থাকবে, ততদিন এই ভূখণ্ডের মানুষ পরম শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে স্মরণ করবে। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই খালেদা-নিজামির জোট সরকার স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে আমার নির্দোষ কবিতাটিকে বাদ দিলেও, হয়তোবা, দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের মতো, ঐ ভাষণ নিয়ে রচিত আমার 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' — কবিতাটি টিকে যেতে পারে। তা আমার কবিতাটি টিকুক আর নাই টিকুক, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি যে টিকে থাকবে, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার কাছে ঐ ভাষণটিকে একটি রাজনৈতিক কবিতার মতো মনে হয়, যা কমপ্লিট ইন ইটসেলফ। ঐ ভাষণটিকে আমি বাঙালি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পদ (ইনটিলেকচুয়েল প্রপার্টি) বলে মনে করি।

৭ মার্চের ভাষণটিকে কেউ কেউ আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণটি গেটিসবার্গ এ্যাড্রেসের চাইতেও এগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন কালজয়ী নেতা প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ শ্রবণের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখেই আমি বলি, বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণের চেয়ে সুভাষণ আমি শুনিনি।

আমাদের নতুন ও অনাগত প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জ্ঞাতার্থে ঐ ভাষণটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি.

১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস, ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছেন। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করব— এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও— একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে, তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ অ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হল, দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হল, বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন জনগণ সাড়া দিলো। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে, আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেমব্লি কল করেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসি তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না আমার এ দেশের মানুষের অধিকার চাই আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের ওপর হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই,—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলার-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো

> চলবে। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।[১]

এটিই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু-প্রদত্ত সেই ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ। বজ্রকণ্ঠের ঐ ভাষণটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শৌর্যের প্রতি কৃত্রিম উদাসীনতা প্রদর্শনকারী মহলের জ্ঞাতার্থে এবার আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা-প্রদানকারী জিয়াউর রহমানের নিষ্কলুষ মূল্যায়ন কেমন ছিল, সে বিষয়ে আমাদের নবপ্রজন্মের সন্তানদের অবহিত করা প্রয়োজন বোধ করছি

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সুলিখিত নিবন্ধে তিনি বলেন

একটি জাতির জন্ম

জিয়াউর রহমান

> ফেব্রুয়ারীর (১৯৭১) শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরনুখ হয়ে উঠেছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকেরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে, তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এলো ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হল ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হল। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকে আরো গোলযোগের সূচনা হল। এইসময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের নিরাপত্তা এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ

রেজিমেন্টের জোয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতিরাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায়। নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনেই ছুরিকাহত বাঙালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায় এই সময়ে আমাদের কম্যান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানযুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ রাখার জন্যেও লোক লাগায় মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং নিরস্ত্র করার উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকান পাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব কর্নেল (তখন মেজর) শওকত আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই, তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনলাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলব সম্ভবতঃ ৪ মার্চ আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হল। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ মার্চ শুরু হল বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে

পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হল, বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করল। চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীতে শক্তি বৃদ্ধি করা হল। ১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম এক চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সংগে নেবার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকেও পরিকল্পনাভুক্ত করলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বলল—ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম ২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে গেলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েকদফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হল বিপুল সংখ্যায় বাঙালী। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম তারপর এল সেই কালো রাত ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১১টায় আমার কম্যান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌ-বাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর পাকিস্তানী প্রহরী থাকবে তাও জানানো হল। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে আমার তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে অবশ্য

কম্যান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে আমার প্রতিক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হল পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এল মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমেদের কাছ থেকে এক বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে তারা হত্যা করেছে এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি বললাম— আমরা বিদ্রোহ করলাম তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। ওলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌ-বাহিনীর ট্রাকের নিকট ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌ-বাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই। এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম।

ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোলো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌ-বাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিলো। আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এল। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষীসোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে

যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারেনটিডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হল। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জওয়ানদের ডাকলাম, তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটা দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না, কো-ন-দি-ন না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণা সম্পর্কে মার্কিন দলিল

জেনারেল জিয়া তাঁর লেখায় বেশ ক'টি জিনিস স্পষ্ট করতে পেরেছেন, যা আমরা ভালো করে জানতাম না। ১ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি তাঁর কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান তাঁর লেখায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলে দু'বারই অভিহিত করেছেন। ২ তিনি নিজেও তাঁর সহকর্মী এবং অধীনস্থ সৈনিকদের আসন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। ৩. পাকসেনারা যে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের নির্বিচারে বাঙালি নিধন করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, তাঁর লেখা থেকে সেই সত্যটাও বেরিয়ে এসেছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সে কথা বলেছি। ২৭ মার্চ আমরা নিহত দার্শনিক জি সি দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে যে সেনাকনভয়টির সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেখানে পাকবাহিনীর সঙ্গে রাইফেল হাতে সিভিল বিহারিরাও ছিল। শুধু ঢাকায় নয়, এটা যে চট্টগ্রামেও ছিল, তা জানা গেলো জিয়ার লেখা পড়ে।

কিন্তু খুব বড় রকমের একটা অস্পষ্টতা রয়ে গেলো তাঁর লেখায়। সেটি হচ্ছে, তিনি তাঁর রচনার শেষে স্পষ্ট করে বলেননি ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের ২টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশে কী এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন ঐ দিনটিকে স্মরণ রাখবে এবং কেনই বা তারা ঐ দিনটিকে কোনোদিন ভুলবে না। তাঁর ভাষায়... কো-নো-দি-ন না। আমরা জানি ২৬ মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭৪ সালে জিয়া যখন তাঁর স্মৃতিকথামূলক এই লেখাটি তৈরি করেছেন, তখন তিনিও তা জানতেন। প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাঁর লেখাটিতে তিনি সেকথা অস্পষ্ট রাখলেন কেন? বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদটি কি তবে তিনি ঐ রাতের ২ টা ১৫ মিনিটে জেনে গিয়েছিলেন? নাকি তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের বিদ্রোহ করার জন্য তিনি ঐ রাতে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই আহ্বানক্ষণটাকেই ইঙ্গিত করলেন? তাঁর রচনার ঐ অস্পষ্টতা শুধু যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয় তা নয়, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে যারা জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবেন, তাদের দাবিকেও দুর্বল করে

মার্কিন সরকারের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সম্প্রতি ১৯৭১ সালের কিছু গোপন দলিল প্রকাশ করেছে। সেখানে স্পষ্ট করে মার্কিন সরকারকে ঢাকা অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ২টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। হোয়াইট হাউস সেই

বার্তাটি পেয়েছে ৩ টা ৫৫ মিনিটে। সুতরাং মার্কিন সরকারের প্রকাশিত গোপন দলিলের সঙ্গে জিয়া বর্ণিত সময়ের কিছুটা মিল পাওয়া যাচ্ছে

নিচে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ সম্পর্কিত ১৯৭১ সালের গোপন দলিলটির অনুলিপি দেয়া হল।

THE GOVERNMENT OF USA

DEFENCE INTELLIGENCE AGENCY
OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION
DL-2
DIA REPORT
WHITE HOUSE SITUATION ROOM
MAR 26 PM 3.55
Date 26 March, 1971
Time : 1430 EST

SUBJECT : Civil War in Pakistan

Reference :

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be 'the soverign independent People's Republic of Bangladesh' Fighting is reported heavy in Dhaka and other eastern cities where the 10,000-men paramilitary East Pakistan Rifels has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringest martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results
2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help Their intentions might be overruled, however, if the fever of Bengali nationalism spills across the border.

3. Seikh Mujibur Rahman is little interested in foriegn affairs and would co-operate with the United States if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the begining and both sides will find the United States a convinient scapegoat

DISTRIBUTION

White House Sit Room (LDX)
Depertment of State RCI (LDX)
Director of CIA Opns Cen (LDX)
Released by Jhon J Pavelle, JR
Captain, USN
DI 4/71564
Prepared by Jhon B Hunt
Major, USA
DI 4A3/25009

The above despatch entitled 'Civil war in East Pakistan' was sent by US defence Intelligence Agency in Dhaka on 26 March, 1971 at 3:55 pm EST.
The document mentions about the proclamation of independence by Sheikh Mujibur Rahman in which he, apart from declaring East Pakistan as sovereign and independent state, named the state as People's Republic of Bangladesh

আশা করি, অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের অবসান হবে। মনে রাখতে হবে যে একটি জাতির স্বাধীনতার ঘোষক দুই জন হতে পারে না। এবং তা পারে না বলে নয়, বাস্তবেও তেমনটি হয়নি বলেই। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান যে 'স্বরচিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি' প্রচার করেছিলেন, সেটি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে সংযুক্তিসূত্রেই জিয়া মুহূর্তে মূল্যবান হয়ে উঠেছিলেন। অন্যথায় নহে তবে, পুনরাবৃত্তি হলেও, প্রিয় গানের মতোই জিয়ার ঐ ঘোষণাটিও একাত্তরের মুক্তিকামী বাঙালির কাছে যথেষ্ট উদ্দীপক ও মূল্যবান বলেই মনে হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের-ঘোষক বিতর্ক : অবসানপর্ব

আমার চলমান রচনায় 'মুক্তিযুদ্ধের-ঘোষক বিতর্ক' নিয়ে আমি সময়ের যে অপচয় করেছি, তার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু তা না করে আমার উপায়ও ছিলনা ইতিহাস বিকৃতির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে বিভ্রান্তিতে ভুগছে, তা থেকে তাদের চিন্তকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আমার পাঠক আমার ওপর সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জানবার যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, আমি তাদের সে-প্রত্যাশা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের পাতা থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার এই বিরক্তিকর কাজটি যে আমাকে করতে হবে, তা জানতাম বলেই এতোদিন সেই দায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা গেলো না। কী আর করা যাবে, বিধাতার ইচ্ছা বলে কথা। মাতৃকুলরক্তসূত্রে মনসামঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত-র মতো বাঙালির ইতিহাস রচয়িতা নীহার রায়-অসীম রায়ের সঙ্গে যে সংযুক্ত তার পক্ষে কাব্য বা ইতিহাস কোনোটাই এড়ানোর উপায় থাকে না। মনে হয় আমার রক্ত পরীক্ষা করলে কাব্য ও ইতিহাস এই দুই ব্যাধির জীবাণুই কমবেশি পাওয়া যাবে। রক্তের দোষই যদি না হবে, তবে ইতিহাসনিষ্ঠ আত্মজীবনী লিখতে যাবো কোন আক্কেলে?

'আমার কণ্ঠস্বর' কাঠে করে প্রয়াত সাগরময় ঘোষ ও অন্নদাশংকর রায় আমাকে এমন উসকানি দিয়ে গেছেন, যে তাঁদের মৃত্যুর পরও আমি ভাবতে পারছি না যে তাঁরা আজ আর বেঁচে নেই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমার এই রচনাটি তাঁরা দু'জনই পড়বেন। ওঁরা দু'জনই আমাকে আমার আত্মজীবনীর পরবর্তী খণ্ড লেখার জন্য বলেছিলেন। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার জীবনকথা নয়, তিরিশ লক্ষ প্রাণের মূল্যে মুক্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনবেদ জানাটাই ছিল তাঁদের অভিষ্ট। তাঁরা বেঁচে থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। আলস্যহেতু বিলম্বে লেখাটি শুরু করার কারণে আমার এই দুই প্রিয় মনস্বী পাঠককে আমি হারিয়েছি। হারিয়েছি আমার আরেক প্রিয়জন, কবি শামসুর রাহমানকে তিনিও আমাকে লিখতে বলেছিলেন। আত্মজীবনী আর লিখবো না, তাঁকে এমন ধারণাই আমি দিয়েছিলাম। আজ তাঁদের কথা আমার খুব মনে পড়ছে।

আপাতত মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক বিতর্কের ইতি টানছি আমার প্রিয় শিক্ষক যতীন সরকারের লেখা 'প্রথম আলো' পত্রিকা কর্তৃক বিবেচিত ১৪১১ সালের বর্ষসেরা গ্রন্থ 'পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থ থেকে বিবেচ্য বিষয়টি নিয়ে লেখা তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে। ১৯৭১ সালের আন্দোলন-উত্তাল মার্চ মাসে অধ্যাপক যতীন সরকার ময়মনসিংহে ছিলেন। তিনি তখন নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যাপনা

করতেন। তখনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি তাঁর বর্ষসেরা-বিবেচিত ঐ গ্রন্থটিতে লিখেছেন :

> ছাত্রকর্মিরা ট্রাকে করে সারাদিন ধরে মাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করে চললো। পঁচিশে মার্চের রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যে-বার্তাটি ইপিআর-এর ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, সেটি ছাব্বিশ তারিখেই ময়মনসিংহে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিন ছাত্রলীগের পাশাপাশি সেই বার্তা প্রচার করতে দেখলাম এনএসএফ কর্মিদেরও।...
> সাতাশ তারিখেই সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা শুনলাম। যারা নিজের কানে জিয়ার কথাগুলো শোনেনি তাদের কাছেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের মুখ থেকে সে কথাগুলো পৌঁছে গেলো। সকলের উৎসাহের পালে লাগলো নতুন হাওয়া। নিরস্ত্র বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে একজন সশস্ত্র বাঙালির যোগদানের ঘটনাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম আর তাঁর কণ্ঠের ধ্বনি তো সেদিন বাঙালির কানে ধ্বনিত হয়েছিল মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো।
> জিয়ার ঐ ভাষণটি নিয়ে পরে অনেক ধূম্রজাল ছড়ানো হয়েছে। তাঁকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ প্রয়াস চালানো হয়েছে। অথচ এ-রকম করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর আপন কৃতিই তাঁকে ইতিহাসে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। বেতারের ক্ষীণ তরঙ্গে ভেসে আসা কণ্ঠধ্বনি বাঙালির অন্তরে মুক্তি সৈনিক জিয়ার জন্যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার আসন বিছিয়ে দিয়েছিল মুক্তি সংগ্রামের শুরুতেই। কিন্তু জিয়ার অতিভক্তের দল চাইলো তাঁকে এমন একটি আসনে বসাতে যেটি তার কোনোমতেই প্রাপ্য নয়। বঙ্গবন্ধুকে স্থানচ্যুত করে জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার স্পর্ধাও তারা দেখালো। আর এ-রকমটি করে তারা জিয়াউর রহমানের আসল ভূমিকাটিকেও আড়াল করে দিলো, তাঁর প্রাপ্য আসনটি থেকেও তাঁকে টেনে নামালো, তাঁর তর্কাতীত মর্যাদাকে বিতর্কিত করে ফেললো
>
> (পৃ ৩৬২-৩৬৩)

পবিত্র ধর্মগ্রন্থে সীমালংঘনকারীদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।' এপারের মৃত্যুপুরী পেছনে ফেলে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পৌঁছেই ঐ কাব্যকথাগুলি নতুন করে মনে পড়লো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী শাহাবুদ্দিন শাজাহান, ওর ডাক নাম ছিল বেবী, বেবী নামেই ওকে আমরা জানতাম। ওর আসল নামটি জেনেছি বর্তমান লেখার সূত্রে বাচ্চুর কাছ থেকে, নাসিরুউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু (নাট্যকার, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক) রাইসুল ইসলাম আসাদ

(মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত অভিনেতা) – ওরা সপরিবারে ঢাকা থেকে পালাচ্ছিলো বাচ্চু বললো, ওরা আরও ভিতরের দিকে চলে যাবে। সেখানে সাংবাদিক, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হকদের বাড়ি। পরে জেনেছি, ওদের মাথায় বহন করা লেপ-তোষকের ভিতরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পালিয়ে যাওয়া পুলিশের দেয়া ৭টি রাইফেল ছিল।

পিলপিল করে পিঁপড়ার মতো সারি বেঁধে চষাক্ষেতের আল ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সড়কপথ ধরে মানুষ ছুটছে অজানা গন্তব্যের দিকে। কেউ একটু জিরিয়ে নিচ্ছে পথের পাশে। অনেকেই জানে না তাদের গন্তব্য। জানে না কোথায় তাদের একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলবে শেষ পর্যন্ত। তবু তাদের চোখে মুখে ঢাকা নামক হাবিয়া দোজখ থেকে প্রাণ নিয়ে নদীর ওপারে পালিয়ে আসতে পারার অপার আনন্দ ও স্বস্তি। এখানে যত কষ্টই হোক, বিশ্ববর্বর পাকসেনারা তো আর নেই!

সন্ধ্যার দিকে একটা ছোট্ট বাজারের মধ্যে আমাদের দেখা হয় খসরু-মন্টুর সঙ্গে। ছাত্রলীগের এই দু'জন জঙ্গী নেতা তখন পরস্পরের হরিহর আত্মা তারা দল বেঁধে চলেছে। দলে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন মোস্তফা মহসীন মন্টুর বড় ভাই সেলিম, ছাত্রলীগ নেতা আফতাব (জাসদ-নেতা, ন্যাশনাল ইউনভার্সিটির প্রাক্তন ভিসি, যিনি কিছুদিন আগে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে রহস্যজনকভাবে নিহত হন) ও রায়হান ফেরদৌস মধু। আরও বেশ ক'জন ছিলেন, কিন্তু তাদের কারও নাম আমার মনে নেই। তাদের সঙ্গে কিছু হালকা ও ভারী অস্ত্রও ছিল। খসরুর হাতে একটি এলএমজি। তারা আমাদের জানালেন যে, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য তারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন আমি তাদের জানাই যে, কিছুক্ষণ আগে আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি বেতার কেন্দ্র থেকে শুনেছি, জনৈক মেজর জিয়া শেখ মুজিবের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। শুনে সবাই জয়বাংলা বলে চিৎকার করে সন্ধ্যার আকাশ কাঁপিয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে রেডিওর নব ঘোরাতে শুরু করে, কিন্তু ইথার তরঙ্গে হঠাৎ ভেসে এসে মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রটিকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছাত্রলীগের ঐ সশস্ত্র দলটি মুস্তফা মহসীন মন্টুর মামার বাড়ি নারকেলবাগে যাবে। আমরাও তাদের সঙ্গে যাই ঐ বাড়িতে আমাদের জন্য নৈশকালীন গণখাবারের আয়োজন করা হয়। সারাদিন আমাদের পেটে ভাত পড়েনি। পথে পথে জল, বিস্কিট, চরের খেত থেকে তুলে আনা খিরা-শশা আর থ্রি ক্যাসেল সিগারেট খেয়ে কাটিয়েছি। রাতে তারাজ্বলা আকাশের নিচে, সবুজ ঘাসের গালিচায় গোল হয়ে বসে আমরা পেটপুরে ডাল-ভাত মাছ দিয়ে রাতের আহার সম্পন্ন করি। প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে আমরা যা খাই, তাই আমাদের মুখে অমৃতের মতো স্বাদু বলে মনে হয়

মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ

আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক যতীন সরকারের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু-দর্শন' থেকে উদ্ধৃত করে, তাঁকে সাক্ষ্য মেনে গত সংখ্যায় 'স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কে'র ইতি টানতে চেয়েছিলাম কিন্তু হল না। পারলাম না। অধ্যাপক যতীন সরকারের লেখা পড়ার পর আমার হাতে এলো বাংলাদেশের আরেকজন স্বনামধন্য বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও বামপন্থী রাজনীতিক শ্রীনির্মল সেনের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখা। শ্রীনির্মল সেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী। ২৫ মার্চের মধ্যরাত গতে অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ ও ধূম্রজাল প্রচারকারী সাক্ষীগোপালদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রীনির্মল সেন আমাদের জানাচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা :

> 'আমি মনে করি, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। মরহুম জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহে সে জন্য কৃতিত্বের দাবীদার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই এই ঘটনাটি বিবেচ্য। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬ মার্চ রাতে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি আমাদের থানার ডাকঘরে এসেছিল। আহ্বান এসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই। আমি নিজের চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারও বাস্তু করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যাদা করতে চাই না কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তাঁর সীমাবদ্ধতা ও তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একটি কথা স্বীকার করতে হবেই যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নামে। এ আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অবদান ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতাদের নামে কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামেনি। তাদের দলীয় সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে, প্রাণও দিয়েছে

অকাতরে। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে প্রথমে দু'টি নামই ছিল উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। ঢাকা শহরে পাঁচবার ঢুকেছি। ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি। একাধিকবার সীমান্ত পারাপার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গিয়ে রাজাকারদের প্যারেড দেখেছি। প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে দেখেছি সত্যি সত্যি প্রেসক্লাব ভবন ধূলিসাৎ হয়েছে কি না। কাছে গিয়ে দেখেছি ভাঙা শহীদ মিনার। গ্রামে গিয়ে দেখেছি মুক্তিবাহিনীতে যাবার প্রতিযোগিতা। কান্না দেখেছি অসংখ্য তরুণের। পিতা-মাতা ছেড়ে যাবার দুঃখ নয়, মুক্তিবাহিনীতে যেতে না পেরে দুঃখ। ওদের কাছে পরিচিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ। অন্য বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবে সংগ্রামের এক পর্যায়ে সকল সংগঠন ছাড়িয়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী। কোনো দল নয়, মুক্তিবাহিনীই হয়ে উঠেছিল সকলের আদরের ধন। এর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটিও ছিল অচ্ছেদ্য।'

(সূত্র : মা জন্মভূমি : পৃ- ৫২-৫৩)

নির্মল সেন তাঁর লেখায় 'অচ্ছেদ্য' শব্দটি চমৎকার কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মায়ের সঙ্গে নাভিযোগে যুক্ত নবজাতকের নাড়ীবন্ধনের অচ্ছেদ্য চিত্রকল্পটি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। জানি, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর চার ঘনিষ্ঠ সহচরহীন বাংলাদেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার পটভূমিতে জিয়াউর রহমান যদি ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন না হতেন, বা ঘটনাপ্রবাহে তাঁর ওপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা 'অর্পিত' না হতো, — তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনো সুযোগই কখনও তৈরি হতো না

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে নয়, জিয়ার নির্দেশে বা আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বা তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলে যারা দাবি করেন, তারা ভুলে থাকতে ভালোবাসেন এই নিন্দনীয় সত্যটি যে, নিজেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রধান' নিযুক্ত করে মেজর জিয়া যে-ঘোষণাটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছিলেন, তার পরমায়ু ছিল খুব বড়জোর ১২ ঘন্টা। তার বেশি নয়। 'বহির্বিশ্বে ঘোষণাটির গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব বাড়বে'— এই খোঁড়া যুক্তিতে মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণাটিকে খরস্রোতা কর্ণফুলীর ওপারে নিয়ে যেতে পারেননি। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতাদের (আওয়ামী লীগ নেতা এ কে খান ও ডা এ আর মল্লিক) চাপের মুখে বারো ঘন্টার মধ্যেই 'মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা' করে মেজর জিয়া সেদিন তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রান্তি মোচন করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী আচরণ হয়ে উঠেছিল

আত্মরক্ষামূলক। তাই সেদিনের বাস্তবতায় ঐ ঘোষণা প্রচারের গৌরবকে পুঁজি করে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মতো সুযোগ জিয়া নিজেও তৈরি করতে পারেননি। তাই, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হলে, মুজিবনগর সরকারের অধীনে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে গঠিত মুজিবনগর অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মেজর জিয়ার কোনোরকমের মতবিরোধের কথাও আমরা কখনও শুনিনি

লক্ষণীয় যে, ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যে ভাষণ প্রদান করেন, সেখানেও মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটিকে আমলে নেয়া হয়নি বরং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবকেই বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে শাস্তিপ্রদানের হুমকি দেয়া হয়

> "President Yahya Khan, broadcasting on the same day, announced the outlawing of the Awami League, a ban on political activity throughout Pakistan, and the imposition of non-cooperation movement as "act of treason" described Sheikh Mujibr Rahman and his party as "enemies of Pakistan" who wished to break away completely from the country and said that "this crime will not go unpunished"
>
> (KCA, PP 24567)

> Among political leaders in West Pakistan, Mr Bhutto accused Sheikh Mujibur Rahman of wanting to establish an independent facist and racist regime in East Pakistan while Khan Abdul Wali Khan described the Awami League's six-point programme as an act of secession and an open act of treason
>
> (KCA PP 24568)

তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা জুলফিকার আলী ভুট্টো বা ওয়ালী খানরা তখনও বুঝতে পারেননি যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির খতম তারাবি (চরমপত্রের রচয়িতা এম আর আখতার মুকুলের ভাষায়) হয়ে গেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন, ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইট অখণ্ড পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। পাকনেতারা তখনও বুঝতে পারেননি যে, অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না।

সুবেদার মেজর শওকত আলীকে 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা দেওয়া হোক

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত গোপন দলিল, ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষণ, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও খান আবদুল ওয়ালী খানের বক্তব্য ও আমাদের দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাক্ষ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ২৫ মার্চের কালরাতে ঢাকায় বর্বর পাকবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে চিহ্নিত নির্বিচার বাঙালিনিধনের পটভূমিতে বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাযথভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন এবং চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাসম্বলিত ঐ বেতার-বার্তাটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৬ মার্চ-এর বিভিন্ন প্রহরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাশহরে পৌঁছেছিল; - সেহেতু বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐ বার্তাটি কীভাবে, কাদের সাহায্যে প্রেরণ করেছিলেন সে-সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বর্তমান রচনার সঙ্গে সন্নিবেশিত করাটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। প্রয়োজনীয় মনে করছি, ঐ ঘটনার সাক্ষীসংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়, দরকার বোধ করছি এজন্য যে, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারের সুমহান দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাঁরা জীবন দিয়েছেন এবং যাঁরা অমানুষিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সয়েছেন-, আমাদের রক্তরঞ্জিত পবিত্র ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম যথাযথ মর্যাদায় লিপিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি বলে। চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলী ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারকারী চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ও মেজর জিয়াসহ সংশ্লিষ্টদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদানের জন্য আমি আমার লেখায় ইতোপূর্বে যে দাবি জানিয়েছি, সেই দাবির সঙ্গে আমি ইপিআরের সেইসব বীর সদস্যদের নামও যুক্ত করতে চাই, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুশলতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি সেদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করবে, করতে হবে, তিনি হলেন সুবেদার মেজর শওকত আলী। আমেরিকার কানসাস ইন্সটিটিউট থেকে ইলেকট্রনিক্স-এ বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিগন্যাল কোরে কর্মরত সর্বোচ্চপদে আসীন অত্যন্ত মেধাবী ও দেশপ্রেমিক বীর

বাঙালি সুবেদার মেজর শওকত আলী ঐ রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি ট্রান্সমিটরত অবস্থায় রাত সোয়া দুইটার দিকে পাকসেনাদের হাতে তাঁর পিলখানাস্থ নিজগৃহে ধরা পড়েন এবং মোহাম্মদপুরের শরীর চর্চাকেন্দ্রের টর্চার সেন্টারে নিয়ে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন করার পর তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মেজর শওকতের সহযোগী হিসেবে পিলখানা থেকে সেদিন আরও যাঁরা ধৃত হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাঁরা হলেন– শহীদ সুবেদার মোল্লা, সুবেদার জহর, সুবেদার আবদুল হাই ও সুবেদার মুন্সি। অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন সুবেদার আইয়ুব।

আমি দাবি করছি, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করতে গিয়ে যাঁরা সেদিন দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলীকে 'বীরশ্রেষ্ঠ'-র মর্যাদা প্রদান করা হোক। আমাদের উদাসীনতা ও ইতিহাস-বিকৃতির কারণে আমাদের জাতীয় বীর সন্তানরা যেন কখনও কবি শামসুর রাহমান কথিত 'কালের ধুলোয়' ঢাকা পড়ে না যান 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' আত্মদানকারী বীরদের বীরত্বগাথা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সামনে তুলে ধরাটা আমাদের কবি-সাহিত্যিক ও ইতিহাস রচয়িতাদের পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ইতিসমাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপর্ব।

বুড়িগঙ্গার ওপারে : মোস্তফা মহসীন মন্টুর মুক্তিযুদ্ধ

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা আবার বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে ফিরে যাই। ওপারে আমরা ২৭ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ছয়দিন কাটিয়েছি। সপ্তম দিবসে, রাতের অন্ধকারে পজিশন নিয়ে ২ এপ্রিল শুক্রবারের কাকডাকা ভোরে অখণ্ড পাকিস্তান ও পবিত্র ইসলামের হেফাজতকারী পাকসেনারা ঐ এলাকায় গণহত্যা চালায়, যা জিঞ্জিরা অপারেশন নামে পরিচিত। ঐ দিন পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে ২৫ মার্চের ঢাকার গণহত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গার ওপারের বিভিন্ন গ্রামে ও হাটবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী এবং স্থানীয় লোকজন মিলিয়ে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ ঐ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞে পাকসেনাদের হাতে সেদিন নিহত হয়। আহত হয় আরও কয়েক হাজার। ভোর ৫টা থেকে শুরু করে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে ঐ নিধনযজ্ঞ। তারপর হত্যাক্লান্ত পাকসেনারা তাদের অপারেশন শেষ করে ঢাকায় ফিরে গেলে, পথে-ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা অনেক নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুর মৃতদেহ ডিঙিয়ে দুপুরের দিকে আমরা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। সেই জিঞ্জিরা অপারেশনের রোমহর্ষক বর্ণনা আমি পরে বিস্তারিত লিখবো।

পূর্বে বলেছি, কোন পটভূমিতে, কীভাবে আমরা ২৭ মার্চ তিন বন্ধু ঢাকা ত্যাগ করে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নদীর ওপারে আমাদের প্রথম রজনীটি কেটেছিল তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর, সাহসী মুজিবসেনা মোস্তফা মহসীন মন্টুর মামাবাড়ি নেকরোজবাগে। নেকরোজবাগ নয়, আমার কেন জানি নারকেলবাগ নামটাই স্মরণে আছে। সম্প্রতি (১০ মার্চ ২০০৭) আমি মোস্তফা মহসীন মন্টুর সঙ্গে তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে ঐ সময়ের অনেক অজানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি, যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি জানিয়েছেন, আমরা ২৭ মার্চ যে বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটি নেকরোজবাগ গ্রাম, তাঁর মামার বাড়ি। তার নিজের বাড়ি কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকীর্তা গ্রামে। তিনি জানিয়েছেন, নেকরোজবাগ নামটা এসেছে নেকরোজ নামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম অনুসারে। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে খুব সুন্দর সুন্দর নামের গ্রাম আছে। বাংলাদেশের কোথায় তা নেই? আমাদের নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জের নামগুলি যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনি শ্রুতিমধুর। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের বেশ কয়েকটি গ্রামের নাম আমার আজও মনে আছে। কিছু নাম আমি ঐ এলাকার মানুষদের কাছ থেকে এবং সম্প্রতি মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছ থেকে জেনেছি। রসুলপুর,

জাওলাহাটি, শুভাড্যা, হাসনাবাদ, নবীনগর, কুইস্যারবাগ, গুলজারবাগ, পটকাজোর, কালিন্দি, ব্রাহ্মণকীর্তা, খোলামোড়া, কলাতিয়া, সুলতানগঞ্জ। ২৫ মার্চের অকল্পনীয় ও অভাবিত গণহত্যার পর জীবন বাঁচাতে বুড়িগঙ্গার ওপারের এইসব গ্রামগুলিতেই ঢাকার মানুষজন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর মন্টুর সঙ্গে দেখা হলে আমরা উভয়েই বেশ আবেগকাতর হয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমরা আমাদের অনেক প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করি, যাদের অনেকেই আজ আর নেই অমাদের মাঝে। মন্টুর বড় ভাই সেলিম তাঁদেরই একজন। তিনি মন্টুর মতো ভয়ঙ্কর ছিলেন না, কিছুটা নরম মনের মানুষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হলেও ইকবাল হলেই থাকতেন। আমার সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তিনি বয়সে আমার চেয়ে একটু বড় ছিলেন, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আমাকে তিনি গুরু বলে সম্বোধন করতেন। তিনি মারা গেছেন ১৯৮৫ সালে। মন্টুর ছোট ভাই হোসেনও মারা গেছে। আমি তাঁদের কথা শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমি যখন মন্টুকে জানাই যে আমি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখছি, তখন মন্টু খুব খুশি হন মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবময় দিনগুলি স্মরণ করতে গিয়ে তিনি সঙ্গতকারণেই খুব আবেগপ্লুত হন। তা হওয়ারই কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে তাঁর অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা। তাঁর সেই বীরোচিত ভূমিকার কথা আমাদের ইতিহাসে আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। ক্রমশ আমাদের আলাপ জমে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে আমি বেশ কিছু অজানা তথ্য জানতে পারি।

আমি প্রথমেই তাঁর কাছে জানতে চাই, ২৫ মার্চের রাতে তিনি কোথায় ছিলেন, কীভাবে কেটেছে তাঁর ঐ রাত্রিটি। আমরা জানতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজটি তিনি ও খসরু তদারকি করতেন। তাঁদের সাহস, স্বভাব ও দৃঢ়চিত্ততার কারণে তখন মন্টু খসরু হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সামরিকায়নের প্রতীক ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়ী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আহুত সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দিলে, বলা যায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছিল। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের মেয়েরাও তখন সশস্ত্র সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো। মন্টু জানালেন, আসলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য আমরা কিন্তু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

কীভাবে? আমি জানতে চাইলে মন্টু বলেন, ২০ জানুয়ারি আসাদ শহীদ হয়। ২৪ জানুয়ারি সচিবালয়ের সামনের সড়কে আবদুল গণি রোডে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় কিশোর মতিউর। সেদিনই মিছিলের উত্তেজিত জনতা তৎকালীন প্রাদেশিক রেলমন্ত্রী সুলতান আহমদ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মং শ প্রু চৌধুরীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং ঐ বাড়িগুলিতে প্রহরারত গার্ডদের হাত থেকে তাদের রাইফেলগুলি কেড়ে নেয়। মন্টু দাবি করেন, ঐ রাইফেলগুলিই ছিল আমাদের হাতে আসা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অস্ত্র।

নিরস্ত্র বাঙালি যে সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল সেদিনই, তা আমি জানতাম না জেনে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করি। আমি নিজেও সেই মিছিলে ছিলাম। আমার একটি কবিতায় সেই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

'তুমি বললে তাই, আমরা এগিয়ে গেলাম,
নিষ্পাপ কিশোর মরলো আবদুল গণি রোডে।
তুমি বললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,
আমরা তীক্ষ্ণ দুঃখী, নিপীড়িত শত-অত্যাচারে
গীতাঞ্জলি অকর্মণ্য হবে।
আমরা তাই রঙিন প্ল্যাকার্ড সাজিয়েছি
মাও সে তুং, গোর্কি-নজরুলে।'

(জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই।)

আবদুল গণি রোডে পুলিশের গুলিতে নিহত ঐ নিষ্পাপ কিশোরটিই ছিল বকশীবাজারস্থ নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ মতিউর। মতিউর রহমান মল্লিক। ঐ দিনটি আমাদের ইতিহাসে ছাত্রগণ-অভ্যুত্থান দিবস বলে পরিচিত। এর কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের লৌহমানব বলে কথিত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে হটিয়ে দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, যদিও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে তখন দাবি করা হয়। আমি এর সবই জানতাম। কেননা, তখন আমি ছিলাম আক্ষরিক অর্থেই রাজপথের কবি। কিন্তু ঐদিন যে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল, এই ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। মন্টু বলেন, তারপর নানাভাবে, নানাপথে আমাদের হাতে আরও অস্ত্র আসে। অস্ত্রই অস্ত্র আনে। তখন ক্রমশ ইকবাল হল হয়ে ওঠে আমাদের গোপন অস্ত্রাগার। আমাদের ক্যান্টনমেন্ট। ২৫ মার্চের দিকে আমাদের অস্ত্রাগারে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ এসে গিয়েছিল। ঐ দিন আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ছিলাম রাত ৯টা পর্যন্ত।

কী আশ্চর্য! আমিও সেদিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটিয়েছি। ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আমাদের অবস্থানের সময়টা মিলে যাওয়ার কারণে হাসতে হাসতে আমি জানতে চাই— সেদিন নেতার সঙ্গে আপনার শেষ কথা কী হয়েছিল, মনে পড়ে? আমার প্রশ্নের উত্তরে মন্টু যা জানান, তা আমি কখনও পূর্বে শুনিনি। বঙ্গবন্ধু মন্টুকে বলেন, তোরা ইকবাল হল থেকে অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিয়ে নদীর ওপারে চলে যা, আমি যদি কোনো কারণে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই, তো আমি হামিদের বাড়িতে যাবো। হামিদ? কে তিনি? আমি তো তাঁর নাম কখনও শুনিনি। মন্টু বলেন, এই হামিদ হচ্ছেন হামিদুর রহমান। আওয়ামী লীগের একজন নেতা উনি সত্তরের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন; পুরনো ঢাকায় তাঁর বাড়ি বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে। উনার কয়েকটি লঞ্চ ছিল। তার মানে, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে হামিদ সাহেবের লঞ্চ ব্যবহার করে বুড়িগঙ্গা নদী পথ ধরে কোথাও পালানোর কথাও ভেবেছিলেন? মন্টু বললেন, হ্যাঁ, সে জন্য আমি তারপর থেকে হামিদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম

শুনে আমার কেন জানি বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা মনে পড়ে যায়। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় এই নদী পথে পালাতে গিয়েই তো ভগবানগোলায় ধরা পড়ে ছিলেন নবাব সিরাজ। কে জানে সেই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনার কথা ভেবেই সেই রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর পালানোর, তাঁর নিজের ভাষায় 'সরে যাবার' সিদ্ধান্তটি বাতিল করেছিলেন কি না

১ মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

একাত্তরের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে আমি যখন লিখছিলাম, তখন আকস্মিকভাবেই আমার সঙ্গে রোকেয়া কবীরের কথা হয় রোকেয়া কবীর আমার নিজ জেলা নেত্রকোণার একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে। একাত্তরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন জঙ্গী সাহসী নেত্রী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল রোকেয়া কবীর ছিলেন সেই ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার। আমি তাঁর কাছ থেকে ছাত্রী ব্রিগেড সম্পর্কে কিছু তথ্য জনতে চাইলে তিনি আমাকে কুরিয়ার যোগে একটি গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন। বইটির নাম 'মুক্তিযুদ্ধ ও নারী'। চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ বই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বইটিতে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাংলার নারী সমাজ কীভাবে একটি অবশ্যম্ভাবী মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিল আমি ঐ বই থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

> ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে গুলিস্তানের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়ে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন– 'আজ আর কোনো দল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ। শেখ সাহেব, আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।'
>
> ১৫ মার্চ টেলিভিশনের নাট্যশিল্পীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, গণ-অন্দোলনের পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে না এ সভায় নারীদের মধ্যে বক্তৃতা করেন রওশন জামিল ও আনোয়া ফেরদৌসী।
>
> ১৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত মহিলা পরিষদের এক সভায় মালেকা বেগম বলেন, শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে নারী পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সেদিনের সভায় আরও বক্তৃতা করেন ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না ও আয়েশা খানম

> ১৮ মার্চ ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমিতির সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় ও স্বাধিকার আন্দোলনে নিহতদের হত্যার বিচার দাবি করা হয়। এ সভায় বক্তৃতা করেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনাব খায়রুল আলম খান, বিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কনিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ।
>
> ১৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত গণবাহিনীর একটি সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২টি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্যারেড, শরীর চর্চা ও রাইফেল কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর গণবাহিনীর সদস্য-সদস্যাগণ নুরুল ইসলামের কাছে শপথ বাক্য পাঠ করেন দেশের এ সংকটময় মুহূর্তে নিজের জীবন বাজি রেখে হলেও দেশ ও জনগণের স্বার্থে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার শপথ পাঠ শেষে গণবাহিনী রাইফেল (কিছু আসল ও কিছু কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল) কাঁধে রাজপথে মার্চপাস্টে বের হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে প্রশিক্ষণ ও মার্চপাস্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আয়েশা খানম, বীনা খান, মনিরা আখতার, কাজী রোকেয়া সুলতানা, নাসিমুন আরা হক মিনু, হোসনে আরা, নাজমুন আরা নিনু, রাখীদাশ পুরকায়স্থ, বেবী চৌধুরী, রোকেয়া খাতুন রেখা, নাসিমুন নাহার নিনি, সালেহা বেগম প্রমুখ। ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে এতে নেতৃত্ব দেন রোকেয়া কবীর
>
> এছাড়া ছাত্রলীগের উদ্যোগেও ছাত্রী ব্রিগেড গঠিত হয়। এ ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগম, সালমা বেগম সুরাইয়া, রাফেয়া আখতার ডলি, রাশেদা আমিন, মমতাজ শেফালী প্রমুখ। প্রশিক্ষণ ছাড়াও মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে এসব নারী এলাকাভিত্তিক নারী ব্রিগেড তৈরিতেও ভূমিকা রাখেন।'
>
> (মুক্তিযুদ্ধে নারী, পৃ: ৫৩-৫৪)

রাইফেল কাঁধে, দৃপ্ত পায়ে বাংলার নারীদের ঢাকা নগরী প্রদক্ষিণ করার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। রোকেয়া কবীরকে ধন্যবাদ। তাঁর সহযোগিতার কারণে আমার রচনাটি প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও অপূর্ণতার দায় থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে

প্রিয় পাঠক, এবার আমার সঙ্গে পুনরায় বুড়িগঙ্গার ওপারে চলুন। দেখা যাক নদীর ওপারে কী ঘটছে।

চোখ বুজে করে স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে মন্টু বললেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি দ্রুত ইকবাল হলে ফিরে আসি এবং হল থেকে আমাদের অবশিষ্ট মালগুলি নদীর ওপারে নিয়ে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করি। তার আগেও বেশ কিছু মাল আমি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই মালগুলি দিয়ে কেরানীগঞ্জের স্থানীয় লোকজনকে তখন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল মন্টুর মুখে বারবার 'মাল' শব্দটি শুনে আমার মজা লাগছিল বলে শব্দটির অর্থ জানতে চেয়ে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেইনি। বুঝতে পারছিলাম, 'মাল' কথাটার মানে এখানে কী? লোভনীয় নারী এবং মদের প্রতিশব্দ হিসেবে মাল শব্দটির ব্যবহার আমি বিলক্ষণ জানতাম কাউকে কাউকে ইঙ্গিত করে কখনও কখনও এই শব্দটি বলেছিও কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে 'মাল' শব্দটির ব্যবহার আমি আগে শুনিনি হয়তো এই অস্ত্রজগতের সঙ্গে আমার বাস্তব সম্পর্ক ছিল না বলেই। আমার মুচকি হাসি দেখে মন্টু ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নিজেও মুচকি হাসলেন। তারপর নিজেকে শুধরে নিয়ে তিনি যখন অস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করলেন, আমি তাকে শুধরে দিয়ে বললাম 'মাল'। তাতে আমাদের খোলামেলা আলোচনার টেবিলে উপস্থিত শ্রোতারাও বেশ মজা পাচ্ছিল। অতিক্রান্ত বেদনার ভার বহন করতে হয় না বলে পঁচিশে মার্চের নির্বিচার গণহত্যার স্মৃতিচারণ করতে বসেও আমরা বেশ মজাই পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল অনেক পেছনে ফেলে আসা আমাদের অখণ্ড অতীতের নানা অম্লমধুর স্মৃতির কথা যদিও শেষ পর্যন্ত অন্যসব স্মৃতির প্রতি সুবিচার না করে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিচ্ছিলাম শুধুই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত স্মৃতিগুলিকেই। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিলই বটে, জাহান্নামে যাক মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, মন্টুকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলি, 'দেখা যদি হলই সখা, প্রাণের মাঝে আয়'।

আমি খুব বেশিক্ষণ সিরিয়াস হয়ে থাকতে পারি না। তা, আলোচ্য বিষয় যত গম্ভীরই হোক না কেন আমি লক্ষ করে দেখেছি, হালকা চটুল (মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম ও ভারীও যে হয় না, তা নয়) রসের চাটনি না হলে আমি কিছুই আমার মনের ভিতরে নিতে পারি না। আর নিজে নিতে পারি না বলে আমার পাঠককে সেরকম করে কিছু দিতেও পারি না। মনে হয় পাঠকের প্রাণের ওপর অত্যাচার করার কোনো অধিকার আমার নেই। শোকসভায় গম্ভীর মুখে বসে থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশের যে-রীতিটা চালু আছে, আমি অনেক সময়ই তার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বসে থাকার ভার সইতে পারিনে। আমার মনে হয়, কান্না জিনিসটা বড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ছোটোদের হয়তো মানায়, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে

এর চেয়ে কদর্য ও বেমানান আর কিছুই হয় না বড়রা কাঁদবে কেন? প্রকৃতি যাদের ওপর মানুষের কান্না থামানোর ভার দিয়েছে, তারাই যদি সভা করে কাঁদতে বসে— তো আমাদের এই মরজগত চলবে কীভাবে? আমার মতো অতটা স্পষ্ট করে না হলেও, রবীন্দ্রনাথ ঐ বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন বলেই তাঁকে আমার এতো ভালো লাগে। তাঁর সঙ্গে আমার এই হিসেবটা মিলেছে যে, বেদনা নয়, আনন্দই হচ্ছে জীবনের বড় সত্য প্রাণের সহস্র বেদনার মধ্যেও আমি তাই মানুষকে জগতের আনন্দযজ্ঞের সন্ধান দিতে ভালোবাসি। বুকের ভিতরে এমন একটা আনন্দসন্ধানী মন গুঁজে দিয়ে ঈশ্বরই বা আমাকে পৃথিবীতে কেন পাঠালেন, তা তিনিই ভালো জানেন নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে। আমি আপাতনিষ্ঠুর বলে মনে হওয়া আমার উৎফুল্ল স্বভাবের মধ্যে মহাপ্রকৃতির নীরবগোপন ইচ্ছার প্রতিফলনই যেন দেখতে পাই।

লক্ষ প্রাণের আত্মদানকে ছোটো না করেও আমি ভাবি, লক্ষ প্রাণের মূল্যে পাওয়া আমাদের বাংলাদেশই আমাদের কাছে বড় সত্য। একটি জাতির জীবনে একটি স্বাধীন দেশের তুল্য বড় পাওয়া আর কিছু নয়।

ভেবে দেখলাম, একাডেমিক পদ্ধতি ও কানুন মেনে টিকা-টিপ্পনিযুক্ত করে বাংলাদেশের একটি রসকষহীন ইতিহাস রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, সে আমার অভীষ্টও নহে।

বুড়িগঙ্গার ওপারে : আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চের সেই ঐতিহাসিক রজনীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে আমাদের ইতিহাসবিদ-কবি যখন আপনার কাছে গিয়েছিলেন, তখন আপনি আমাদের কথা কবিকে বলেননি কেন? এমন সম্ভাব্য প্রশ্নের হাত থেকে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করার জন্য মমম অর্থাৎ মোস্তফা মহসীন মণ্টু আমাকে জানালেন যে, ঐ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নেতার পাশে আরও যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, খসরু, বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সহ ঐসব তুখোর ছাত্রনেতারা যখন সমবেতভাবে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল, তখনই বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ..'যদি আমি শেষ পর্যন্ত এই বাড়ি থেকে অন্য কোথাও 'সরে যাবার' সিদ্ধান্ত নেই, তবে আমি পাগলায় হামিদের বাড়িতে যাবো। সেখান থেকে হামিদের লঞ্চ নিয়ে পরে নদীপথে অন্য কোথাও ..'। এখানে লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে বসেও 'পলায়ন' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেননি, ঐ অমর্যাদাকর শব্দটি পরিহার করে তিনি তাঁর মতো বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতার জন্য সম্মানসূচক হয়, এমন ক্রিয়াপদটিই যথার্থ কবির মতো খুঁজে নিয়ে, বর্তমান অবস্থান থেকে অন্যত্র 'সরে যাবার' কথাটা বলেছিলেন। এখানে আমরা বঙ্গবন্ধু মতো ক্ষণজন্মা জননেতার আত্মসম্মানবোধের উচ্চতা সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা পাই, তেমনি যথার্থ শব্দচয়নে তাঁর দক্ষতাদৃষ্টে বিস্মিত হই। পালিয়ে যাবার পরিবর্তে পূর্ব অবস্থান থেকে অন্য কোনো অবস্থানে সরে যাবার চিন্তাটাই যে তাঁর মতো নেতার জন্য সম্মানজনক হয়, কবি হয়েও আমার মাথায় তা আসেনি। কেন যে আসেনি? মণ্টুর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ না করলে, আজও হয়তো বাংলা অভিধানের ঐ শব্দজোড়ার দিকে আমাদের চোখ পড়তো না। শব্দ ও ভাষার ওপর বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ দখলের অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে। আমরা অনেকেই যখন বলছি, সেই রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন না কেন? ভাবতে চেষ্টা করেছি, তিনি পালিয়ে গেলে কী হতে পারত, তাঁর পক্ষে কোথায় পালালে ভালো হতো, ইত্যাদি; তখন স্বাধীনতা লাভের ৩৬ বছর পার হয়ে যাবার পরও আমাদের কারও মগজেই আসেনি যে, 'পালানো' শব্দটা তাঁর চিন্তাজগতের সঙ্গে যাবার নয়। পালানো কথাটা আমারও খারাপ লাগছিল, মনে পড়ছিল বাংলার দুই নৃপতির কথা। লক্ষণ সেন ও নবাব সিরাজ। লক্ষণ সেন পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সিরাজ পারেননি। পালানো কথাটা তাই, আমাদের অতীত ইতিহাস বিচারে বাঙালিজীবনে অনেকটাই বিদ্রূপাত্মক অভিধারূপে বিবেচ্য। 'য পলায়তি স জীবতি', এটি প্রাচীন সংস্কৃত

প্রবচনটির উৎস সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা নেই। জতুগৃহ থেকে পলায়নের সময় এই কথাটা মহাবীর অর্জুন বলেছিলেন, না সোনারগাঁ থেকে পালানোর সময় লক্ষণ সেন বলেছিলেন, জানি না। তবে বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন ঐ প্রবাদবাক্যে প্ররোচিত হতেন, পরবর্তীকালে জানা তথ্য মতে সেদিন তাঁর মৃত্যু ছিল অনিবার্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের স্বজ্ঞাশক্তির সহযোগিতায় বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে, তিনি যদি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার জন্য পা বাড়ান– তবে তাঁর বাড়ির পাশে অবস্থান গ্রহণকারী পাকিস্তানের গোয়েন্দাসেনারা তাঁকে গুলি করে হত্যা করবে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের দায় চাপাবে বাঙালির কাঁধে। আলোচনা খেলা শেষ করে ঢাকা থেকে লুকিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর সেনা অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, মুজিবকে যদি তাঁর বাড়িতে পাও তবে তাঁকে গ্রেফতার করবে। আর যদি তাঁকে পলায়নরত অবস্থায় বাইরে কোথাও পাও, তো তাঁকে গুলি করে মারবে। বঙ্গবন্ধুর কাছে এই গোপন বার্তাটি কেউ পৌঁছে দিয়েছিল কি? মনে হয় না। আমার ধারণা, প্রচণ্ড ইনস্টিংকটিভ পাওয়ার ছিল তাঁর। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল তাঁর চরিত্রে। কবিদের যেমন থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার পঙক্তি এরকমঃ 'ভিতরে বদি নেই, সাড়া দিচ্ছো না কেন?' যাকে বলে নরের ভিতরে নারায়ণ। অর্থাৎ আমি একা নই, আমার ভিতরে আরও একজন আছেন। এই দেহতাত্ত্বিক ধারণার বাউল-ভাষ্যটি হচ্ছে এরকমঃ 'আমার ভিতর বাস করে মোট কয়জনা, ও মন জানো না।' আমরা তো তাঁর বংশবৃক্ষ থেকে জানি যে, মিস্টিক সুফির রক্ত ছিল তাঁর দেহে।

তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পাওয়া একটি ঘটনা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে। ১৯৭০ সালের কথা। সন্তানসম্ভবা হাসিনা প্রথম মা হতে চলেছেন। সন্তানের জন্য বাবার কাছ থেকে তিনি কিছু পছন্দসই নাম চাইলেন। প্রতিদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে হাসিনা তাঁর সন্তানের নাম চান। দেশের নাম নিরুপণ করা নিয়ে ব্যস্ত বঙ্গবন্ধু 'এই যা আজও ভুলে গেছি, কাল পাবি' বলে দিনের পর দিন চালিয়ে দেন। হাসিনা এক পর্যায়ে খুব মন খারাপ করেন তাই দেখে একদিন বাবার মন নরম হয়। তিনি তাঁর নিজের কক্ষে গিয়ে তাঁর প্রথম নাতির নামের সন্ধানে ধ্যানে বসেন এবং তাঁর প্রত্যাশিত প্রিয় নামটি দ্রুত পেয়েও যান। নাম পেয়ে উত্তেজিত হয়ে কন্যা হাসুকে ডাকতে ডাকতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন। তারপর বাড়ির সবাইকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে জানান যে, অবশেষে হাসিনার ছেলের নাম পাওয়া গেছে ছেলের নাম হবে জয়। তিনি বার কয়েক প্রাণ ভরে মহানন্দে উচ্চারণ করেন তাঁর পেয়ে যাওয়া প্রিয় নামটি- জয় জয় জয়.... । হাসিনা মুগ্ধ হাতে কলম দিয়ে কাগজে ছেলের নাম লেখেন, জয় তারপর পিতার দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন করেন, আর যদি মেয়ে হয়? মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর

মুখ শুকিয়ে চুন । ঠিকই তো, হতেই তো পারে। কিন্তু এই কথাটি তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে কেন যে এল না, তিনি তা ভেবে পান না। তাঁর লজ্জিত গম্ভীর ও বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিনার মায়া হয়। তিনি পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ঠিক আছে, পরে দিয়েন।' বঙ্গবন্ধু মুখ ঘুরিয়ে নিজকক্ষে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দু'সিঁড়ি উপরে উঠেই আবার ফিরে দাঁড়ালেন, এবার তাঁর মুখে অট্টহাসি। বললেন– 'বুঝেছি, বুঝেছি, দেখিস তোর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে মেয়ে হলে আমার মনে ঠিকই মেয়ের নাম আসতো হা-হা।'

মনে হয়, অব্যাখ্যাত অলৌকিক শক্তির ওপর বঙ্গবন্ধু কিছুটা আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর ৭ মার্চের অলিখিত ভাষণটি শুনেও আমার সেকথাই মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল ভিতর থেকে যেন কেউ শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য, বেস্ট ওয়ার্ড ইন বেস্ট অর্ডার-এ তাঁর কণ্ঠে যুগিয়ে দিচ্ছিল। আর জলপ্রপাতের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে নেমে আসছিল অনর্গল শব্দঝর্ণা। ১০৩ পঙক্তির কাব্যগুণান্বিত ঐ ভাষণের রচয়িতাকে যদি আমরা কবি স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করি, তাহলে তা খুবই অন্যায় হবে। তাঁর ঐ ভাষণ নিয়ে লেখা আমার বহুশ্রুত 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' নামক কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে আমি কবি হিসেবেই বর্ণনা করেছি। জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে অধীর আগ্রহে ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা সেদিন ভোর থেকে যাঁর অপেক্ষায় বসেছিল, তিনি কবি। কখন আসবে কবি?

প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আলদীন সম্প্রতি একটি টিভি টকশোতে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের ভাষা-প্যাটার্নকে প্রভাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। শুধু বাংলাদেশের নয়, ১৯৭১ সালে আমি কলকাতায় থেকে জেনেছি, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি সেখানকার ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে কীভাবে উঠে এসেছিল।

১৯৭২ সালে আমাকে তিনি একবার 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সহজে কাউকে আপনি বলতেন না। সেখানে আমাকে তিনি আপনি বললেন কেন? এরকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই বলে যে, আমি কবি বলেই তিনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেছেন। তাই, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমেরিকার নিউজউইক পত্রিকার প্রচ্ছদে তাঁর ওপর যে সচিত্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেখানে তাঁকে 'পোয়েট অব পলিটিকস' বা রাজনীতির কবি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২

মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব খুব একটা নামাজ পড়তেন না। দীর্ঘ বিরতিতে মাঝে মাঝে পড়তেন। এ নিয়ে তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হতো একদিন সেই গালিবের সাধ হল তিনি শুধু নামাজই পড়বেন না, মসজিদের মোয়াজ্জিনের মতো

উচ্চকণ্ঠে আজানও দেবেন। দিল্লীর ঘুমন্ত মুসলমানদের তিনি জানাবেন যে, নিদ্রার চেয়ে আরাধনা শ্রেয়। তাই নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে আসো। উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। খুব খেয়ালি মানুষ। আজান দিয়ে তাঁর খুব আনন্দ হল। মনে হল, এমন মধুর আজান তিনি এর আগে কারো কণ্ঠে কখনও শোনেননি। কিন্তু এ হল তাঁর আজান সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা। তাঁর আজান সম্পর্কে অন্যদের মত কী? সেটা জানা দরকার। কীভাবে জানা যায়? কাছে কোনো মানুষজনকে পাওয়া গেলো না। তখন গালিবের মাথায় একটা সাংঘাতিক বুদ্ধি খেলে গেলো। তিনি আজান দিতে-দিতে গলির পথ ধরে দৌড়াতে শুরু করলেন। আজান দিচ্ছেন, আর দৌড়াচ্ছেন। যতটা দ্রুত তাঁর পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব। নিদ্রা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ পড়তে আসা দিল্লীর মুসুল্লিরা গালিবকে আজান দিতে দেখেই অবাক হয়েছিলেন, এবার তাঁকে আজান দানরত অবস্থায় প্রাণপণে দৌড়াতে দেখে আরও অবাক হলেন। ভাবলেন, গালিব নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। সাহস করে ধাবমান গালিবকে একজন বললেন, 'কবি গালিব, আপনি এভাবে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন কেন?' শুনেও প্রথম কয়েকবার গালিব ঐ বালখিল্য প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আজান শেষ করে, হাঁফাতে হাঁফাতে গালিব বললেন, 'আমার আজানটা কেমন হচ্ছে, তা নিজ কানে শোনার জন্যই আমি দৌড়াচ্ছিলাম। আমি যে এতো চমৎকার আজান দিতে পারি, তা তো আগে জানতাম না। আজ আমার খুব ভালো লাগছে।'

ধর্মের পথে গালিব ফিরে আসছেন। তাঁকে উৎসাহিত করা দরকার। মুসুল্লিরা বললেন, ভালো, আপনার আজান সত্যিই খুব ভালো। আপনার আজান শুনে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি।

মনে পড়ছে আজান নিয়ে লেখা মহাকবি কায়কোবাদের আজান কবিতার কিছু পঙক্তি। তিনি কি গালিবের কণ্ঠের আজান শুনেই ঐ কবিতাটি লিখেছিলেন?

'কে ঐ শোনালো মোরে আজানের ধ্বনি?
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিলো কী সুমধুর,
আকুল হইলো প্রাণ, নাচিলো ধমনী।
কে ঐ শোনালো মোরে আজানের ধ্বনি?'

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর আমার আত্মকথা লিখতে গিয়ে আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, গালিবকেই অনুসরণ করি। স্মৃতির ভিতর দিয়ে, অতিক্রান্ত সময়ের পথরেখা ধরে গালিবের মতো দৌড়াই। ছাপার পর, পাঠক হয়ে বারবার পাঠ করে বুঝার চেষ্টা করি, কেমন হচ্ছে আমার রচনাটি? লেখাটি কি খুব অগোছালো মনে হচ্ছে? ইতিহাসনির্ভর আত্মকথা রচনার জন্য অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে

আমাকে? আমার গতির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে খুব কি হিমশিম খাচ্ছেন আমার পাঠক? তা রচয়িতা নিজে যা অনবরত খাচ্ছেন, তার পাঠকরা তার কিছু তো খাবেনই। তবু আমি বলব, অন্যদের কেমন লাগছে জানি না, আমি বড় আনন্দ পাচ্ছি। ক্লান্তিও যে আসছে না, তা নয়। কিন্তু সেটা শারীরিক আমার আনন্দটা মানসিক। সেই আনন্দ হচ্ছে আমাদের পেছনে ফেলে-আসা গৌরবময় অতীতের সত্য প্রকাশের আনন্দ। সত্যই সুন্দর সত্যই ঈশ্বর। সদাপ্রভু। আল্লাহ। ভগবান। ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ।

বঙ্গবন্ধুর ওপর সাপ্তাহিক নিউজউইকের প্রচ্ছদনিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে। বিশ্বসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি তখন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদানের জন্য ঐ প্রচ্ছদরচনাটি এখানে পরিবেশিত হল।

রাজনীতির কবি

শেখ মুজিবুর রহমান যখন গত সপ্তাহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁর কিছু সমালোচক বলেছিলেন যে, তিনি শুধু তাঁর কিছু চরমপন্থী সমর্থকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন এবং ঢেউয়ের ধাক্কায় যাতে তলিয়ে না যেতে হয় তাই ঢেউয়ের ওপরে চড়ার চেষ্টা করছেন। তবে এক অর্থে, এক নতুন বাঙালি জাতির যোদ্ধা-নেতারূপে মুজিবের আবির্ভাব বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রামেরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি। মুজিব হয়তো এখন ঢেউয়ের চূড়ায় সওয়ার হয়েছেন, কিন্তু ওখানে তাঁর থাকাটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়।

একান্ন বছর আগে, ঢাকার নিকটবর্তী এক গ্রামে, সম্পন্ন ভূমাধিকারী পরিবারে মুজিবের জন্ম শিক্ষাজীবনের গোড়ায় বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দেননি। বালক হিসাবে তিনি ছিলেন বহির্গামী ও জনপ্রিয় মানুষজন, খেলাধুলা, গল্পগুজব তিনি পছন্দ করতেন। কলা বিষয়ে ডিগ্রিলাভের জন্য তিনি যখন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান, ততদিনে মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন তাঁর অগ্রণী ছিলেন হোসেন শহীদ সহরওয়ার্দী, বৃটিশরাজের অধীনে বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে বছরখানেকের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুজিব আইন পড়েছিলেন। তবে সহরওয়ার্দীর মতো নরমপন্থার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। খুব অল্পকালেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল

তাঁর মধ্যে চল্লিশের শেষ দিকে এঁরা দু'জনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাঁদের মাতৃভূমি বাংলা প্রাপ্যের তুলনায় কম পাচ্ছে। মুজিব ভাষাদেশ আন্দোলনে এবং বেআইনী ধর্মঘট ও বিক্ষোভে নেতৃত্বদানের জন্য বার দুই গ্রেপ্তার হন।
কারাগার থেকে বেরোবার পর আওয়ামী লীগে মুজিব হয়ে উঠলেন সোহরওয়ার্দীর ডান হাত। কিন্তু আপোস করে অন্যান্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর নেতার প্রয়াস খুলিস্যাৎ করে দিলেন। মুজিবের প্রয়াসের সাফল্যে আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে সমর্থ হল শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে তিনি সাত মাস দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৩ সালে সোহরওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে আপাতদৃষ্টিতে মুজিব আর বয়স্ক নেতার নরম পন্থী নীতির বাধা তেমন করে অনুভব করলেন না। তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করলেন। নিজের সহজাত রীতির রাজনীতি অনুসরণ করলেন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যখন আইয়ুব খান তাঁকে আবার গ্রেফতার করলেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিলো এবং সেই আন্দোলনে আইয়ুব মুজিবকে মুক্তি দিতে এবং নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন নিজের জনগণের কাছে মুজিব আত্মপ্রকাশ করলেন বীরপুরুষ হিসাবে।
বাঙালিদের তুলনায় মুজিব লম্বা (উচ্চতায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি), চুলের একগুচ্ছে পাক ধরেছে, ঘন গোঁফ, সতর্ক দু'টি কালো চোখ লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতার তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। একজন কূটনীতিক বলেন : 'একাকী তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে হয় তিনি যেন ৬০,০০০ লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন।'
উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় তাঁর পটুত্ব আছে। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। তিনি রাজনীতির কবি প্রকৌশলী নন; তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে শৈল্পিক বেশি। কাজেই, এই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, তাঁর রীতিতে হয়তো ঠিক তাই আছে।
এক মাস আগে, মুজিব যখন প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করা থেকে বিরত থাকছিলেন, তখন নিউজ উইকের লোরেন জেনকিনসকে একান্তে তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি বাঁচানোর আশা

তাঁর নেই আমরা যেভাবে দেশটাকে জানি, তা শেষ হয়ে গেছে তবে আত্তার কাজটা যাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই করেন, তিনি তার অপেক্ষায় ছিলেন।

'আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না। ওরা, পশ্চিমারা সংখ্যালঘু, বিচ্ছিন্ন হওয়াটা তাদের ইচ্ছাধীন।'

সংকট ঘনীভূত হলে দু'সপ্তাহ পর শত শত বাঙালি ঢাকার প্রত্যন্তে মুজিবের বাড়ির প্রাঙ্গনে ও বারান্দায় সমবেত হতে থাকে। পাইপ (বিদেশী এই একটা জিনিসই আমি ব্যবহার করি) টানতে টানতে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রফুল্লচিত্তে। এরকম এক উৎসাহী জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পাশ্চাত্য সাংবাদিকের দিকে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন : 'ভোর পাঁচটা থেকে ক্রমাগত এমনটাই চলতে থাকে। আপনারা কি মনে করেন, মেশিনগান দিয়ে এই তেজ দমন করা যাবে?'

কয়েকদিন পরে একজন সেই চেষ্টাই করলেন

প্রকাশিত : নিউজ উইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১
অনুবাদ : ডক্টর আনিসুজ্জামান।

আমেরিকার সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ দুর্লভ প্রচ্ছদনিবন্ধটি বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের সংগ্রহ থেকে আমার বন্ধু সেবী মওদুদ সূত্রে প্রাপ্ত।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর চোখে একাত্তরের মার্চ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমেরিকার পত্র-পত্রিকাগুলো তখন আমাদের দেশের চলমান উত্তাল গণ-আন্দোলনের সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। বিশেষ করে আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা, নিউইয়র্ক টাইমস-এর পাতায় একাত্তরের মার্চ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রতিবেদন প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদগুলি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ও কিছুদিন পর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে প্রবেশ ক'রে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মজিবানুগত চার অন্তরীণ জাতীয় নেতাকে হত্যা করে, আমাদের মহান সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করার যে নবধারা চালু করা হয়, সেই ইতিহাস বিকৃতির পরিকল্পিত নবধারাটি দীর্ঘ দিনের অপপ্রচারে বেগবান না হলে, মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সংবাদগুলি আমাদের কাছে হয়তো ততোটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হতো না, কিন্তু এখন প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে। নিজ অভিভাবকদের ওপর আস্থা হারানো সন্তানরা সুবিচারের আশায় অনেকসময় প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হয়। আমাদের হয়েছে সেই দশা। আমরা মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের ওপর আস্থা না রেখে, পঁচিশে মার্চের জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের সচিব সিদ্দিক সালিকের রচিত গ্রন্থ বা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার তথ্য সংবলিত দলিল খুঁজে বের করেছি। আলোচনার টেবিলে বসে অলোচনা করে নয় যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে লক্ষ প্রাণের মূল্যে অর্জিত একটি স্বাধীন জাতির জন্য এ আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপদানে সমৃদ্ধ দু'টি সংবাদ নিবন্ধ এখানে সংযুক্ত করা হল

Hero of the East Pakistanis

Tillman Durdin
The New York Times
16 March 1971
Dacca, Pakistan, March 14
Most busy officials display a certain amount of tension and preoccupation, but not Sheik Mujibur Rahman, the Bengali

nationalist who has emerged in recent months as the undisputed leader of the people of East Pakistan.

In person-to-person dealings, Mujib, as he is familiarly called by practically everyone, always seems relaxed and cheerful. He even delivers denunciations with a twinkle in his eyes.

The easy aplomb that makes Sheik Mujib a winning personality in private doubtless also contributes to his extraordinary crowd appeal. But before the masses his diffidence disappears and he becomes a vehement orator wit power to stir his people to cheering enthusiasm.

Sheik Mujib's position of leadership at the age of 50 is the culmination of almost a lifetime of political struggle, usually against vested interests and governments. Born March 17, 1920, in the East Bengal village of Tongipara into a modestly well-to-do Moslem family, Mujib grew up as an extroverted open-handed, sports-loving country boy, not especially good in school but fond of people and well liked by teachers and fellow students

A student Activist

At 22, when he went to Calcutta to get a liberal arts degree at Islamia College, he was prominent student leader and an activist in newly formed All India Moslem League

After graduation from Islamia, Mujib returned to East Bengal to enter Dacca University to become a lawyer

By 1947 he discovered that his native East Bengal now the province of East Pakistan in a nation of two parts seperated by 1,000 miles of Indian territory was being kept in a subordinate position

He resigned from the Moslem League and became an advocate of Bengali rights, a role that quickly got him in trouble with the ruling authorities.

He went to jail briefly in 1948, and in 1949 was sentenced to three years in prison for having participated in illegal demonstrations and strikes.

By the time he left prison, he settled for a few years into a less conspicuous role

He became key member of the newly organized East Pakistan Party, the Awami (Peoples) League, and was elected to the Provincial Assembly

But when Field Marshal Mohammad Ayub Khan established a military dictatorship in 1958 Sheik Mujib again assumed a prominent opposition role.
His new activity resulted in jail terms in 1958 and 1962

Six-Point Program

In 1966, Sheikh Mujib and his associates advanced a six point program that would give the provinces internal self-rule, control over their own foreign aid and leave to the central Government only defense and some aspects of foreign relations
Marshal Ayub had Sheik Mujib arrested in May, 1966 on charges of participation in a plot to make East Pakistan independent By 1968, East Pakistan was in a state of virtual revolt
Widespread opposition to the Ayub Government led to termoil in the West, causing Marshal Ayub to release Sheik Mujib and to resign
Sheik Mujib's popularity was translated into an overwhelming vote for candidates of the Awami League, of which he had become head.
Today Sheikh Mujib is riding on wave of popularity that amounts to mass worship. His word as literally become law
The 'Sheik' in his name is not a title, but simply an honorific meaning that his father is a land owner
Tall for a Bengali, 5 feet 11 inches– he has a heavy shock of graying hair, alert expressive black eyes, and a well-groomed upturned mustache. He usually wears a loose black vest over the billowing white cotton pantaloons and long-sleeved pajama-style shirt that is traditional Moslem dress here.
Sheik Mujib has weak eyes as a result of glaucoma that kept him out of school for three years when he was a teen-ager An inveterate pipe-smoker, he likes foreign makes but insists that his pipes are about the only non-Bengali thing he uses. He lives in a fashionable quarter of Dacca with his wife, Foplatun, three sons and two daughters.
He thinks the proper political system for Pakistan at this stage is democratic socialism. His program calls for nationalization of major banks, and insurance companies, a

procedure roughly along the lines now being persuaded by the Prime Minister Indira Gandhi in India.
Friends do not rate him as an intellectual. He readily concedes that he needs expert advice in many fields

East Pakistan unveil New Flag

By Sydney H. Schanberg
Special in
The New York Times
Published on March 24, 1971

President Heavily Guarded, Takes Ride in Hostile City

Dacca, Pakistan, March 23
The President of Pakistan, who has spent eight days in the eastern wing of his country under heavy protection, came out of his own compound for the first time today for a heavy protected drive to the military cantonment on the edge of the city
Elsewhere in Dacca and the province of East Pakistan the Bengali population celebrated 'resistance day-- resistance to the martial law regime imposed by the West Pakistan dominated central government and unveiled the new flag of Bangla Desh the socalled Bengal nation.
Those scenes a president unable to travel in what is supposed to be his own country without a cordon of weapons. 70 million of his people virtually declaring secession on their own-- put into focus the strangeness of the crisis that has threatened to split this Moslem country into two
The mood the slogans and the talk in the streets are all for independence, while at the bargaining table the three participants are still talking about trying to hold the two wings together, by however tenuous a link

No Sings of Real Progress

The tortuous negotiations over East Pakistan's demand for self rule continued, and all sides kept repeating that some progress was being made. What is going outside the talks

makes it difficult to believe, however, that any compromise agreement will alter what has already happened– the takeover of the province, in effect by the Bengali people lead by Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League party

High Awami League sources said the talks were at a delicate stage The party will wait a few days more, they added and if an agreement cannot be reached by then on its demand for ending the Western wing s long domination of the East, they will go their own way The phrase was not further explained.

The other participants in the talk are the President Agha Mohammad Yahya Khan representing the army, which has ruled under martial law for two years, and Zulfikar Ali Bhutto, dominant political leader in West Pakistan, who heads the Pakistan People s Party

চিশতী শাহ্ হেলালুর রহমান

চিশতী শাহ হেলালুর রহমান। ১৯৭১ সালে চিশতী ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগের ছাত্র। বঙ্গবন্ধুর মতোই সাদা কাপড়ের পাজামা-পাঞ্জাবি পরতো। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওর আরও একটা মিল ছিল। মোটা কালো ফ্রেমের এবং খুব ভারী কাঁচের লেন্সের চশমা পরতো সে। বঙ্গবন্ধুর মতোই চিশতীও ছিল গ্লুকোমার রোগী। চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটতো বলে খুব সহজেই চিশতীকে আলাদা করে চেনা যেতো। হাসিখুশি মুখ। আমরা অনেক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার বিখ্যাত শরীফ মিঞার কেনটিনে দীর্ঘ আড্ডা দিতাম। তখন মধুর কেনটিন ছাত্রনেতাদের দখলে ছিল। আর আমরা যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতাম, তাদের মিলন স্থল ছিল শরীফ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আর্ট কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বুয়েট থেকেও তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা আড্ডার লোভে অনেক সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়েও এসে জড় হতো শরীফে। ঐ শরীফের কেনটিনেই চিশতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। চিশতী মাঝে মাঝে কবিতা লিখতো। আমার কাছে ওর লেখা মানসম্পন্ন বলে মনে হতো না। সে কথা প্রকাশ্যে বলাতে চিশতী রেগে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কবিত্ব শক্তির জোরে আমার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে একপর্যায়ে সে আমার ওপর রাজনৈতিক শক্তির জোর খাটাতেও চেষ্টা করেছিল। আমি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলাম না। আমার কবিতায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আমার বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার কারণে ছাত্র ইউনিয়ন আমাকে তাদের কবি বলে ভাবতো না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখার পরও ছাত্রলীগও তখন আমাকে তাদের কবি বলে মানতো না। আমার অবস্থান ছিল ঐ দু'য়ের মাঝখানে। 'দুলে বান্দা কলমা চোর, না পায় বেহেশত না পায় গোর' বলে যে প্রবাদটি আছে— আমার বেলায় সেটি প্রযোজ্য ছিল। আমি ছিলাম আমার আপন কবিত্বের শক্তিতে আত্মলীন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দেয়া ১১ দফা কর্মসূচী বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে সমান্তরালে গৃহীত হলে আমি আমার অন্তরের স্বস্তি বোধ করেছিলাম এই ভেবে যে, আমার স্বপ্নের দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর পাঞ্জাবিদের পরিবর্তে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হবে না। কেননা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (সেখানে পূর্ব পাকিস্তান মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নেরও যথেষ্ট নিয়ামক ভূমিকা ছিল) দেয়া ১১ দফা কর্মসূচীতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার ছিল।

২৭ মার্চ সকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর শায়িত লাশের সারিতে আমার চোখ যখন হঠাৎ করে চিশতী শাহ হেলালুর রহমানের বিকৃত লাশের ওপর স্থির হয়, তখন আমার খুব কষ্ট হয় ওর জন্য। মনে পড়ে যায় আমার সঙ্গে চিশতীর চলতি বিরোধের কথা। ২৭ মার্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আমার কবিতায় চিশতীর বর্ণনা আছে।

'জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণাবিকৃত মুখ তবু দেশমাতৃকার গর্বে অমলিন।'
(জগন্নাথ হল, ২৭ মার্চ ১৯৭১ ' পৃথিবীজোড়া গান)

২৫ মার্চের রাতে পাক-বাহিনীর নির্বিচার বর্বর আক্রমণে আরও অনেকের সঙ্গে নিহত আমার বন্ধু চিশতী শাহ হেলালুর রহমানের যন্ত্রণাবিকৃত মুখটিকে স্মরণে রেখেই আমার কবিতার ঐ মর্মস্পর্শী পঙ্ক্তিযুগল আমি রচনা করেছিলাম। চিশতী, আমি তোমার কথা ভুলিনি, বন্ধু। যে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে তোমার প্রিয় ছাত্রাবাসে তুমি তোমার অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলে, তোমার সেই স্বপ্নভূমি আমরা পেয়েছি

সম্প্রতি মোস্তফা মহসীন মন্টুর সঙ্গে ঐ রাত্রির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমি চিশতী সম্পর্কে এমন কিছু অজানা কথা জানতে পেয়েছি, যা শুনে আমার মন একধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে। ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরে নেতার নির্দেশক্রমে মমম মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যখন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে রাখা অস্ত্রগুলি বুড়িগঙ্গার ওপারে কেরানীগঞ্জে পাচার করছিলেন, তখন ঐ দুঃসাহসিক দায়িত্ব সম্পাদনে চিশতী ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের বিশ্বস্ত সহযোগী। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে মমম যখন জহুরুল হক হল ত্যাগ করে নদীর ওপারে চলে যান তখন চিশতীকেও তাঁর সঙ্গে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চিশতী যেতে রাজী হয়নি। সে বলেছিল, রাত্রে তার কিছু বন্ধু ও ছাত্রলীগ কর্মী হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাদের সবাইকে নিয়ে পরদিন ২৬ মার্চ সে নদীর ওপারে মমম-র বাড়িতে যাবে। ওটাই ছিল চিশতীর সঙ্গে মন্টুর শেষ-কথা। চিশতী জানতো না যে ওটাই হবে তাঁর প্রিয় ছাত্রাবাসে তাঁর জীবনের শেষ রাত্রি।

ঢাকার নিরস্ত্র বাঙালির ওপর, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনটেনমেন্ট হিসেবে পরিচিত জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলে পাক-বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর রাতের মধ্যেই নদীর ওপারে পৌঁছে যায় ভোরের দিকে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বেশ কিছু আহত পুলিশ ও ইপিআর-সদস্য বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেয়। তখন কালবিলম্ব না করে ২৬ মার্চ সকাল দশটার দিকে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে মমম কেরানীগঞ্জ থানাটি দখল করে নেয়। ঐ থানা

দখলের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মমম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন- সুবেদার রফিক, মমম-র সেকেন্ড ইন কমান্ড (তাঁর ভাষায় টু-ইনসি) জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগ নেতা কেরানীগঞ্জের ছেলে রহিম, আলিম হাজী, মদিনা, রফিক হাজী, ভুলু, কামাল, বুলবুল, ইকবালসহ আরও বেশ ক'জন, যাদের নাম মমম সেই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারেননি থানার দারোগা জনৈক তালুকদার তখন থানাতে ছিলেন না। তিনি তার বাড়িতে ছিলেন প্রাণের ভয়ে তিনি বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন কিন্তু যখন খবর পেলেন যে, অনেক চেষ্টা করেও থানার অস্ত্রভাণ্ডটি ভাঙতে পারা যাচ্ছে না, তখন সেই খবর পেয়ে 'এই যে চাবি, এই যে চাবি' বলে অস্ত্রাগারের মূল চাবিটি নিয়ে দৌড়ে আসেন থানার ওসি তালুকদার। তারপর অস্ত্রাগার খোলা হয় এবং সেখানে রাখা ২০টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও বেশ কিছু গোলাবারুদ লুট করা হয়। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে সেখানে মমম-র নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং পতাকার উদ্দেশ্যে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। সেখানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মতো পারঙ্গম কাউকে না পাওয়ায় সেদিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়নি। ঐ খণ্ডযুদ্ধে প্রাণহানি হয়েছিল কিনা-এই প্রশ্নের জবাবে মমম একটু বিব্রত বোধ করে বলেন, -'ওটা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু দ্যাট ওয়াজ ওয়ার যুদ্ধ যুদ্ধের মাঠে পেছনে শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে যাওয়াটা বিপজ্জনক। তাই বুঝতেই পারেন' আমি তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম। বললাম, ওরা সংখ্যায় কতজন ছিল? মমম বললেন, পাঁচজন। ঐ অজানা অচেনা পাঁচজনের জন্য আমার মন কেমন করে।

সেকথা লুকিয়ে রেখে বলি, আপনার এই রফিক সুবেদারটি কে? মমম জানান, তাঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পোস্টিং ছিল। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। আর যাওয়া হয়নি। সুবেদার রফিক, কী করবেন জানবার জন্য একদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। তখন আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে। মার্চ শুরু হয়ে গেছে। একটি অনিবার্য সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেশ বঙ্গবন্ধু সুবেদার রফিককে বললেন, -'পাকিস্তানে আর তোমাকে ফিরে যেতে হবে না। তোমার দরকার আছে। তুমি নদীর ওপারে চলে যাও। সেখানে গিয়ে আমার ছেলেদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দাও।'

নেতার নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে সুবেদার রফিক বললেন, — 'তথাস্তু'

সেই থেকে সুবেদার রফিক কেরানীগঞ্জে আগামীদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন মমম তাঁকে যুগিয়ে যাচ্ছিলেন অস্ত্র। ১৯ মার্চ মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়দেবপুর কেন্টনমেন্টের বাঙালি সেনারা সেখানে ক্ষুব্ধ জনতাও সেই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা সেখান থেকে বেশকিছু অস্ত্র লুট করে। সেই অস্ত্রও মন্টুর মাধ্যমে কেরানীগঞ্জে পৌঁছেছিল।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কমান্ডার মোয়াজ্জেম বললেন 'জয় বাংলা'

ঢাকা থেকে নদীর ওপারে পালিয়ে যাওয়া মানুষজনকে আশ্রয়, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে কেরানীগঞ্জে তিনটি আশ্রয়শিবির বা শরণার্থী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর একটি ছিল ব্রাহ্মণকীর্তা গ্রামের হাজী দীন মোহাম্মদের বাড়িতে। গ্রামের নাম থেকে মনে হয় একসময় ব্রাহ্মণকর্তাদের দাপট ছিল ঐ গ্রামে। কীর্তা শব্দটি কর্তা বা কীর্তি শব্দের খণ্ডিতরূপ হবে হয়তো। দ্বিতীয়টি ক্যাম্পটি ছিল ব্রাহ্মণকীর্তা থেকে মাইল সাতেক পশ্চিমে মমম-র মামাবাড়ি নেকরোজবাগে। ঢাকা থেকে পালিয়ে আমরা তিন বন্ধু– আমি, হেলাল হাফিজ ও নজরুল ইসলাম শাহ্– ২৭ মার্চ রাতে নেকরোজবাগের ঐ দ্বিতীয় ক্যাম্পেই উঠেছিলাম। তৃতীয় ক্যাম্পটি ছিল আওয়ামী লীগের নেতা বোরহানউদ্দিন আহমদের গ্রামের বাড়ি কলাতিয়ায়। বোরহান সাহেব গগন নামেই এলাকায় অধিক পরিচিত ছিলেন

কেরানীগঞ্জ থানা দখলের যুদ্ধে জড়িত যোদ্ধাদের নামের তালিকায় 'হাজী'র প্রাধান্য দেখে আমি জানতে চাইলাম, এই হাজীরা কীভাবে আপনার সঙ্গে জুটলেন? উনারা কারা? তাঁদের বাড়ি কোথায়? মমম জানালেন, – আলীম হাজী, মদিনা ও রফিক হাজী ছিল আপন তিন ভাই। তাদের বাড়ি ছিল জিঞ্জিরার ইমামবাড়ি গ্রামে ওরা অল্পবয়সে হজ্ব পালন করে হাজী হয়েছিলেন। ঐ হাজী ভ্রাতারা এখন কোথায়? কী করছেন? কেমন আছেন? আমার এই প্রশ্নের সামনে মমম থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না কী যেন ভাবলেন। হাজী ভ্রাতাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমি যে তাঁকে কিছুটা বিব্রত করেছি, তাঁর নীরবতা দেখে আমার সেরকমই মনে হল। ভাবলাম মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যে হাজীরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁরা হয়তো তাঁদের ভূমিকা পরিবর্তন করে থাকবেন। এমন ঘটনা খুব বেশি না ঘটলেও ঘটেছে। মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে মুজিবনগর থেকে ঢাকায় ফিরে এসে পাকসেনাদের দোসরের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন কেউ কেউ। আমি যখন ঐ হাজীভ্রাতাদের সম্পর্কে ঐরকমের নেগেটিভ ভাবনা ভাবছি, তখন আমাকে প্রচণ্ড লজ্জার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বুকের ভিতরে পুষে রাখা একটা পুরনো দীর্ঘশ্বাসকে মুক্তি দিয়ে মমম জানালেন, পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশ মুক্ত হওয়ার আগের দিন, ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঐ হাজীভ্রাতারা (তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন, মদিনা অবশ্য হাজী ছিলেন না) আলবদরের হাতে ধৃত হন এবং তিন ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে বুড়িগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

আমার স্মৃতির ভিতরে আমাদের প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক তথ্যই আছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে, সেখানে অনেক তথ্যই নেই। অনেক জানা কথা ভুলে গেছি। অনেকের কথা আবছা মনে পড়ে। অনেকের নাম মনে আসে, তো মুখ মনে আসে না। মুখ মনে পড়ে তো নাম মনে আসে না। অথচ সেই সময় তাদের অনেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের হাতে একটু একটু করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। একটি শব্দের পর আরেকটি শব্দ যোগ হয়ে একটি বাক্য গঠিত হয়। অনেকগুলি বাক্য একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটি রচনা। এক ইটে দালান হয় না। অনেক ইট পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই নির্মিত হয় একটি দালান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দালানটিও সেভাবেই অনেক ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। সেই দালান নির্মিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ ইটের অংশগ্রহণে। তাদের সবার পরিচয় আমাদের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভবও নয়। শেষ-পর্যন্ত প্রতিটি জাতির ইতিহাসই তাই সময়ের কিছু প্রতীক চরিত্রকেই তার বুকে ধারণ করে। কোনো মা কি তার সব সন্তানকে একসঙ্গে তাঁর বুকে টেনে নিতে পারেন? পারেন না। টেনে নেনও যদি, তখন এক সন্তানের মুখের আড়ালে অন্য অনেক সন্তানের মুখ ঢাকা পড়ে যায়। ইতিহাসের সীমাবদ্ধতার এই দিকটা স্মরণে রেখে, সেজন্যেই আমরা গানের ভাষায় বলি, মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে। ঐ অশ্রুজলের ভিতরে আত্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছু কিছু যুবকে ইতিহাসের পাতায় তুলে আনতে পারলেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস ধীরে ধীরে আরও সমৃদ্ধ হবে। আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে করি সেটাই ইতিহাস রচয়িতার একটা বড় দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জগতটাকে লিপিবদ্ধ করতে পারি, তাহলে খণ্ড খণ্ড হয়েও তা একসময় আমাদের অখণ্ড ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক হবে। চৌদ্দখণ্ডে রচিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিলও যেখানে আমাদের ইতিহাসের কুশীলবদের অবদানকে ধারণে অক্ষম, সেখানে আমার একার পক্ষে সেই মহাজীবনের মহাজাগরণের কাহিনী কতটুকুই বা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। আমি সে চেষ্টাও করবো না, আর সেরকম দাবি নিয়েও আমি পাঠকের সামনে হাজির হইনি।

আমি আমার অক্ষমতার কথা জানি। সেজন্য আমি যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখি, তখন যারা ঐ সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে নানাভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা এখনও বেঁচে আছেন, আমার সেই সময়ের বন্ধুদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই আমি কথা বলি। তাতে অনেক ভুলে যাওয়া তথ্য পাওয়া যায়। ভুলে যাওয়া নাম মনে আসে। চিশতী শাহ হেলালুর রহমান সম্পর্কে

লিখতে গিয়ে আমি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু ফরিদের সঙ্গে কথা বলি। ফরিদ তখন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে থাকতো। আইন বিভাগের ছাত্র ছিল। ফরিদ ছিল ছাত্রনেতা আলম আবদুর রবের সহপাঠী চিশতীকে সে খুব ভালো চিনতো। কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনায় ভুলতে বসা অনেকের নাম উঠে আসে। ফরিদের চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বলে আমি জানতে চাই বাবলার কথা। বাবলার আসল নাম আবু সায়ীদ মাসুদ। ডাক নাম বাবলা। বাবলা জহুরুল হক হলে থাকতো। ফরিদ বাবলাকে আমার চেয়েও ভালো করে চেনে এবং ফরিদের কাছ থেকেই জানি যে অভিনেত্রী জয়া হাসান হচ্ছে বাবলার মেয়ে শুনে আমি মুহূর্তের মধ্যে পিতার সঙ্গে কন্যার মিষ্টি হাসিটির মিল খুঁজে পাই। পরে ফরিদের কাছ থেকে জয়ার ফোন নাম্বার নিয়ে আমি জয়ার মাধ্যমে বাবলার সঙ্গে কথা বলি। দীর্ঘদিন পর বাবলার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়। বাবলার কাছ থেকে ২৫ মার্চের রাত সম্পর্কে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। বাবলা মমম, খসরুসহ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও তার যাতায়াত ছিল। ওর প্রাণখোলা মিষ্টি হাসিটির জন্য আমিও বাবলাকে খুব পছন্দ করতাম। ২৫ মার্চ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে বাবলা আমাকে জানায় যে, ২৫ মার্চ রাতে সে যখন খসরুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সশস্ত্র খসরুর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ব্রিজসংলগ্ন মার্কিন দূতাবাসের একজন সচিবের বাসায় পাহারারত সৈনিকদের নিরস্ত্র করে তাদের হাতের অস্ত্রগুলি কেড়ে নেয়া হয়েছিল সেই অভিযানে বাবলা ছাড়াও ছিল মমম ছোটো ভাই হোসেন, নাজিম ও হাদী। তখন রাত আনুমানিক ৯টার মতো হবে। রাত সাড়ে আটটার দিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হবার নির্দেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাদের বিদায় দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গী হাদী ঐ রাতেই ১২টার দিকে নীলক্ষেতে পাক বাহিনীর ব্রাশফায়ারে নিহত হয়। বাবলার কাছে আমি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনে সম্পর্কে জানতে চাই। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২৫ মার্চের রাতে নিহত হন। মমম আমাকে সে কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে বাবলা ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভালো বলতে পারবে। বাবলা জানায় যে, তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য গোলাগুলির ভিতরেই রাত বারোটার দিকে হাতিরপুল এলাকা থেকে ক্রল করে আসছিল ওদের তিন সহযোদ্ধা বেনু, টুলু আর বাচ্চু। সেই রাতে বাচ্চুর পায়ে গুলি লেগেছিল। ঐ বাচ্চু হল আমাদের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনার শ্যালক ওরা ছিল কমান্ডার মোয়াজ্জেম হেসেন হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ দর্শক। পাকসেনারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ি থেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথের ওপর নিয়ে আসে। পাকসেনারা তাঁকে অস্ত্রের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে

পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বললে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন চিৎকার করে জয় বাংলা বলে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে উত্তোলন করেন। তখন পাকসেনাদের গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

বাচ্চু, টুলু আর বেনু নিরাপদ দূরত্বে থেকে পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের প্রথম শহীদ বোধ হয় কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনই হবেন। পাকসেনাদের সঙ্গে স্থানীয় ইনফরমারারাও যে জড়িত ছিল ঐ ঘটনা থেকে তাই প্রমাণিত হয়। তা না হলে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসা তো পাক সেনাদের চেনার কথা নয়। মনে হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহাসঙ্গীতের লয়টি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যে ধ্রুবপদে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিকামী বাঙালিরা তাকেই অনুসরণ করেছিল

বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে শেখ মণি

১৯৭১ সালের মার্চে মহাদেব সাহা থাকতেন আজিমপুরের একটি বাড়িতে। আমার নিউপল্টনের মেস বাড়ি থেকে পাঁচ সাত মিনিটের পথ আমার মেস ছিল আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিমে আর মহাদেব থাকতো কবরস্থানের পূর্ব-উত্তর দিকটায়, আজিমপুর রোডের একটি দ্বিতল ভবনে। ঐ ভবনের নিচতলায় মহাদেব ছাড়াও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বাস করতো। অন্যদের কথা আমার মনে নেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রাক্তন প্রেস-সচিব তাজুল ইসলাম মনে হয় তখন মহাদেবের সঙ্গে থাকতো। আমি সকাল দশটার দিকে পাকসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে মহাদেবের ঐ মেস বাড়িতে গিয়েছিলাম ওর কুশল জানতে। মহাদেব তখন দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সহকারী সম্পাদক। আমাকে বেশ কিছুটা বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে সেখানে যেতে দেখে মহাদেবসহ মেসের সবাই খুব অবাক হয়েছিল। পিলখানা কাছে বলে ইপিআর ও পাকসেনাদের সতত চলাচল ছিল ঐ পথে আমি আজিমপুর কবরস্থানের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম। মহাদেবের মেসে সেদিন আমি রুটি ও ভাজি খেয়েছিলাম পাকসেনাদের বর্বর আক্রমণের ভয়াবহতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যদিও পাকসেনাদের বর্বরতার ভয়াবহতা সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে রাতভর চলা পাকসেনাদের তাণ্ডব আমরা কাছে থেকে দেখেই অনুমান করেছিলাম যে পাকসেনারা ঢাকায় পোড়ামাটি নীতিই অনুসরণ করেছে। তাদের হাতে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে শত শত নয়, ঢাকা নগরীর হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ। শহরজুড়ে গোলাগুলির শব্দকে অতিক্রম করে আমাদের চোখে পড়েছে আকাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ওঠা আগুনের ধোঁয়া।

বঙ্গবন্ধুর ভাগ্যে কী ঘটেছে, তিনি পাকসেনাদের হাতে বন্দী হয়েছেন, নাকি নিহত হয়েছেন, তখন আমরা কিছুই জানতে পারিনি। খবর নেয়ার কোনো সুযোগও ছিল না। টেলিফোন তখন কাজ করছিল না। মিলিটারি অপারেশন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা বাংলাদেশের টেলিফোন সিস্টেম পুরোপুরি অকার্যকর করে দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য পাকসেনারা চালু রেখেছিল তাদের নিজেদের ওয়্যারলেসগুলি। অর্থ বুঝতে না পারলেও, রেডিও খুলে আমরা সেইসব ওয়্যারলেসের ভয়াবহ সাংকেতিক বার্তার কর্কশ আওয়াজ ও কিছুকিছু কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিলাম। মহাদেব আমাকে আর মেস থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দিলো। মহাদেবের পরামর্শ শিরোধার্য করে কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আমি আমার মেসে ফিরে আসি

ঢাকার যখন এই অবস্থা, তখন বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে চলছিল মমম নেতৃত্বে কেরানীগঞ্জ থানা দখলান্তে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সার্বিক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব সেকথা মোস্তফা মহসীন মন্টুর মুখ থেকেই শোনা যাক। মন্টু জানিয়েছেন, তারা যখন কেরানীগঞ্জ থানা দখল করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে নেকরোজবাগে ফিরেছেন, তখন সেখানে এসে উপস্থিত হন যুবলীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণি। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনো সঠিক খবর জানতে না পেরে তিনি সঙ্গতকারণেই খুব অস্থির ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে বঙ্গবন্ধু সঠিক মনে করলে, আমার বিবেচনায় ভিতর থেকে সাড়া পেলে, আওয়ামী লীগের তৎকালীন ট্রেজারার জনাব আবদুল হামিদের বাড়িতে 'সরে যাবার' কথা বলেছিলেন। সেকথা আমি পূর্বে বলেছি। ঐ হামিদ সাহেবের বাড়ি ছিল ফতুল্লায়। আর নদীর ওপারে তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল জিঞ্জিরার নিকটবর্তী দোলেশ্বরে হামিদ সাহেবের একাধিক লঞ্চ ছিল, ছিল কোল্ড স্টোরেজ ও দোলেশ্বরে ইঁটের ভাঁটা। ২৬ মার্চ সকালে শেখ মণি নদীর ওপারে ছুটে গিয়েছিলেন হামিদ সাহেবের সন্ধানে। যদি বঙ্গবন্ধু সেখানে গিয়ে থাকেন

বঙ্গবন্ধু যে খুব নিকটজনের কাছেও তাঁর গৃহীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা খুলে বলতেন না, এই ঘটনাটি সেকথা প্রমাণ করে। পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে ২৬ মার্চ শেখ মণির দোলেশ্বর যাওয়ার ঘটনা থেকে মনে হয়, খুব নিকটজনরাও বঙ্গবন্ধুর এই বিশেষ-স্বভাবের কথাটা জানতেন। তাই শেখ মণি ধরে নিতে পেরেছিলেন যে তাদের কারও সাহায্য না নিয়েও বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে সরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, দোলেশ্বরে পৌঁছতে পারেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ব্যাপারেও দেখা গেছে, বঙ্গবন্ধু সেদিন কী বলবেন, তা কারও জানা ছিল না। ভাষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের নেতাদের সঙ্গে দিনরাতভর বিস্তর আলোচনা করার পরও শেষ পর্যন্ত তিনি লিখিত ভাষণ দেননি। বেগম মুজিবের কথা মতো জনতার সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সেদিন যা তাঁর মনে এসেছিল, তাই বলেছিলেন।

শেখ মণি বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে দোলেশ্বরে হামিদ সাহেবের বাড়িতে যেতে চাইলে শেখ মণিকে পেছনের সিটে বসিয়ে বেশ কয়েক মাইল দুর্গম মেঠো পথ পাড়ি দিয়ে মমম একটি হোন্ডায় চড়ে দুপুরের দিকে দোলেশ্বরে হামিদ সাহেবের বাড়িতে পৌঁছান। হামিদ সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী মমম ও শেখ মণিকে জানান যে, হামিদ সাহেব বাড়িতে নেই, তিনি ইঁটের ভাটায় গেছেন। সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে হামিদ সাহেবকে খুঁজে পাওয়া যায়। হামিদ সাহেব

অভ্যাগতদের নিয়ে যান ঐ ইঁটের ভাটার মধ্যিখানে বঙ্গবন্ধুর লুকিয়ে থাকার জন্য তৈরি করা গোপন আস্তানায়। কিন্তু সেই আস্তানাটি ছিল শূন্য। বঙ্গবন্ধু যাননি।

শেখ মণিকে নিয়ে ফেরার পথে মমম দেখতে পান একটি যাত্রীবাহী বিমান কেরানীগঞ্জের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বিমানটি ছিল পিপিআইএর। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে আগের দিনই বিশেষ বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন, তা তখন তাদের জানা ছিল না। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য তখন পাওয়া যায়নি। মমর ধারণা হল পিআইএর ঐ বোয়িং বিমানে হয়তোবা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা ভুট্টো থাকলে থাকতেও পারেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্টু তাঁর পিঠে ঝোলানো থ্রি নট থ্রি থেকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন ঐ বিমান লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি লক্ষভ্রষ্ট হলে বিমানটি অক্ষত অবস্থায় কেরাণীগঞ্জের আকাশ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়

করাচী বিমানবন্দরে তোলা বন্দী মুজিবের সেই ঐতিহাসিক ছবি

কেরানীগঞ্জ থানার ইমামবাড়ি গ্রামের তিন ভাই (আলিম হাজী, রউফ হাজী ও মদিনা) দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আল বদরের হাতে নিহত হন। সেই তথ্যটি আমার লেখায় প্রকাশিত হওয়ার পর মমম আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর আপন তিন খালাতো ভাই, যথাক্রমে ইকবাল হোসেন, নাজমুল হাসান ভুলু ও ফুয়াদ হাসান বাবুলও একই দিনে আল বদরের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা সাদেক আহমদ ছিলেন একজন অধ্যাপক নিহত তিন ভাইয়েরই বয়স ছিল ষোল থেকে বিশ বছরের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঐ তিন ভাই গেরিলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করছিল। তাদের হত্যা করা হয় ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এবং তাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় ১৫ ডিসেম্বর

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদের তালিকায় এই ছয় তরুণের নাম যুক্ত করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় যাদের আত্মবলিদানের স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হয়নি, সেইসব ভুলে যাওয়া অজস্র নামের ভিতর থেকে কিছুসংখ্যক নামকেও যদি আমি আমার লেখায় তুলে আনতে পারি, তাহলে আমার এই রচনার একটা মূল্য দাঁড়ায় বলেই মনে করছি। কবিগুরু বলছেন– 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' আমাদের সাভারস্থ স্মৃতিসৌধের বক্ষপুটে কবিগুরুর সেই বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। বাংলাদেশকে পাকসেনাদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য যারা তাদের অমূল্য প্রাণ দিয়ে গেছেন, যতদিন না তাদের পূর্ণ তালিকাটি আমরা প্রকাশ করতে পারবো, ততদিন সাভার স্মৃতিসৌধের বুকে উৎকীর্ণ কবিগুরুর ঐ কাব্যবাণীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করা হয়েছে, এমন দাবি করা যাবে না। ততদিন পর্যন্ত বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে। আসুন আমরা আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণ দানকারী প্রিয় শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের জন্য যথার্থ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নামে যে মন্ত্রণালয়টি সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের প্রতিটি থানাকে কাজে লাগিয়ে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা, আমি মনে করি এখনও সম্ভব। ভিয়েতনামের মতো একটি অন্যায় যুদ্ধে নিহত লক্ষাধিক মার্কিন সৈনিকের নির্ভুল তালিকা যদি আমেরিকানরা হোয়াইট হাউসের কাছে ভিয়েতনাম ওয়ার মেমোরিয়েল মাঠে কালো গ্রানাইট পাথরে লিপিবদ্ধ করতে পারে, তো আমরা কাগজ কলমেও তা

লিপিবদ্ধ করতে পারবো না কেন? পারবো। কিন্তু তার জন্য চাই কৃতজ্ঞচিত্তের গ্রানাইটপাথর সংকল্প। চাই অকৃত্রিম নিষ্ঠা, চাই অনিবৃত্ত দেশপ্রেম, চাই অফুরন্ত ভালোবাসা।

২৬ মার্চের দ্বিপ্রহরে কেরানীগঞ্জের ওপর দিয়ে বেশ নিচু হয়ে উড়ে যাওয়া পিআইএ-র যাত্রীবাহী বিমানকে ভূপাতিত করার লক্ষ্যে মমম-র গুলি ছোড়ার বিষয়টি জানার পর পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু হাস্যোচ্ছলে বলেছিলেন, 'কী সর্বনাশ' ঐ বিমানের মধ্যে তো আমিও থাকতে পারতাম। তবে তো তোদের হাতেই আমার মরণ হতো রে!'

না, বঙ্গবন্ধু সেদিন পিআইএর ঐ বিমানের যাত্রী ছিলেন না মমম যখন বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলেন, এবং হামিদ সাহেবের ইঁটের ভাটায় বঙ্গবন্ধুর সন্ধান না পেয়ে শেখ মণি যখন মমম সঙ্গে ব্রাহ্মণকীর্তা থেকে নেকরোজবাগে ফিরছিলেন, ঐ সময়টাতে বঙ্গবন্ধু ঢাকা সেনানিবাসের ভিতরে আদমজী কেন্টনমেন্ট স্কুলের কোনো একটি নির্জন কক্ষে বন্দী ছিলেন। রক্তচক্ষু পাকসেনারা তখন বঙ্গবন্ধুকে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছিলো আর পাকসেনাদের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় পাইপে এরিনমুর তামাক খাচ্ছিলেন আমি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্তে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি যে, ২৫ মার্চ রাত ১-০০ টা থেকে ১-৩০মি: অর্থাৎ ইংরেজী কেলেন্ডারের সময়পঞ্জি হিসেবে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়িতে পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার হন পাকসেনারা আকাশে গুলি ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে তাঁকে সামরিক জিপে উঠিয়ে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং পরে জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে তাঁকে আদমজী কেন্টনমেন্ট স্কুলের একটি নির্জন কক্ষে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দু'দিন দু'রাত আটকে রাখার পর ২৭ মার্চের মধ্যরাতে পিআইএর একটি বিশেষ বিমানে করে তাঁকে করাচীতে নেয়া হয়। ঐ বিমানে বঙ্গবন্ধু একাই যাত্রী ছিলেন

করাচী বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এখন আমাদের জাতীয় সম্পদ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি বড়সড়ো সোফায় বাম পায়ের ওপর তাঁর ডান পাটি তুলে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধমুখে বসে আছেন। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। পাঞ্জাবির ওপরে কালো মুজিব কোট তাঁর চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখ বিষণ্ণ। চোখের দৃষ্টি স্থির। প্রতিজ্ঞাপ্রস্তর মুখের চোয়াল। ঘনকালো গোঁফে ঢাকা পড়েছে তাঁর দুই ঠোঁট। তাঁর অধর ও ওষ্ঠের মাঝে সামান্যতম ফাঁকও নেই। বোঝা যাচ্ছে যে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রানাইট পাথরে নির্মিত মাইকেল এঞ্জেলোর সদ্যসমাপ্ত কোনো ভাস্কর্যের মতো তিনি বসে আছেন

নির্বাক, নিশ্চল তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন পাকসেনা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত আছেন এবং তিনি অন্তরালে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন। পাক-সামরিক জান্তা স্বাধীন বাংলা বেতারের ঐ প্রচারণার ফাঁদে পা দিয়ে করাচী বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার ছবিটি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ করে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার কৃতিত্ব দাবি করে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ ছবিটি প্রকাশিত হয় ৪ এপ্রিল তারিখে। ফলে বিশ্ববাসী জেনে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেফাজতেই রয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন সুতরাং তাঁর নিরাপত্তার সমস্ত দায় এখন পাকিস্তান সরকারের ওপরই বর্তায়। বিশ্বজনমত শেখ মুজিবের অনুকূলে চলে গেলে, গোপনে বিচার করে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ অনেকটাই পাকিস্তানীদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। মোটা মাথার পাকসেনানায়করা সেদিন যা বুঝতে পারেনি, তা হল, ঐ ছবিটি শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার সত্যকেই শুধু প্রকাশ ও প্রমাণ করে না– তিনি যে বেঁচে আছেন সেই কথাটাও প্রমাণ করে। তাঁকে ক্রসফায়ারে মৃত ঘোষণা করার আর সুযোগ থাকে না।

পাকসেনাবাহিনীর গাড়িতে চড়ে আজানার পথে পা বাড়ানোর সময় বহুদিনের অভ্যাসমতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই 'সঞ্চয়িতা' তিনি তাঁর সঙ্গে করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাকসেনারা তাদেরই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিগত সাধারণ নির্বাচনের বিজয়ী নেতাকে তা নিতে দেননি। পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেই কথা সাধারণ জোয়ানদের আজানা থাকলেও, লে. জেনারেল টিক্কা খান সহ সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসাররা তা বিলক্ষণ জানতেন। পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র লুট করলো বটে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে তারা অসম্মান করেনি পাকসেনারা ভেবেছিল, শেখ মুজিব প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবেন কিন্তু তাঁকে বাড়িতে পেয়ে পাকসেনারা খুবই অবাক হয়। শেখ মুজিবের সাহসের কাছে তাদের পরাভব মানতে হয়। আমি পেশাদার পাকসেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডের প্রশংসা করি এজন্য যে, তারা পাক প্রেসিডেন্ট ও পাক সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ অমান্য করে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে বসেনি। পাকসেনাধ্যক্ষের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, শেখকে যদি তাঁর নিজের বাড়িতে পাওয়া যায় তবে যেন তাঁকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা না হয়। কিন্তু যদি পলায়নরত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে তাঁকে প্রয়োজনে হত্যা করা যাবে। অনেক দুঃখের মধ্যেও সুখের বিষয় যে, পাকসেনারা তাদের চিফ বসের নির্দেশ সেদিন মান্য করেছিলেন। ২৫ মার্চের রাত্রিতে মানসিক উন্মত্ততার

যে স্তরে পৌঁছেছিল পাকসেনারা, সেখানে তাদের পক্ষে চেইন অব কমান্ড মেনে চলাটা কম কঠিন কাজ ছিল না। পাকসেনারা দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, ২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রিতেও তাদের মাথা ঠিকই ছিল। অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাথায় একটি পরিকল্পিত গণহত্যা পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং ও পারঙ্গমতা তাদের রয়েছে মনে হয় এসব কারণেই পাকসেনাদের পেশাদারিত্ব নিয়ে পাকিস্তানী ও তাদের সমর্থকরা সুযোগ পেলেই গর্ব করে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল, তাঁকে গ্রেফতার করতে পারলে পাকসেনারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে এবং পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালানোর অভিযোগে হয়তো তাঁকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়ে দিতে পারে। আর পাকসেনারা যদি তাঁকে গ্রেফতার করতে না পারে, তাহলে ক্ষিপ্তহিংস্র পাকসেনারা তাঁর সন্ধানে ঢাকা নগরীর ঘরে ঘরে হানা দিয়ে নিরীহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। বঙ্গবন্ধুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবার পরও তাদের পূর্ব-প্রণীত নীল নকশা অনুযায়ী পাকসেনারা নির্বিচার বাঙালি নিধনযজ্ঞটি অব্যাহতই রাখলো. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিদ্রোহদমনার্থে প্রণীত পাকসেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিদৃষ্টে মনে হয়, তারা খুব ভালো করেই জানতো যে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে পারলেই বাঙালের বিদ্রোহ থেমে যাবে না। কেননা বিগত দিনের বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে (বিশেষ করে ৬ দফা আন্দোলনের) শেখ মুজিব তার স্বাধীনতাকামী অনুসারীদের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, সেখানে শেখ মুজিবের মুক্ত থাকা আর বন্দী হওয়ার মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার খুব একটা রকমফের হতে পারবে বলে মনে হয়নি ফলে একই সঙ্গে মুজিবকে গ্রেফতার করাটা যেমন জরুরী তেমনি জরুরী হচ্ছে মুজিবের অনুসারীদের নির্বিচারে বধ করার মাধ্যমে অকুতোভয় হয়ে ওঠা ভেতো বাঙালির মনের ভিতরে নতুন করে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া তাতে যদি কাজ না হয়, তখন শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ভয় দেখিয়ে তাঁর মুক্তির বিনিময়ে তার অনুসারীদের সঙ্গে দরকষাকষি করার সুযোগ হাতে রাখা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানীদের সেই প্রয়াস সর্বদা অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুটো কারণে সেই পথে পাকসেনানায়করা তাদের প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রথমত জেলখানার পাশে শেখ মুজিবের জন্য কবর খুঁড়েও পাকসেনারা মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধে কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বিবৃতি তাঁর কাছ থেকে কখনও আদায় করতে পারেনি। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা কী, জানতে চাওয়া হলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটি

যেন বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।' শোন কথা? এমন সাংঘাতিক কথা ক্ষুদিরামের পর আর কে কবে শুনেছে? এমন মৃত্যের মতো নির্ভীক মানুষের সঙ্গে কি রাজনৈতিক দরকষাকষি করা চলে? চলে না যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, চলেনি। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চেষ্টা চালিয়েও মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে পাকসেনারা তাঁর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত পাকসেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে শেখ মুজিবকে দ্রুত বিচার করে ফাঁসিতে ঝোলানোর পরিকল্পনাটিও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বরং জেনেভা কনভেনশনের ট্রেনটি ছেড়ে দেয়ার আগেই ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ'র আহ্বানে তড়িঘড়ি করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা পায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বীরের বেশে তিনি তাঁর মুক্ত স্বদেশভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

প্রফেসর সেলিনা পারভীনের লেখায় তাঁর শহীদ পিতার স্মৃতি

ক'দিন আগে আমার সহপাঠী ও সহকর্মী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর আব্দুল মান্নান আমাকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৬ মার্চের সংখ্যাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে রহস্য করে বললেন, পড়ে দেখবেন। সংখ্যাটি পুরানো। আমি গত ৫ এপ্রিল যুক্তরাজ্য থেকে কমনওয়েলথ পোস্ট ডক্টরাল কোর্স শেষ করে দেশে ফিরেছি। স্বাভাবিকভাবেই এই সংখ্যাটি দেখা হয়ে ওঠেনি। পাতা উল্টাতে উল্টাতে ২৮ পৃষ্ঠায় চোখ পড়তেই আমার লোমে লোমে শিহরণ জাগল, রক্তে লাগল মাতাল করা সুর। দেখলাম, আমার ছাত্রী জীবনের সচেতন সময়ে আমার প্রিয় লেখক কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি লেখা। লেখাটি আর কাউকে নিয়ে নয়, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আর অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আমার বাবা শহীদ মোঃ শওকত আলীকে নিয়ে। তিনি তাঁকে নিয়ে লিখেছেন: 'ইতিহাসের বিকৃতিরোধ এবং ইতিহাসকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলীকে বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা প্রদান করা হোক।' স্বাভাবিকভাবেই আমার খুব ভাল লেগেছে, আরও ভালো লেগেছে আমার মায়ের যিনি '৮০র দশকের প্রথম থেকেই অসুস্থ হয়ে ইনভ্যালিড রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন সরকারী কলেজের অধ্যাপনা থেকে। কবি গুণের লেখাটিতে একটি ছোট ভুল ছিল। বাবার মৃত্যু দিন লেখা ছিল ২৮ মার্চ; ওটা হবে ২৯ এপ্রিল। এই কথাটি কবি নির্মলেন্দু গুণ মহোদয়কে জানাতে যেয়ে অনেক কষ্টে তাঁর মোবাইল নম্বর পেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি কবি জানতে পেরে খুশি হলেন। অনেক কথা হল। আমাকে বললেন সব কথা লিখে পাঠাতে, তাই এই লেখার অবতারণা।

'আমার বাবা এই দেশের জন্যে তাঁর জীবনটা স্রেফ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ কিন্তু তিনি ভাবনায় আর কোনো কিছু আনেননি, ভাবনায় আনেননি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আর একমাত্র কন্যার কী হতে পারে, সেই কথাটিও। যখন আমার ছেলে মেয়ে দুটিকে তাদের নানার, তাদের দাদার মুক্তিযুদ্ধে গর্বিত অবদানের কথা বলি, তখন মাঝে মাঝেই আমার চোখে জল নামে, হৃদয়ে আসে বাঁধ ভাঙা অশ্রুর জোয়ার তখন মনকে গ্লানিমুক্ত লাগে, আর অশ্রুসিক্ত মনোজগতকে মনে হয় শুচিশুভ্র। শুধু মনে হয় আমার সন্তানদের তাঁরা এক উজ্জ্বল অতীত দান করে গিয়েছেন, যা তাদের পদচারণাকে কলুষমুক্ত করবে, আর তাদেরকে দিবে যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

আমার বাবা সুবেদার মেজর শওকত আলী ছিলেন তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সিগন্যাল কোরের একজন সৈনিক। ইপিআরএর সিগন্যাল কোরে বাঙালিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার এবং ইপিআর-এর নিজস্ব সৈনিকদের একজন। তার ওপরে যেসব অফিসার ছিলেন, তারা সবাই এসেছিলেন সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে। সিগন্যাল কোরের কম্যান্ডার ছিলেন অবাঙালি অফিসার কর্নেল আওয়ান তার টু আই সি বা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ছিলেন আরেকজন পাঞ্জাবি মেজর। ওই সময় পিলখানায় সব বাঙালি সৈনিকের একান্ত কাছের লোক ছিলেন সুবেদার মেজর শওকত। সাধারণ এবং বাঙালি সৈনিকদের হয়ে তিনি প্রায়ই দর কষাকষি করতেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে। এজন্যে তাদের সুনজর থেকে বঞ্চিতও হয়েছিলেন তিনি। এমনকি একবার সাসপেন্ডও হতে হয়েছিল তাঁকে।

বাবার পোস্টিং তখন পিলখানায় হলেও আমি ও মা রাজশাহী থাকতাম। সে সময় মা ছিলেন রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজের বাংলার অধ্যাপক। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাবা সুবেদার মেজর শওকত আলীর কাছে ঢাকায় বেড়াতে যাই আমি। সেবার আমি বাবাকে বেশ চিন্তিত দেখতে পাই। একরাশ উদ্বেগ যেমন তাঁকে ঘিরে ছিল, তেমনি প্রচণ্ড কর্মব্যস্তও ছিলেন তিনি। অন্যান্য বার বাবা আমাকে নিয়ে মোটর সাইকেলে সারা ঢাকা চক্কর মেরে বেড়াতেন কিন্তু সেবার আর সেরকম বেড়ানো হয়ে ওঠেনি। কার্যতঃ তিনি তখনই নজরবন্দী ছিলেন। মাত্র একদিন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরোনোর সুযোগ পেয়েছিলেন। সাতদিন বাবার সাথে থাকার পর আমাকে তিনি রাজশাহীতে মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পিলখানায় ওই সময়ে আমি বাবাকে নিজের কোয়ার্টারে বসে একাধিক ট্রান্সমিটার বানাতে দেখেছিলাম ট্রান্সমিটারগুলোকে বসানো হয়েছিল নাবিস্কো বিস্কুটের চারকোণা টিনের ভেতর, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওর ভেতর কি আছে? বাবাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন ওগুলো পোর্টেবল্ ট্রান্সমিটার।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রেনিং সেরে ফিরে আসার পর সুবেদার মেজর শওকত অমানুষিক পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিলেন ইপিআর-এর সিগনাল ওয়ার্কশপ। ওই সময় তিনি কাজপাগল বলে পরিচিতি পেয়ে যাওয়ায় তিনি কখন কোন পার্টস নিয়ে কি করছেন, কি বানাচ্ছেন সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না আর সেই সুযোগটাই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। একদিন আমি বাবাকে ওই ট্রান্সমিটারগুলো বানানোর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে মৃদু বকুনি খেতে হয়েছিল আমাকে তখন কারণ জানা না হলেও পরে আর বুঝতে বাকি থাকেনি, কেন বানানো হয়েছিল ওইসব ট্রান্সমিটার।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যা হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইপিআর সিগন্যাল সেন্টার বন্ধ করে দেয়া হয় অস্বাভাবিকভাবে। অথচ স্বাভাবিক সময়ে, এমনকি ঈদের দিনও অপারেটররা পালা করে সিগন্যাল সেন্টারে ডিউটি করতেন। তখন ঢাকা শহরে থমথমে অবস্থা। সিগন্যালের পাঞ্জাবি সেকেন্ড ইন কম্যান্ড এসে সবাইকে ব্যারাকে যেতে বলে নিজে সেন্টারে তালা লাগিয়ে দেয়। অপারেটররা একথা ত্বরিত গতিতে গিয়ে জানান সুবেদার মেজর শওকত আলীকে তিনি তখন সবাইকে ব্যারাকের ঘরে শুতে নিষেধ করলেন এবং ছাদে গিয়ে ঘুমাতে বললেন এর আগে কয়েকদিন থেকেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবাঙালি সৈনিকদের হেলিকপ্টারে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিলখানায় নামানো হচ্ছিল। প্রতিটি ব্যারাকের পিছনে সারি করে ট্রেঞ্চ কেটে তাতে অবস্থান নিয়েছিল পাকবাহিনী। এনিয়ে পিলখানার বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে তীব্র বিরূপভাব বিরাজ করছিল। ২৫ মার্চের আগেই অধিকাংশ বাঙালি সৈনিককে কৌশলে নিরস্ত্র করা হয়েছিল আর ২৪ মার্চ ওরা সুবেদার মেজর শওকতের কাছে থেকে সিগন্যাল সেন্টারের চাবি নিয়ে নিয়েছিল। তখন ইপিআর-এর সৈনিকেরা খালি হাতে গেটে পাহারা দিত। তাদের বলা হয়েছিল অস্ত্র হাতে সৈনিক দেখলে বাঙালিরা উত্তেজিত হবে।

২৫ মার্চ রাত ১১ টার কাছাকাছি সময়ে ইপিআর এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমেদের বাড়ীর দিক থেকে একটা ট্রেসার শেল আকাশে ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই পাকবাহিনী গোটা ইপিআর ব্যারাক, কোয়ার্টার গার্ড দখলে নিয়ে নেয়। নিহত হন হতচকিত অনেক বাঙালি সৈনিক। তবে প্রাথমিক হতাহতের মধ্যে সিগন্যাল কোরের লোক ছিল কম। কারণ, তারা সবাই গিয়ে ঘুমিয়েছিলেন ছাদে। এদিকে সুবেদার মেজর শওকত আলী তার কোয়ার্টারে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সচল হয়ে উঠেছে তাঁর ট্রান্সমিটার। স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি ট্রান্সমিট করতে শুরু করে দিয়েছেন ততোক্ষণে। তার সহকর্মীরা তার বিধবা স্ত্রীকে অনেক কথা পরে জানালেও বঙ্গবন্ধুর ওই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তাঁর কাছে কি করে এসেছিল, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তাঁর সাথে সে রাতে আরো দু'একজন জড়িত ছিলেন। সে রাতে সেকথা পরে মিসেস শওকত জানতে পারেন কর্ণেল আওয়ানের কাছ থেকেই। অন্যরা বোধহয় বাকি সব ট্রান্সমিটার নিয়ে অন্য কোথাও থেকে সেই একই মেসেজ ট্রান্সমিট করবার চেষ্টা করছিলেন যতোটুকু খবর পেয়েছিলাম তাতে জানা যায়, রাত সোয়া বারোটা বা তার কাছাকাছি কিছু সময় পরেই অয়্যারলেস মেসেজ ট্রান্সমিটরত অবস্থায়ই তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। একটি সূত্র থেকে পরে জেনেছিলাম আজিমপুর গেটে প্রহরারত সৈনিকের মারফত রাত ১০টার কিছু পরে তাঁর কাছে মেসেজ পৌঁছে যায়।

প্রথমে তাঁকে রাত একটার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ নম্বর ব্যারাকে তারপর নেয়া হয় মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজের টরচার সেন্টারে। অবশ্য ইপিআর সৈনিকদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয় পিলখানাতেই আর বাকিদের নেয়া হয় মোহাম্মদপুরে টরচার করে তথ্য আদায় করবার উদ্দেশ্যে পিলখানা থেকে শওকতের সাথে আরও বন্দী করে যাদের আনা হয় ওই টরচার সেন্টারে, তাদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার মোল্লা, সুবেদার জহুর মুন্সি, সুবেদার আবদুল হাই, সুবেদার আইউব প্রমুখ। এদের মধ্যে দুইজন সুবেদার মোল্লা ও মুন্সি পরিবার নিয়ে থাকতেন পিলখানার বাইরে। তাই তাঁদের পক্ষে বাইরের সঙ্গে পিলখানার ভেতরের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল। সন্দেহের কারণে এই দু'জনকে সেজন্য পাকবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল।

আব্বার শহীদ হবার কথা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এর আগে বাবার কোন খোঁজ না পেয়ে আমার মা আমাকে নিয়ে সোজা পিলখানায় হাজির হন। সিগন্যাল কোরের কর্ণেল আওয়ান মাকে চিনতেন অনেক আগে থেকেই এবং কলেজের শিক্ষক হিসেবে তাঁকে সম্মানও করতেন। তিনি মা'কে বলেন, তাকে কি করে বাঁচাবো বলুন? তিনি কোয়ার্টার থেকে ধরা পড়েছেন ট্রান্সমিটার সহ। তার কাছে মুজিবের মেসেজ পাওয়া গেছে। এই কথাগুলো বলবার সময়ে কর্ণেল আওয়ান বিব্রতবোধ করছিলেন। কারণ তিনি বাবাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই পছন্দ করতেন। মা সেদিন ঢাকা সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন আখতার ও মেজর এজাজ মাসুদের সাথেও দেখা করেছিলেন, বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখবার জন্যে। তারাও মাকে একই কথা জানিয়েছিলেন। তারা দু'জন ছিলেন আমার ছোট চাচা তৎকালীন মেজর সাখাওয়াত আলীর বন্ধু। চাচা তখন পাকিস্তানে বন্দী কর্ণেল আওয়ান বাবার লুট হয়ে যাওয়া টেলিভিশন, মটর সাইকেল ইত্যাদি ফেরত দিলেও, তাঁর ডায়েরী এবং বই খাতা ফেরত দেননি।

এরপর অনেক চেষ্টা করে আমরা সুবেদার মেজর শওকতের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তার আবছা কিছু চিত্র জানতে পেরেছিলাম। প্রথমে তাঁর সামনেই সুবেদার আবদুল হাই ও সুবেদার জহুর মুন্সির ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। বাবার সামনের একটি দেয়ালে পাক হায়েনারা পেরেক দিয়ে গেঁথে দেয় হাই ও মুন্সিকে। তারপরও তাঁদের শরীরের ওপর অত্যাচার অব্যাহত থাকে। ওইভাবে পেরেক গাঁথা অবস্থায়ই তাঁদের মৃত্যু ঘটে। এ সবই ঘটেছিল তাঁর সামনে সরাসরি ভাবে তাঁকে মানসিকভাবে নষ্ট করার জন্যেই

সুবেদার মেজর শওকতের প্রতিটি নখ তুলে ফেলেছিল ওরা। তারপর দুই চোখে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সারা শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের দগদগে

আগুন যা তৈরী করে দিয়েছিল। মাথার চুলও সব উপড়ে নিয়েছিল। এত অত্যাচারেও তিনি প্রাণ হারাননি, জ্ঞানও হারাননি পাক বাহিনী তার কাছ থেকে তাদের সুবিধেজনক স্বীকারোক্তিও নিতে পারেনি। অবশেষে ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে তাকে আরো ২৫ জন সহ ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের পাগলা ঘাটে। ওই ছাব্বিশজনকে লাইন ধরে দাঁড় করানো হয়। তারপর তাদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং গুলি চালিয়ে দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। এদের মধ্যে সুবেদার আইয়ুব একরকম অলৌকিকভাবেই বেঁচে যান। গুলি হবার ঠিক আগের মুহূর্তেই তিনি প্রচণ্ড শারীরিক ব্যথায় তিনি কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, আর ঠিক ঐ সময়ই গুলি চলে যায় তাঁর মাথার ওপর দিয়ে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ায় পাক সেনারা তাঁকেও মৃত মনে করে এবং অন্যদের সাথে তাঁকেও ঠেলে ফেলে দেয় নদীতে পরদিন সকালে গ্রামের মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায়ই। পরে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সেখানেই তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল রাজশাহী থেকে পালিয়ে যাওয়া সিগন্যাল কোরের আরেক সুবেদার নাসিম আলীর তিনি সুবেদার আইয়ুবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন ওইসব ঘটনা। আমরা জেনেছিলাম ওইসব মর্মন্তুদ ঘটনা সুবেদার নাসিমের কাছ থেকে। এছাড়াও মিসেস শওকত তার শহীদ স্বামীর পেনশন আনবার জন্যে ১৯৭২ সালে পিলখানায় গেলে, তাঁর স্বামীর অনেক সহকর্মীর সাথে দেখা হয় এবং তাঁরা ওই সব বন্দী দিনের কথা আবারও জানান তাঁকে।

সুবেদার আইয়ুব ক'বছর আগে মারা গেছেন। ইপিআর-এর জিডি ব্রাঞ্চের একজন স্টেনোগ্রাফার মোঃ নুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে চরমভাবে অত্যাচারিত হবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মুক্তি পান মোহাম্মদপুরের সেই টর্চার ক্যাম্প থেকে। তিনিও ওইসব ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী এবং এখনো জীবিত রয়েছেন। আরো দুইজন সৈনিক মিসেস শওকতকে জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর বন্দী দিনগুলোর কথা এবং তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চরম অত্যাচারের কথা। তাঁদের একজনের নাম আবদুল মজিদ। তাঁরা জানিয়েছিল, পাঞ্জাবিরা সুবেদার মেজর শওকতকে মেরে ফেলার পর ওদের ওপর অত্যাচার চালাবার সময় টিটকারি দিয়ে বলতো, "কিধার তেরা সুবেদার মেজর? আব তেরা সুবেদার মেজর মুজিবকা ব্রিগেডিয়ার বন গ্যায়া।"

পিলখানা থেকে দুইজন সুইপার এবং একজন কার্পেন্টার আবদুর রউফকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজে, সবকিছু পরিষ্কার রাখা এবং বন্দীদের একবেলা করে খাবার দেয়ার জন্যে তারাও ওইসব ঘটনার সাক্ষী। তারা দেখেছেন, পাক হায়েনারা ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত তথ্য জানবার জন্যে কি অমানুষিক অত্যাচারই না করেছে সুবেদার মেজর শওকত সহ অন্যদের ওপর।

সুবেদার মেজর শওকত ছিলেন বংশানুক্রমে বিপ্লবী রক্তের উত্তরাধিকারী। তাঁর পূর্বপুরুষ মোঃ সাফদার আলী সাওতাঁল বিদ্রোহে বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁর সন্তান মোঃ শাবদার আলীকে বৃটিশদের অত্যাচার এড়াতে নিজভূমি ছেড়ে বীরভূমে নলহাটিতে এসে আস্তানা গাড়তে হয়। সুবেদার মেজর শওকত আলী দুঃসাহসিক নেশায় কম বয়সেই বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ বিভাজনের পর তিনি অপশন দিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন, পুলিশে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে ইপিআর গঠন হলে সেই বাহিনীতে যোগ দেন। সিগন্যাল কোরের একজন সৈনিক হিসাবে দক্ষতার সাথে গড়ে তুলতে থাকেন সিগন্যাল কোরের বিভিন্ন সুবিধাদি দক্ষতার কারণে তিনি ধীরে ধীরে পদোন্নতি পান। শেষ পর্যন্ত তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ইপিআর সিগন্যাল কোরের একমাত্র সুবেদার মেজর পদটি অধিকার করেন। দক্ষতার কারণে তাঁকে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ ট্রেনিং এ পাঠায়। তবে '৬৫-র যুদ্ধের কারণে তাঁকে দেড় বছর পর জরুরি ভিত্তিতে ফেরত আনা হয়।

পরিশেষে আমি শুধু বলতে চাই এখন তো আমাদের কিছুই চাওয়ার নেই। আমার মা তীব্র সংগ্রাম করে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। এখন আমার মায়ের মনে একটিই বাসনা। এদেশের সরকারের কাছে তাঁর আবেদন দেশমাতৃকার ডাকে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে এমন কিছু করা হোক, যা তাঁর প্রতি যথার্থভাবে প্রযোজ্য। যা অনাগত কালের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রেরণা যোগাবে।'

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

লুৎফর রহমানের ভাষ্যে পিতা শহীদ খলিলুর রহমান-এঁর কথা

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ। বাঙালির হাজার বছর ধরে বুকে পুষে রাখা স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন এই মুক্তিযুদ্ধ। তাই জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালির প্রত্যক্ষ ভূমিকার কারণে আমাদের ইতিবাচক প্রাপ্তি এই স্বাধীনতা। সেদিন ইতিহাসের বাঁকে ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতার ডাক দেন, তখন বাঙালি ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাদের কেউ কেউ আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করে গেছে নিজস্ব অঙ্গনে নিরলসভাবে। আর অন্যরা সময়ের ডাকে যথার্থ সাড়াটি দিয়েছেন অকুতোভয়ে।

আমার বাবা শহীদ মোঃ খলিলুর রহমান ছিলেন সেই সব অগ্রসর ব্যক্তিত্বদের একজন যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির লালিত স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে তার পক্ষে কাজ করে আসছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৯ এপ্রিল তিনি নির্মমভাবে নিহত হন ঘৃণ্য পাকবাহিনীর হাতে। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সিআইবি, রাজশাহী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার (এডিসিআইবি) রাজশাহী। সিআইবি ছিল তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের সরাসরি ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চ, যা বর্তমানে এন এস আই নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ঐ সময়ে সিআইবি'তে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম বাঙালি কর্মকর্তা।

পুলিশের চাকুরি করলেও বাবা ছিলেন এক অন্য ধরনের আলোকিত মানুষ। তাঁর কর্মদক্ষতা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পদচারণা তাঁকে দিয়েছিল এক অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই গুণাবলি তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও আট সন্তানের মাঝে। তাই আমি জোর দিয়ে বলবো, আমরা সব ভাইবোনেরা দুই ছাপা অক্ষরের লাইনের মধ্যে সাদা জায়গার লেখাটিও পড়তে পারি তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন একজন নাগরিক। যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, তখন আমরা সিলেট শহরে। কুমিল্লা থেকে এসে ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার মোস্তফা ভাই কেন জানি কেমন করে খুঁজে বের করলেন আব্বাকে। সিলেট শহরে জল্লার পাড়ে আমাদের বাসায় প্রতিষ্ঠিত হল কচি কাঁচার মেলা আর শিল্পবিতান।

ঢাকা থেকে কচি কাঁচার মেলার দাদাভাই, কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পী হাশেম খান, মাহবুব তালুকদার, আবুল বারক আলভী, সুফিয়া কামালের মেয়ে রুনু আপা (বর্তমানে এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল) প্রমুখ সবাই এসেছিলেন এই বাঙ্ময় অনুশীলনে। তখন ইত্তেফাক ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম সারির

শব্দসৈনিক। কাচি কাঁচার মেলার সদস্যপদ দিয়ে শুরু করে পত্রিকার মানসিকতার ছত্রছায়ার বড় হওয়া অগ্রসর পাঠকরা স্বভাবতই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে উৎসাহিত হতো, যেমন হয়েছিলাম আমরা। আর এ ব্যাপারে আমার বাবার ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

সিলেট থেকে ১৯৬২ সালের শেষ দিকে বদলী হয়ে এলাম ফরিদপুরে। ফরিদপুরে আমার বড়বোন ভর্তি হল রাজেন্দ্র কলেজে আর আমি ফরিদপুর জেলা স্কুলে। তখন "শরীফ শিক্ষা কমিশন" রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনের জের চলছে। ১৯৬৩ সালের প্রথমে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্রলীগের গোড়াপত্তন ঘটল আমাদের বাসা থেকেই ঝিলটুলি মহল্লার শরৎ কামিনী আলয়ে তখন থাকতাম আমরা। আমার বড় বোন লাইজু (পরবর্তীতে বাংলাদেশে প্রথম পার্লামেন্টের এমপি), কে এম ওবায়দুর রহমানের ছোট ভাই মামুন, টিপু ভাই প্রমুখ ছিলেন কলেজে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার অগ্রবর্তী সৈনিক। সেবার কলেজ ইলেকশনে ছাত্রলীগ একটি আসন দখল করে, বাকী সবগুলো পায় স্থানীয় দল পিএসএফ। এনএসএফের ঘাঁটি ধূলিসাৎ হয়। ক'দিন পরে পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রনেতা দু'জন কে এম ওবায়দুর রহমান ও শেখ মণি ফরিদপুরে আসেন এবং আমাদের বাসায় আত্মগোপন করেন। যদিও আব্বার হাতেই ছিল তাদের ধরবার ভার। আব্বা তখন ফরিদপুর ডিএসবি'র ডিএসপি

বিভিন্ন শহরে বদলি হয়ে অবশেষে আমরা আসি রাজশাহী। আব্বা বদলি হলেও ৬৫ সাল থেকে আর রাজশাহী ছাড়িনি আমরা। লেখাপড়া আর ছাত্র রাজনীতিতে তখন আমাদের কয়েক ভাই বোনের উত্তাল পদচারণা। পরিশেষে আব্বা রাজশাহীর সি আই বি' তে এসে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে

রাজশাহী কলেজে '৬২ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনের পর থেকে প্রিন্সিপাল আব্দুল হাই স্যারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ প্রতিষ্ঠা পায়। কলেজে তাদের ছিল একচেটিয়া দুর্বৃত্তপনা। ১৯৬৫ সালে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয়ে দেখি তাদের বিরুদ্ধে চাপা একটি ক্ষোভ বিরাজ করছে সর্বত্র, ঠিক ওই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয় লাভ করে। ভিপি হন ছাত্র নেতা আবু সাইদ (পরবর্তীতে আওয়ামী সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রি) আর জিএস হন সরদার আমজাদ হোসেন তার ঢেউ আছড়ে পড়ে রাজশাহী কলেজে। অনেক সংকট কাটিয়ে অত্যাচার সহ্য করে কলেজ থেকে এনএসএফ বিতাড়িত করে ছাত্রলীগ জয়লাভ করে। আর এর প্রতিটি স্তরে গোপনে আব্বার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। তৎকালীন ছাত্র নেতাগণ (পরবর্তীতে যাদের অনেকেই মন্ত্রী হয়েছেন) সবাই তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

বঙ্গবন্ধু সব সময়ই সরকারের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন . আমার আর আমার বড়বোনের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৪ সালে ফরিদপুরে। তার পর থেকেই যোগাযোগ ছিল তাঁর শাহাদৎ-বরণ অবধি . স্বাভাবিকভাবে ছাত্র রাজনীতিতে আমাদের সক্রিয় পদক্ষেপ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভালভাবে নেয়নি যা বলছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে মাঝে মাঝেই প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতেন আব্বা। নানা কথার মাঝে আজও মনে আছে একদিনের কথা। তখন ১৯৭০-এর নির্বাচনের বিষয় সামনে রেখে মনোনয়নের পালা চলছে। মোজাফ্ফর ন্যাপ নেতৃবৃন্দ দেখা করে বঙ্গবন্ধুকে একসাথে নির্বাচনের সম্ভাবনা বিচার করে ২৫টি মতো আসন দাবী করেন। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক ভাবে ৭টি আসন দিতে রাজী ছিলেন তখন বেগম মতিয়া চৌধুরী (তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী, বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেত্রী) একটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব ছিল ন্যাপ একটি আসনও নেবে না, তবে সব প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যৌথ প্রার্থী বলে ঘোষণা থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু আলোচনায় সাময়িক বিরতি দিয়ে আব্বাকে ফোন করে সিআইবি ইলেকশন রিপোর্ট জানতে চান। আব্বা তাঁকে জানান যে, তারা এই মাত্র সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্টকে, "ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরী ফর আওয়ামী লীগ।" এমতাবস্থায় চাইলে আওয়ামী লীগ একলা নির্বাচনে যেতে পারে তবে ঐ সময়ে ডিএমআই রিপোর্টে জেনারেল উমর ও জেনারেল মিঠ্ঠাখানের মন্তব্য ছিল পর্যাপ্ত অর্থ দিতে পারলে আওয়ামী বিরোধীরা অন্তত ৪০টি আসন পাবে সেই অনুযায়ী প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খান ও খান সবুরের হাতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা দেওয়াও হয়েছিল। কাজ হয়নি। এই সব কথা আব্বার কাছ থেকে শোনা।

সময় দ্রুত এগিয়ে চললো। "ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরী ফর আওয়ামী লীগ" যথার্থই ফললো কিন্তু সামরিক বাহিনী তার চিরাচরিত ভূমিকা পালন করলো। ব্যর্থ হল শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর যাদের মনে তিলমাত্র দ্বিধা ছিল তারাও বুঝলো স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। দ্রুত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল। আমি তখন শহর শাখা ছাত্রলীগের দায়িত্বে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিক জীবন ছিল না। রাজশাহীতে পাকবাহিনী ঢুকলে আমার পিঠাপিঠি দুই ভাইকে নিয়ে রাজশাহী ছাড়ি ১৩ এপ্রিলের দিকে। চৌদ্দ এপ্রিল রাজশাহী সিআইবি অফিসে ঢুকে পাকবাহিনী গুলি করে হত্যা করে দুই জন অফিসারকে, আরও কয়েকজন গুলি বিদ্ধ হয়। আব্বাকে গুলি করতে যেয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়, শুধুমাত্র আব্বার কাছ থেকে ব্যাংক থেকে তুলে আনা টাকা লুট করার সুবাদে আব্বা সিনিয়র অফিসার হিসাবে দপ্তরের দায়িত্বে থেকে যান। তার পালিয়ে যাওয়ার মূল

বাধা হয়ে দাঁড়ায় শহীদদের পরিত্যক্ত পরিববারবর্গ আর আমার বৃদ্ধ নানা-নানী। কিন্তু যে আবু আক্তারের পরিবারকে দেখভালের জন্য তিনি থেকে গেলেন, তারাই আর্মির কাছে আব্বার বিরুদ্ধে আমাদের দুই ভাইবোনের কথা লাগালো। তাদের ঈর্ষা তাদের স্বামী / পিতা মারা গেছে, আমাদের আব্বা কেন বেঁচে থাকবে। তারই ফলশ্রুতিতে পাকবাহিনী ২৫ এপ্রিল আব্বাকে ধরে নিয়ে যায় এবং ২৯ এপ্রিল তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে মারে।

১৩ এপ্রিলের পর আমার সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে আমি ৭নং সেক্টরে ৩নং সাব সেক্টরে ছিলাম রাজশাহীর উত্তরাঞ্চল দিয়ে ঢুকে রাজশাহী আসতে পারি ১৭ ডিসেম্বর। গ্রামের বাড়ী থেকে আম্মা ও আমার ভাই বোনেরা আগেই পৌঁছেছিল। তথ্য তল্লাশী করে আব্বার মৃত্যুর বিষয়ে কেস ফাইল করেছিলাম। অনেক প্রমাণও যোগাড় করেছিলাম। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় আব্বার হত্যাকারী মেজর সালমান মামুদ এফআইইউ ৬১২ ইউনিট আর একই ইউনিটের নায়েক সুবাদার হায়াত মাহমুদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে বিচার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কাছে সরাসরি অভিযোগ করেছিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়ে করুণভাবে চেয়েছিলেন আমার দিকে। কিছু বলেননি। আমার বড় বোন নাজমা শামীম লাইজু, প্রথম পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিল (রাজশাহী-দিনাজপুর জেলা থেকে) তিনি তাঁকে বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের সদস্য করে রাশিয়াতেও পাঠিয়েছিলেন।

কোন চাওয়া বা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই লেখাটি লিখছি না। কালের আবর্তনে স্মরণের আড়ালে চলে যাওয়া স্মৃতিকে দীর্ঘায়িত করতে শুধু কলমের আঁচড়ে ধরে রাখতে চাইলাম। আমার পিতা শহীদ মোঃ খলিলুর রহমান, আমার শ্বশুর শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলী দু'জনেই কাকতালীয় ভাবে ২৯ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। তবে দু'জন দুই জায়গায়। আমার স্ত্রী একদিন দুঃখ করে তাঁর বিভাগের সহকর্মীদের বলছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কেউই আমাদের পিতার মরদেহ দেখতে পাইনি। পারিনি উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন করতে। কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই যে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে মন ভরে দেখি বাবার শেষ বিশ্রামগৃহ। এই দুঃখ কোথায় রাখি? তখন তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষক প্রফেসর আতাউর রহমান খান সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন "তুমি কি বলছো? তাঁরা সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ধূলিকণায় বিরাজ করছেন তুমি মনের চোখ খুললেই সব দেখতে পাবে। অবিনশ্বর তাঁদের অস্তিত্ব, শুধু তোমাদেরই অনুভবের অপেক্ষা।"

'বীরশ্রেষ্ঠ' শহীদ শওকত আলীর ওপর লেখা শহীদকন্যা প্রফেসর সেলিনা পারভীন ও সেলিনার স্বামী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আরেক মহান শহীদ মোহম্মদ

খলিলুর রহমানের পুত্র জনাব লুৎফর রহমানের স্মৃতিলেখা পাঠ করে আমার অন্তর আনন্দবেদনায় উদ্বেলিত হয়েছে। তাঁদের শহীদ পিতার প্রতি পরমশ্রদ্ধায় নত হয়েছে আমার অন্তর। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের পিতৃস্মৃতিকথা, তাঁদের দু'জনের কেউই আমাদের লেখককুলের কেউ নন। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের স্ব স্ব আপনজনের আত্মদানের কথা তাঁরা সাবলীল ভাষায় যেরকম মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় আমার চলমান রচনার সঙ্গে তাঁদের রচনা দু'টিও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মনে হয়েছে তাঁদের রচনা গুণধনে সমৃদ্ধ করেছে আমার রচনাটিকে। সেখানে ঘটনার পরম্পরা বর্ণনায় ছন্দচ্যুতি যেমন ঘটেনি, ভাষাশৈলীতে ভাঙনের কোনো চিহ্নও তেমনি চোখে পড়ে না। তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁদের দীর্ঘদিনের অন্তরলালিত বেদনা ও গৌরববোধই আড়াল থেকে তাঁদের লেখার ভাষা যুগিয়েছে; যেখানে দুঃখ আছে, দ্রোহ আছে, আছে মৃত্যু, আছে গর্ব–, কিন্তু কোথাও মালিন্যের স্পর্শমাত্র নেই এই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস, তার উপযুক্ত ভাষা। এখানেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম গৌরব।

গত কিস্তিতে একটি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। সেখানে প্রকাশিত ছবিটি শহীদ খলিলুর রহমানের নয়, ঐ ছবিটিও ছিল শহীদ শওকত আলীর তার মানে কিছুদিন আগেও যে 'বীরশ্রেষ্ঠ'(এখনও পর্যন্ত সরকারীভাবে ঘোষিত না হলেও, আমার বিবেচনায় তিনি আমাদের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য) শহীদ শওকত আলীর ছবি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও যার ছবি আমাকে সরবরাহ করতে পারেননি, সেই শহীদ শওকত আলীর একটির পরিবর্তে দু'টি ছবি আমার ভুলের কারণে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেলো। আমার অনুরোধে শহীদ শওকত আলীর কন্যা প্রফেসর সেলিনা পারভীন ও শহীদ খলিলুর রহমানের পুত্র জনাব লুৎফর রহমান তাঁদের নিজ নিজ পিতৃস্মৃতি লিখে পাঠানোর পাশাপাশি আমাকে দু'টি ছবিও স্ক্যান করে পাঠিয়েছিলেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম ভিন্ন পোজে তোলা ঐ ছবি দুটি যথাক্রমে শহীদ শওকত আলী ও শহীদ খলিলুর রহমানেরই হবে কিন্তু ঘটনা তা নয়। যাই হোক, এরকমের একটি মধুর ভুলের জন্য আমি দুঃখিত বোধ করার পরিবর্তে বরং বেশ আনন্দিতই বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে, এই মধুর ভুলের ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হল গভীরতর এই সত্যটি যে, শওকত আলী আর খলিলুর রহমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। একই দিনে (২৯ এপ্রিল ১৯৭১) তাঁরা শহীদ হয়েছেন, একই কারণে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান জীবন বিসর্জন করে গেছেন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মিশেমিশে তাঁদের তো একাকার হওয়ারই কথা। যিনি শওকত আলী, তিনি শুধু শওকত আলীই নন, তিনি তো কিছুটা খলিলুর

রহমানও। যিনি খলিলুর রহমান তিনি তো কিছুটা শওকত আলীও বটে। তাই এই দুই বীর শহীদের পুত্র-কন্যার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে, আমি যেন তাঁদের নিজ নিজ শহীদ পিতার অপ্রকাশিত ইচ্ছার প্রতিফলনই দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমার প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।'

(গীতবিতান : পৃষ্ঠাঃ ২৯৪)

দীর্ঘদিন ধরে 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য শহীদ শওকত আলীর প্রতি যে অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছে, পরপর দুই সংখ্যায় তাঁর ছবি প্রকাশের ভিতর দিয়ে আমাদের কৃত-অপরাধের অন্তত কিছুটা হলেও লাঘব হল। তাই, ওটাকে ঠিক ভুল না বলে ভুল-সংশোধনই বলতে পারি

নেকরোজবাগে খসরু, তার হাতে এলএমজি

২৭ মার্চের রাতে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে নেকরোজবাগে, মমমর মামাবাড়িতে স্থাপিত আশ্রয়শিবিরে অনেকদিন পর খসরুর সঙ্গে আমার দেখা হল। মধ্য ষাটদশকের শুরু থেকেই, মুসলিম লীগের ছাত্র শাখা এনএসএফের দুর্বৃত্তপনার বিরুদ্ধে বীরদর্পে লড়াই করার কারণে খসরুর নামটি তখন মন্টুর নামের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে সবাই বলতো- মন্টুখসরু বা খসরুমন্টু। যেন তারা একই আত্মা দুই দেহ। সম্ভবত ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বা ১৯৬৯ সালের শুরুতে কোনো একদিন ঢাকার নিউ মার্কেটে পাক গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিকামী বাঙালি যুবমহলে বীরের মর্যাদা লাভ করেছিল নিউ মার্কেটের মোনিকো রেস্টুরেন্টে পাকসেনাদের আনন্দ দেবার জন্য প্রচারিত কওয়ালি অনুষ্ঠান শোনার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ পাকসেনা হত্যার ঘটনাটি ঘটে ঐ মোনিকো রেস্টুরেন্টটি ছিল আমাদের খুবই প্রিয়। আমরা ষাট দশকের রাগী তরুণ কবি-লেখকরা সেখানে প্রচুর আড্ডা দিতাম সেই ঘটনার সঙ্গে মন্টু বা তার ভাই সেলিম সরাসরি জড়িত ছিল না। যারা জড়িত ছিল তারা হল– খসরু, বাবলা, নাজিম, বাচ্চু, মওলা, হুদা ও মিলন

তথ্য সূত্র আবু সায়েম মাসুদ বাবলা

ঘটনার দিনই গভীর রাতে ইকবাল হল ঘেরাও করে পাকিস্তানের যৌথবাহিনী হল থেকে মন্টু ও তার বড় ভাই সেলিমকে গ্রেফতার করতে পারলেও ঘটনার মূল আসামী খসরুকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। হলের ছাদে ট্যাঙ্কভর্তি পানির ভিতরে সারারাত লুকিয়ে থেকে খসরু অলৌকিকভাবে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়। সারারাত পানির নিচে লুকিয়ে থাকার কারণে তার দেহের চামড়া মরা মাছের মতো সাদা ও শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুঃসাহসিক ঘটনাটির কথা তখন বাংলাদেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

পাক সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে দ্রুত বিচারে মমমর অগ্রজ সেলিমের মৃত্যুদণ্ড ও মন্টুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ড. কামাল হোসেন ঢাকা কেন্টনমেন্টের ভিতরে অনুষ্ঠিত সেই মামলা পরিচালনা করেছিলেন সেই রায় কার্যকর হওয়ার আগেই কারাগার ভেঙে মন্টু ও সেলিম বেরিয়ে আসে, ঐ কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের বেশ ক'জন কয়েদীর মৃত্যু হয়। মুক্তিকামী বাঙালির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই কারাগার ভেঙে পলায়ন করার অভিযানে ঐ কয়েদীরা সেদিন তাদের সাহায্য করেছিলেন। সেলিম

মন্টুকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডভোগরত কয়েদীদের আত্মদানের ঘটনাটিকে আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি এ কারণে যে, মন্টু বা সেলিম তাদের বিবেচনায় সেদিন শুধু দুই সহোদরই ছিলেন না, বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দুর্ধর্ষ কয়েদীদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তির প্রতীক। কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার সেই দুর্ধর্ষ কাহিনীর কিছুটা আমি মন্টুর মুখে শুনেছি। কিছুটা শুনেছি আবু সায়েদ মাসুদ ওরফে বাবলার মুখে।

নেকরোজবাগে খসরুকে একটি লাইট মেশিনগান গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরাফিরা করতে দেখে আমার সেইসব ঘটনার স্মৃতি মনে পড়লো। মনে পড়লো, আমাকে সিআইডির তথ্য পাচারকারী হিসেবে সন্দেহ করে একদিন রাতে খসরু আমার বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে দিয়েছিল। আমরা ক'জন বন্ধু ইকবাল হলের সামনের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিলাম। দলবল নিয়ে খসরু তখন হলে প্রবেশ করে। হলে প্রবেশ করার মুখে অন্য সকলকে ছাপিয়ে কেন জানি, হয়তো আমার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্য, আমার ওপর তার চোখ পড়ে। সে ছুটে এসে আমার পাঞ্জাবির কলার গলার সঙ্গে সজোরে চেপে ধরে আমাকে হেচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলে এবং মস্তানরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেরকম পোকামাকড়ের মতো আচরণ করে, সেভাবেই অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগাল করে জানতে চায় —আমি আসলে কে এবং কী আমার আসল কাজ। আমি যত বলি, 'এ-কী করছেন? ছাড়ুন আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

খসরু ততই ক্ষিপ্ত হয়ে আমার গলা আরও জোরে চেপে ধরছিল। বলছিল, -'চল, মাঠে চল।'

তখন আমার ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ পারভেজ (ইকবাল হলের প্রাক্তন ভিপি) ও চলমান ভিপি জিনাত আলী ছুটে এসে খসরুর রুদ্র হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে। ওরা খসরুকে জানায় যে আমি একজন কবি। তাঁদের ভাষায়, ভালো কবি। তারা রুদ্রক্ষিপ্ত খসরুকে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, পাকিস্তানের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এটা আমার কোনো ছদ্মবেশ নয়।

ও মাইয়া, ধীরে চালাও তরণী

প্রিয় গুণদা
নির্মলেন্দু গুণ

কবিতার মতোই আপনার অসাধারণ গদ্যেরও একজন মুগ্ধ পাঠক আমি। সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত আপনার আত্মজৈবনিক ধারাবাহিক 'আত্মকথা ১৯৭১' আমার প্রবাস জীবনের প্রবল যান্ত্রিকতার ভেতরেও একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা। সাধারণত কোনো ধারাবাহিক রচনা নিয়মিত পড়তে পারি না আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি কিংবা ভুলে যাই কী ঘটেছিল আগের পর্বে। বিস্ময়কর ঘটনা— এই প্রথম ধৈর্য এবং স্মৃতি দুটোই আত্তার কন্ট্রোল। নিজের স্মৃতিকথার ভেতর অন্যের স্মৃতিকথার মিশেলে এ এক অভিনব ইউনিক স্টাইল।
আপনার উজ্জ্বল গদ্যে ইতিহাসের মতো একটি খটমটো বিষয়ও হয়ে উঠেছে উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিনীর মতোই চিত্তাকর্ষক। অসংখ্য চরিত্র আর শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাবলি আপনি অবলোকন করেছেন কখনও কবির দৃষ্টিতে, কখনও সাংবাদিকের দৃষ্টিতে, আবার কখনও বা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষকের নিস্পৃহ তৃতীয় নয়নে ইতিহাস বিকৃতির বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে আপনার রচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অতিপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রেফারেন্স বই হিসেবে এই বইটির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে বারবার।
আপনার ২৪তম কিস্তি "খসরুর সঙ্গে দেখা" পর্বে বর্ণিত আপনার আনন্দমোহন কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল হলের প্রাক্তন ভিপি মাসুদ পারভেজই যে পরবর্তীতে আমাদের চলচ্চিত্রের বিখ্যাত নায়ক (এপার ওপার, দোস্ত দুশমন) সোহেল রানা, আপনার রচনায় সেটার উল্লেখ থাকলে ভালো হতো।
বাংলায় কম্পোজ নতুন শিখেছি, এখনো পুরোপুরি রপ্ত করতে পারিনি। বানান ত্রুটি মার্জনীয় মৃত্তিকা কেমন আছে? ওকে আমার শুভেচ্ছা আপনি ভালো থাকবেন নির্মলদা।

লুৎফর রহমান রিটন
অটোয়া, কানাডা
৩০ মে ২০০৭

Goon Da,

I am a Probashi Bangalee in Sweden. I am reading your autobiography of 1971. It reminds us of the golden era of our great liberation war. It became another EKATTORER DINGULI of Jahanara Imam. Unfortunately I missed first 10 parts. How can I get those?
I believe in the fundamental values of the creation of Bangladesh. And that is democracy, socialism, nationalism and secularism. Through these four points we have achieved our MUKTI SANAD, the constitution of 72. I still believe that BAKSAL is the only possible way to reach our cherished goal the SONAR BANGLA.
I would love to get your reply. Joy Bangla. Regards

Mustafa Jamil

Banglar Mukh
Råda Portar 96
435 32 Mölnlycke
Sweden

Dear Goon uncle,

My name is Omlan. I am a regular reader of your article in 2000 thou I am only 14 years old. I just love your article because I am really interested in 1971, Muktijuddho. I know a lot of true story of 1971. And I know the real story and behind story of Muktijuddho. Because my parents (esp. my dad) are very "Srijonshil". My moms choto chacha died in 1971. My grandfather and my boro mama was almost caught by the Pak hanadar army. etc.... I know the 7th march historical speech of Bangabondhu. I know the real 27th March's Ziaur Rahman's speech (My father is not an Awami Leager or BNP). I don't think you'll read this mail besides so much big big writer but I am hoping a reply from you.

Omlan
Mohammadpur, Dhaka

সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রীতিভাজন গোলাম মোর্তোজা (ওর নাম শুদ্ধ করে লিখতে গিয়ে আমি বারবার হিমশিম খাই) গত সংখ্যায় প্রকাশিত (অধ্যায় ২৪) আমার ধারাবাহিক রচনাটির তলদেশে খুব ছোট কণ্টে আমার ইমেইল এ্যাড্রেস (আন্তর্জাল ঠিকানা) দিয়ে দিয়েছিল, যাতে পাঠকরা প্রয়োজনবোধে আমার লেখাটি নিয়ে তাদের মতামত সরাসরি আমাকে জানাতে পারে। বলা বাহুল্য আমার অনুমোদন নিয়েই সে ঐ কাজটি করেছে তাতে ভালো ফল ফলেছে। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার দিনই তিন রকমের পাঠকের কাছ থেকে আমি তিনরকমের তিনটি চিঠি পেয়েছি। রকম শব্দটির মধ্যে আমাদের জনপ্রিয় প্রবাসী ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটনকেও যুক্ত করাটা হয়তো ঠিক হল না। বিষয়টাকে সে কীভাবে নেবে জানি না। রিটন কিছু মনে করো না, ভাই। আমি কবি, তোমার দীর্ঘদিনের চেনা-জানা নির্মলদা– এই সহজ কথাটা ভুলে যাও। আমি লিখছি ইতিহাস। আমি এখন রচনাসূত্রে ঐতিহাসিক, ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাস লেখক বা ইতিবৃত্তকার 'হিস্টোরিয়ান' কথাটার অনূদিত চারটি বাংলা প্রতিশব্দের মধ্যে ইতিবৃত্তকার শব্দটাই আমার ভালো লাগছে। এই আনকোরা শব্দটির সঙ্গে আগে কখনও আমার দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ভারী সুন্দর শব্দ। একইসঙ্গে শ্রুতিমধুর এবং অর্থবহ। রচনার রকমবিবেচনায় মনে হচ্ছে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবিদ নয়, ইতিবৃত্তকার অভিধাটাই আমার সম্পর্কে যথার্থ হবে ঐতিহাসিক নয়, নিজেকে ইতিবৃত্তকার ভেবে এখন অন্তরে বড় স্বস্তি পাচ্ছি

১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫' গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বলেছিলাম –'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিগুলোর সঙ্গে আমার কবিজীবন অনতিক্রম্য ঘটনার আবর্তে কীভাবে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিল–, 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫'-এ আমি সে-কথাই ইতিহাসের আদলে বলবার চেষ্টা করেছি এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি আমার ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে, অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস পাঠকের দাবিপূরণে যদি সক্ষম হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে গণ্য করবো। কবিতার পরিবর্তে, সময় যে আমাকে দিয়ে আমার দেশের ইতিহাস লিখিয়ে নিচ্ছে, এ এক রহস্যজনক ঘটনাই বটে।'

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পলাশী ব্যারাক, ঢাকা

সেই অজানা রহস্যের দুর্বিনীত পালে এবার মনে হচ্ছে পাগলা হাওয়ার দোলা লেগেছে। প্রীতিভাজন ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন যেহেতু নিজেও একজন ইতিহাস সচেতন লেখক, তাই প্রবাস থেকে লেখা তাঁর চিঠিটির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে আমার কাছে। চিঠিটি পড়ে অনেকদিন পর রিটনের সঙ্গে মুখোমুখি

দেখা হওয়ার আনন্দ পেলাম। প্রবাসজীবনের অকহতব্য কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার লেখাটি তুমি যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে পাঠ করছো, এবং তোমার ভালো লাগছে— জেনে আমি অন্তরে প্রচুর আনন্দবোধ করেছি। ধন্যবাদ রিটন। আমার নিজ স্বল্পকালীন প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, দূর দেশে বসে স্বদেশকে যতটা ফিল করা যায়, অনুভব করা যায় -, স্বদেশে বসে ততটা যায় না। হাওয়ার ভিতরে থাকলে হাওয়াকে যেমন হাঁপানিতে যখন আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে তখনই না আমরা বলি 'আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও, ফুসফুসে পাই হাওয়া।' মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই না শিশু তার প্রিয় মাতৃদেহটিকে ধীরে ধীরে চিনতে শুরু করে। মস্তিষ্কের চোরাকুঠুরি থেকে হঠাৎ মুক্তিপাওয়া আমার এই কাব্যকথা তোমার ও তোমার মতো স্পর্শকাতর চিত্তের অধিকারী প্রবাসী বাঙালির স্বদেশবিরহব্যথা প্রশমনে কিছুটা সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

আজকের মতো হাতে হাতে মুঠোফোন থাকলে মহাকবি কালিদাস কি তাঁর 'মেঘদূত' লিখতে পারতেন? অসম্ভব। অবদমিত কামতৃষ্ণা আর অনতিক্রম্য বিরহযন্ত্রণার মধ্যেই তো লুক্কায়িত ছিল মেঘদূতের প্রণয়বিদ্যুত।

'....ইতিহাস বিকৃতির বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে আপনার রচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অতিপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রেফারেন্স বই হিসেবে এই বইটির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে বারবার।'

আমার বর্তমান রচনাটির প্রতি লুৎফর রহমান রিটনের এই সদয়ভাবটি সদয়-নির্দয় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল পাঠকের মধ্যেই সংক্রামিত হোক— এই আমারও একান্ত গোপন প্রার্থনা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর' আমি শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারবো তো? মাঝে মাঝে রণে ভঙ্গ দেবার সাধ জাগে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর কাঁহাতক ভালো লাগে? আত্মঘাতী বাঙালির (নীরদ চৌধুরীর কথা) ইতিহাস রচনা কি সহজ কাজ? বিশেষ করে রিটনের ভাষায়, ...ইতিহাস বিকৃতির এই বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে...?

রিটনের পাশাপাশি, অন্য দুই পত্রলেখক সুইডেন প্রবাসী মুস্তফা জামিল ও ঢাকার কিশোর অম্লানকেও আমার লেখাটি পাঠ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি

প্রতিপক্ষের মাথা ফাটিয়ে দিতে সক্ষম কোনো বিশালাকার গ্রন্থ রচনার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ইতোপূর্বে 'আমার কণ্ঠস্বর' লিখেছিলাম এক বছর ধরে একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায়। ইনারের আট পৃষ্ঠা ও গ্রন্থশেষে যুক্ত আট পৃষ্ঠার নির্ঘণ্টসহ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬। এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বড় কোনো বই রচনার অভিজ্ঞতা আমার নেই তাই অভিজ্ঞতার অভাবহেতু আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা সেই মারকুটে চঞ্চলমতি ব্যাটসম্যানের মতো, ওয়ান ডে

টিমের জন্য লাগসই খেলোয়াড় হলেও টেস্ট ক্রিকেটে যে নিতান্তই বেমানান। টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য লাভের জন্য যা দরকার, তা হল স্কিল ও টেম্পারামেন্ট। পেশেন্স বা ধৈর্য। আর আমার ঠিক ঐ জিনিসটারই বড় অভাব। আমার কবিতার সতর্ক পাঠকরা কি লক্ষ্য করে দেখেননি যে, আমার রচিত সনেট সংখ্যায় খুবই কম। শুধু ভাব হলেই চলে না, সনেট লিখতে গেলে ধৈর্যের দরকার হয়। যারা দেদারসে সনেট লিখতে পারেন, তাব ও বিষয়ের প্রশংসা সর্বদা করতে না পারলেও– তাদের সংযম ও ধৈর্যের প্রশংসা আমি সর্বদাই করি।

একজন ঐতিহাসিক বা ইতিবৃত্তকারের যেসব গুণাবলি থাকা দরকার, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গুণ হচ্ছে ধৈর্য। শুধুই ধৈর্য বললে কম বলা হবে, বলতে হয় অন্তহীন ধৈর্য। ছুটন্ত জীবন্ত সময়কে অভিধানের পাতায় ঘুমিয়ে থাকা শব্দের শিকলে বাঁধা কি এতোই সহজ কাজ? চাই পর্বতগুহাগাত্রে প্রার্থনারত সংসারত্যাগী লামা সন্ন্যাসীদের মতো ধৈর্য, কিংবদন্তী ক্রিকেটার মোহাম্মদ হানিফ বা সুনীল গাভাস্কার বা চার্লস ব্রায়ান লারার মতো ধৈর্য।

ইতিহাস বিষয়ে নিজের ধারণা কইতে গিয়ে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেলো রুশ সাহিত্যিক ও ইতিবৃত্তকার কারামজিনের কথা। ১৯৮২ সালে আমি যখন লেনিনের জন্মস্থান উলিয়ানোভোস্ক ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন ঐ শহরে কারামজিনের একটি চমৎকার ম্যুরাল দেখেছিলাম। আমার ইন্টারপ্রিটার লেনা দোবরাভস্কায়া আমাকে কারামজিন সম্পর্কে তখন কিছু তথ্য দিয়েছিলেন কারামজিন রাশিয়ার ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি যখন দিবারাত্রি পরিশ্রম করে রাশিয়ার ইতিহাস রচনা করছিলেন, তখন রচনার এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তৎকালীন জার তাঁকে চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুত অর্থ কারামজিনের কাছে খুব বিলম্বে পৌঁছায়। কারামজিন তখন মৃত্যুশয্যায় জারের দূত জারের ঐ প্রতিশ্রুত অর্থ নিয়ে কারামজিনের কাছে যেদিন পৌঁছায়, সেদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জারের অর্থ তাঁর কোনো কাজে আসে না। পাথরে খোদাই করা ম্যুরাল চিত্রের মাধ্যমে সেই বেদনাবিধুর ঘটনাটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানে কারামজিনকে দেখা যাচ্ছে তাঁর অন্তিমশয্যায়, মৃত অবস্থায়; আর তাঁর শয্যাপাশে টাকার থলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জারের একজন রাজদূত আমার খুব মায়া হয়েছিল কারামজিনের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত ম্যুরালকর্মটি দেখে।

কারামজিন সম্পর্কে লিখতে বসে অভ্যাসবশত কারামজিন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানার জন্য আমি 'প্রথম আলো' কাগজে কর্মরত সহকারী সম্পাদক জাহিদ রেজা নূরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। জাহিদ রেজা নূর আমাকে কারামজিন সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন নূর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে রুশ

সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করে এসেছেন ফলে তিনি কারামজিন সম্পর্কে আমার ইন্টারপ্রিটির লেনার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। নূর জানালেন যে, কারামজিন শুধু একজন ঐতিহাসিকই নন, তিনি রাশিয়ার একজন বড় মাপের কবিও ছিলেন পুশকিনের আগের খুব উল্লেখযোগ্য কবি তিনি। তাঁর জন্ম ১৭৬৬ এবং মৃত্যু ১৮২৬। কবি হয়েও তিনি শেষ জীবনে রাশিয়ার ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি বারো খণ্ডে রাশিয়ার যে ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন, সেটাই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে অদ্যাবধি গণ্য হয়। কারামজিন যে কবি ছিলেন, জাহিদ রেজা নূরের কাছ থেকে সেই কথাটি জানার পর আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি। যদিও বাংলাদেশের জাতদের কাছ থেকে আমি কখনও কোনো অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশাকে আমার অন্তরে ঠাঁই দিইনি, তবু কবির ইতিহাস চর্চা বলে কথা এটাতো আর কবির কাজ নয়। কিছুটা অনধিকার চর্চাই বটে। ভয় পাচ্ছি, রুশ কবি কারামজিনের জীবনের অন্তিম অধ্যায়টা না আবার আমার বেলায় সত্য হয়ে ওঠে

পাঠক 'শাহানামা'র রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসীর কথাও এখানে স্মরণ করতে পারেন কারামজিনের মতোই বাদশার প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা তাঁর জীবদ্দশায় তিনিও পাননি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বাদশা কবিকে সুবর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা পাঠালে কবি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পর কবি ফেরদৌসী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিশ্রুতিমতো স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বাদশার দূত ফেরদৌসীর বাড়িতে যান, কিন্তু ফেরদৌসী ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে, চলমান বিশ্ববাস্তবতায় আজকালকার কবিদের মুখ্য ও দৃশ্যমান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন তাঁর পাঠকশ্রেণী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারি পাঠাগারের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দে যৎসামান্যসংখ্যক পুস্তক ক্রয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রও কিছুটা।

প্রায় একযুগ আগে 'আমার কণ্ঠস্বর' লিখতে গিয়ে বাংলা একাডেমি সহ ঢাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুরনো পত্রপত্রিকার পাতায় জমা ধুলোর আক্রমণে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেই কথা নতুন করে মনে পড়লো। তাই স্থির করেছি, আমার জীবনী বা বাংলাদেশের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডটি রচনা করতে গিয়ে আমি তত পরিশ্রম আর করবো না যাতে আমি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি তখন আমার কী হবে? আমার বহুকষ্টে অর্জিত কবি পরিচয়টা আমার ইতিবৃত্তকার পরিচয়ের আড়ালে রুশ কবি কারামজিনের মতো ঢাকা পড়ে যাক, সেটাও আমি চাইবো না। সো, আই উইল গো স্লো। ভালো ব্যাটসম্যানরা অফ স্টাম্পের বাইরের লুজ বলও যেমন মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়, আমিও তাই করবো।

তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।'

আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অধিকাংশ সুন্দর ও সূক্ষ্ম অনুভবের মতোই উপরে উদ্ধৃত প্রবাদতুল্য চরণদ্বয়ও অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রবচনই বটে। পাকবাহিনীর ২৫ মার্চের নির্বিচার নরবলিযজ্ঞের পর ২৭ মার্চ যখন দুই ঘন্টার জন্য সান্ধ্য-আইন শিথিল করা হয়, তখন ঢাকার মানুষ যে যে-দিক দিয়ে পারে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমিও ছিলাম তাদেরই একজন। পিঁপড়ের সারির মতো দল বেঁধে বুড়িগঙ্গা নদী পেরুনোর জন্য ধাবমান মানুষের ঐ সন্ত্রস্ত-দৃশ্যটি যারা সেদিন দেখেছেন, যারা নিজেরাই ছিলেন ঐ করুণ দৃশ্যের কুশীলব, তারা কোনোদিনই তা ভুলতে পারবেন না। আমি চোখ বন্ধ করলে এখনও ঐ দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। পরবর্তীকালে দেশত্যাগী শরণার্থীদের ভারতসীমান্তমুখী আরও দীর্ঘ, আরও ভয়াবহ মিছিলের দৃশ্য এসে ঐ ছবিটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু ২৭ মার্চের ঢাকা ছেড়ে পালানো মানুষের মিছিলের দৃশ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল একাত্তরের সেই ট্রাজেডির। এর আগে ঢাকার মানুষ কখনও এভাবে শত্রুর তাড়া খেয়ে তাদের প্রিয় নগরী ছেড়ে দল বেঁধে পালিয়েছে— আমাদের ইতিহাসে তেমন নজির নেই।

'তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?
এইতো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।'

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' তখন (নভেম্বর ১৯৭০) বেরিয়ে গেছে। আমার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লেখার জন্য আমি যখন মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম, তখন পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে ঢাকা ছেড়ে পালানো মানুষের সন্ত্রস্ত মিছিলের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করে, উপরে বর্ণিত পঙক্তি দুটো হঠাৎ করেই আমার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল আমার দুই সঙ্গী বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ ও অনুজপ্রতিম হেলাল হাফিজ (হেলাল তখনও কবিতা লিখতে শুরু করেনি, লিখবো লিখবো বলে ভাব করছে) আমার কবিতার পঙক্তি দু'টি শুনে বললো, বাহ্ বেশ চমৎকার। এই সময়ের জন্য এর চেয়ে সঙ্গত উচ্চারণ আর কিছুই হতে পারে না। নজরুল বললো, কবিতাটা লিখে ফেলো দোস্ত। হেলালও নজরুলের কথায় সায় দিলে কবিতাটি লেখা হয়ে গেলো, মনে মনে। আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'-তে বুড়িগঙ্গার তীরে জন্মগ্রহণ করা ঐ কবিতাটি রয়েছে— নাম 'মুখোমুখি'। পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে আমাদের

নিজেদের নগরী ছেড়ে আমরা সাময়িকভাবে পালাচ্ছি বটে, কিন্তু ঐ পালানোটাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়, পালাতে পালাতে শত্রুর মুখোমুখি ফিরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণাটাই হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের মুখ্য চেতনা বা স্পিরিট ঐ দুটো কাব্যপঙক্তি আমার বুকে জমে ওঠা অপমান ও ক্ষোভের ভার কিছুটা হলেও লাঘব করে বুঝি মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লেখার এইতো শুরু। এতোদিন আমরা যে মুক্ত ভূমন্ডলের স্বপ্ন দেখেছি, সেই দেশমাতৃকাকে শত্রুর দখল থেকে মুক্ত করার এইতো সময়।

ঢাকা তখন আজকের মতো এতো বড় শহর ছিল না বলে নগরীকে ছাপিয়ে উঠতো ধাবমান মানুষের ছবি। নগরীর আকাশ ছোঁয়া দালানকোঠার আড়ালে মানুষ তখন ঢাকা পড়ে যেতো না। ফলে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের লেলিয়ে দেওয়া হায়েনাদের পরবর্তী আক্রমণের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর আশায় ২৭ মার্চের সকালে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অসহায় মানুষের মিছিলের মুখগুলো ছিল ক্ষিপ্ত হিংস্র ক্ষুধার্ত বাঘের তাড়া খাওয়া সন্ত্রস্ত হরিণের মতো বুড়িগঙ্গায় তখন প্রয়োজনের তুলনায় নৌকার সংখ্যা ছিল কম। কে জানতো যে একদিন ঢাকার মানুষকে এইভাবে ঢাকা ছেড়ে নদীর ওপারে পালাতে হবে? তারা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে নদীর ঘাটে। ডুবে যাবার ভয়কে বিবেচনায় না নিয়ে তারা লাফিয়ে উঠবে ছোট ছোট ডিঙি নৌকোর মধ্যে। আমরা তিনবন্ধু ছিলাম ঝাড়া হাত পা। আমাদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা, নারী-শিশু বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছিল না আমরা নদীর ওপারে যাওয়ার ব্যাপারটিতে যতটা সম্ভব শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। যাকে বলে ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করা। লক্ষ্য রেখেছি যাতে অতিরিক্ত যাত্রীর ভারে নৌকা-ডুবিতে সন্ত্রস্ত মানুষের সলিল সমাধি না ঘটে। তাতে কিছুটা লাভ হয়েছিল, অন্তত আমাদের চোখের সামনে কোনো নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ঐ দিন নৌকাডুবিতে ক'জন প্রাণ হারিয়েছিল বলে লোকমুখে শুনেছি. 'ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস' , ঢাকার মানুষের কাছে ঐ কথাটার চেয়ে বড় সংশয়মুক্ত সত্যভাষ্য সেদিন আর কিছুই ছিল না। সেদিন মনে হচ্ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পাকিস্তান, ওপারে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

কান্নাকাটি আর হাহুতাশ সে যতই প্রকাশ করুক না কেন, নিকট প্রিয়জন হারানো মানুষও নিজের বেঁচে থাকার আনন্দকে খুব বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না। বেদনার চেয়ে আনন্দই যে জীবনের বড় সত্য, সেই সত্যকেই সে নানাভাবে, নানারূপে প্রকাশ করে। বুড়িগঙ্গার ওপারে আমরা যে ক'দিন (২৭ মার্চ বিকেল থেকে ২ এপ্রিল বিকেল) কাটিয়েছিলাম, এই গভীরতর জীবনসত্যটাকে আমি প্রতিদিনই নানাভাবে নানারূপে প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলিতে আমরা বাংলাদেশের মানুষকে আরও সহজভাবে এই অলঙ্ঘনীয়

জীবনসত্যের মুখোমুখি হতে দেখেছি। অনেকের জীবন যখন বিপন্ন, তখন পাকসেনাদের কাছ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করার জন্য পলায়নপর পিতামাতা তাদের ক্রন্দনরত শিশুকে গলা টিপে হত্যা করেছে – এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনার কথাও আমরা জানি। হায়রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিপন্ন মানবচিত্রের অনুদঘাটিত কত অবিশ্বাস্য সত্যকেই না প্রকাশ করেছো তুমি। এত সত্য, এত সুন্দর, এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর ছিলে তুমি? জীবন দিয়ে না জানলে এসব অলক্ষুণে কথা জানতোই বা কে, মানতোই বা কে?

নেকরোজবাগে মমর খালাবাড়িতে ঢাকা থেকে যারাই এসে উপস্থিত হচ্ছিল, দেখলাম, তাদের সবার হাতেই কোনো না কোনো অস্ত্র। মনে হচ্ছিল সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য জীবন পণ করে এসেছে। যাকে বলে মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পাতন। সবার চোখেমুখেই বন্দি-দেশমাতৃকাকে পাক সেনাদের দখল থেকে মুক্ত করার প্রত্যয়. মার্চ মাসের শুরু থেকেই পাকসেনারা হচ্ছে হানাদার বা দখলদারবাহিনী বন্দুকের জোরে পূর্ব পাকিস্তান যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ, তাকে পাকিস্তানের অংশ বলে তারা যতই দাবি করুক না কেন, তাদের সেই দাবি মানছেটা কে? পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত পতাকাটি তো ২৩ মার্চের পর থেকেই পাকিস্তানের পূর্ব ভূখন্ড থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। সর্বত্রই পতপত করে উড়েছে বাংলাদেশের নতুন পতাকা। পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত সাদা-সবুজ পতাকাটি উড়েছে শুধু ঢাকার সেনানিবাসে, পিলখানায় আর প্রেসিডেন্ট হাউসে। পাকিস্তানের সর্বশেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে না হটানো পর্যন্ত চলবে আমাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ. বঙ্গবন্ধু নিজে বন্দি হলে কী হবে, তাঁর নির্দেশেই শুরু হয়ে গেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মেজর শফিউল্লাহ, মেজর ওসমানের নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিকরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ২৬ মার্চের অনেক আগেই। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করে দেশবাসীকে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন মেজর জিয়াউর রহমান।

যদিও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার অপেক্ষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘরে বসে ছিল না কেউ, তবু চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারিত হতে শুনে গলায় এলএমজি ঝোলানো উজ্জীবিত খসরুও ঘোষণা করে দিলো, বুড়িগঙ্গা নদী পথ ধরে পাকসেনারা একবার এখানে এসেই দেখুক না?

ভাবটা এমন যেন দেশপ্রেম, একটি এলএমজি আর কিছু সংখ্যক থ্রি নট থ্রি দিয়েই তারা পাকসেনাদের সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত করবে. তাদের মুখে মুখে আকাশ কাঁপানো জয়বাংলার রণধ্বনি। সবার চোখে মুখে একটা যুদ্ধংদেহী ভাব। ঐ

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদী চাঁদের আলো পড়ে সেই তরঙ্গিত নদীর জল অজানা আশংকায় কাঁপছে।

ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গার এপারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল মালেক উকিল, মনসুর আলী, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, শেখ মণি, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ। পাক সেনাবাহিনীর এই সংবাদ অজানা থাকার কথা নয়। তারা এখানে যে কোনো সময় আমাদের স্বাধীন বাংলায় আক্রমণ চালাতে পারে। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। জীবনে কখনও কোনো আগ্নেয়াস্ত্রে হাত দেইনি হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আমরা তা চালাতে পারবো বলে মনে হয় না। নজরুল ও হেলাল– দু'জনই বললো, এখানে থাকাটা আমাদের মতো নিরস্ত্রদের জন্য নিরাপদ নয়। এখানে থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণ দিতে হতে পারে তার চেয়ে চলো অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। ইকবাল হলে আমার বুকে খসরুর পিস্তল চেপে ধরার তিক্ত ঘটনাটিও আমাকে ভাবিত করে আমরা তিনজন সকাল হওয়ার আগেই আধো আলো ও আধো অন্ধকারে নেকরোজবাগ ছেড়ে শুভড্যার পথে পা বাড়াই। ঐ গ্রামে মহসীন নামে আমার একজন পরিচিত বন্ধু ছিল সে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির গণসংযোগ বিভাগে কাজ করতো। খুব দিলদরিয়া ও বন্ধুপ্রিয় মানুষ। হেলালও মহসীনকে চিনতো। মহসীনকে খুঁজে বের করতে পারলে সে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দেবে। আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানের কথা খুব মনে পড়ে বন্ধু মহাদেবের কথা মনে পড়ে। ওরা এখন কোথায় কেমন আছে– আমরা কিছুই জানি না।

নেকরোজবাগ ছেড়ে শুভাড্যায়

> 'বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক না কেন, মনের মধ্যে তাহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মনুষ্যের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানব চরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।'
>
> (স্বাদেশিকতা : জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমরবাদী পাকিস্তানের বিকারগ্রস্ত রাজনীতির 'অসুবিধাকর বীরত্বের' বিরুদ্ধে বাঙালির অবদমিত 'সুবিধাকর' বীরধর্মের অনিবার্য বিরোধ। রবীন্দ্র-জীবনস্মৃতিতে সেই বিরোধের অন্তর্নিহিত সত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাঠ করে আমি এতোই মুগ্ধ বোধ করেছি যে, তা আমার বর্তমান রচনার পাঠকদের গোচরে আনার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। শুধু লোভই বা বলছি কেন, মনে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবনে পাঠককে সহায়তা করাটা ইতিবৃত্তকার হিসেবে আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিশ্বস্ত শিক্ষক, এমন বিশ্ববিহারী জ্ঞানযোগী আর কে হতে পারেন? মার্কসবাদী পন্ডিত, আমার প্রিয় শিক্ষক যতীন সরকারকেও তো দেখেছি প্রায়শ তাঁরই শরণ নিতে।

'হিন্দুমেলা'র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক উপলব্ধি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের সময়কার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের জন্য যতটা সত্য ছিল; তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পর, ১৯৭১ সালেও তা

ঠিক ততটাই, বা তার চেয়েও অনেক বেশি সত্য হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের বেলায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল রবীন্দ্রবর্ণিত বীরধর্মের অনিবার্য দ্বন্দ্বের প্রকাশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকাররকামী বাঙালির ব্যত্র-জাগরণকে তাঁর নিজের ভিতর থেকে জাগা ন্যায়সঙ্গত বীরধর্মের প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা না করে, তাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' বলে অপপ্রচার চালিয়ে পাকিস্তান শুধু যে আমাদের বীরধর্মের প্রতিই অবিচার করেছিল তা নয়, শেষ বিচারে, নিজেদের কৃতকর্মের ভিতর দিয়ে তারা নিজেদেরই অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বেশি

রবীন্দ্ররচনা যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ব্যাখ্যায় এতটাই প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবনস্মৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি বুঝতে পেরে আমার খুব আনন্দ হল। বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তার সর্বকালের সেরা নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের বীরোচিত উত্থানকে তাই আকস্মিক নয়, মানবপ্রকৃতি বিচারে অনিবার্য বলেই মনে হয় মনে হয়, পাকিস্তানের অবদমনমূলক আচরণের কারণে যে বাঙালিরা তাদের বীরধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরছিল,— সেই পাথরচাপা অবস্থার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেই আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ইপিআর, বাঙালি পুলিশ ও বাঙালি সেনাসদস্যদের অংশগ্রহণ তাই কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, ছিল বাঙালির অবদমিত বীরধর্মের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সুযোগ থাকার পরও যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই মিছিলে সামিল হয়নি, বীরধর্মচ্যুত হয়ে তারা ইতিহাসের গৌরব থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

> 'কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের ওপর, তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।'
>
> '... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ.. । এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা '

পদব্রজে অজানা অচেনা গ্রামের পথে চলতে চলতে, ক্ষুধায়, রাতে ভালো ঘুমাতে না পারার দোষে যখন ক্লান্ত দেহকে আর বইতে পারতাম না, নতুন করে

দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য তখন কখনও জোর গলায়, কখনওবা মনে-মনে আবৃত্তি করতাম বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের প্রায় মুখস্থ হয়ে যাওয়া বজ্রকণ্ঠভাষণ, কখনও বা আমাদের বুকের ভিতর থেকে গুনগুনিয়ে উঠতো রবীন্দ্র-নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্তর কবিতা বা কোনো জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানের চরণ

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান-
লেখা আছে অশ্রুজলে ।'

এই গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরী। এই জনপ্রিয় প্রাণছোঁয়া গানটির রচয়িতা কে, তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, এর রচয়িতা নিশ্চয়ই বিখ্যাত কোনো কবি হবেন। কিন্তু গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরীর মতো অখ্যাত একজন কেউ, জেনে খুবই বিস্মিত হয়েছি। তবে এই গানের সুরকার ও গায়ক বিখ্যাতই বটে। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মান্না দে'র শিক্ষাগুরু ও আপন খুল্লতাত। তিনিই গানটিকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

(সংস্কৃতিঃ জাতীয় মুক্তি মাহবুব উল আলম চৌধুরী)

আমি ঢাকা থেকে বেরোবার সময় সঙ্গে করে সঙ্গোপনে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি ঝোলায় পুরে নিয়েছিলাম। সদ্য-প্রকাশিতই বলা যায়, আমার কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে ১৯৭০ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে, আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মার্চের শেষ সপ্তাহে। সময় বিচারে আমার কাব্যগ্রন্থটি তখন মাত্র চার মাসে পা রেখেছে। তার সারা গায়ে তখনও নববধূর মধু গন্ধ। নববধূর মতোই আমি তাকে আমার চলার পথের সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও যতটা সম্ভব চোখে-চোখে, বুকে-বুকে, হাতে-হাতে রাখি। মাঝে মাঝে ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বইটিকে আলতো আঙুলে স্পর্শ করি। মনে হয় আবেগ থরথর প্রথম পরশ কুমারীর। কখনও বা আমার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে আপন প্রতিকৃতি সম্বলিত বইয়ের রুদ্র-প্রচ্ছদটি চকিতে দেখে নিই। আমার ভাবতে খুব ভালো লাগে, পূর্ব পাকিস্তানের শেষ ও বাংলাদেশের প্রথম কবিতার বই এটি। খুব সম্ভবত এর পর বাংলাবাজার থেকে আর কোনো কবির কোনো কবিতার বই বেরোয়নি। তাই আবেগের আতিশয্যে রবীন্দ্র-নজরুলের পাশাপাশি নিজের কবিতা থেকেও দু'একটা পঙক্তি যে কখনও আওড়াই নি, এমন কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। সময় পেলে, হয়তো কোনো চায়ের স্টলে বসেছি চা খেতে, তখন ঝোলায় ঘুমিয়ে পড়া বইটির ঘুম ভাঙিয়ে, তার পাতা উল্টিয়ে পাঠও করেছি কোনো কোনো কবিতার কিছু প্রিয় ছত্র।

'পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে...'

পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয়সন্ধানে ছুটে চলা মানুষের অনিঃশেষ মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমি যেন আমার স্বপ্নের 'মুক্ত ভূমণ্ডল' বা বাংলাদেশকে স্পষ্ট দেখতে পাই। বুঝি বইটির অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নামকরণ আমাদের অজস্র প্রিয়জনের রক্তদানের ভিতর দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মুক্তির জন্য আমাদের আরও কত প্রিয়জনকে যে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হবে, কে জানে? পঁচিশে মার্চ তো শেষ নয়, মনে হয় এ হচ্ছে এক দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের শুরু। আমাদের জয়ের ভিতর দিয়েই যে এই যুদ্ধের শেষ হবে, সে ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু এই যুদ্ধে আরও কত মানুষের প্রাণবলি যাবে, কতদিন লাগবে হানাদার পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে— সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার বারবার ভিয়েতনামের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল আমার নিজের লেখা একটি দীর্ঘ কবিতায় ব্যবহৃত একটি চিত্রকল্প 'দখিনপূর্ব এশিয়াবাসীর বিস্ফোরণ'।

নেকরোজবাগ থেকে মন্টু, খসরু, আফতাব, মধু ও বাবলাসহ কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি ভেবে আমার মনের ভিতরে যে অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছিল, আমার নিজের লেখা কবিতা পড়ে সেই অপরাধবোধ থেকে আমার মনের জট খুলে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি—, অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু কলম হাতে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবো। যুদ্ধের মাঠে অসির চেয়ে মসি বড় না হলেও, মসিরও যে একটা জোর আছে, তার প্রয়োজনও আছে— সেকথাটাও আমি বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাই।

শুভাড্যা গ্রামে পৌঁছে পথের পাশের একটি চায়ের স্টলে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম আর চায়ের স্টলে ঐ এলাকার মানুষজনের মধ্যে যারা বসেছিল, তাদের কাছে খোঁজ করছিলাম আমাদের বন্ধু মহসীনকে তারা কেউ চেনে কি না? দেখলাম অনেকেই মহসীনকে খুব ভালো করে চেনে। এলাকায় মহসীন বেশ জনপ্রিয়। চায়ের স্টলের মালিক, তরুণবয়সী ছেলেটি বললো, আপনারা এখানে বসেন, মহসীন ভাই এখানে আসবেন। তিনি আমার চায়ের স্টলে বসেই আড্ডা দেন। শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি মহসীন এসে ঐ চায়ের স্টলে হাজির। দীর্ঘদিন পর মহসীনকে কাছে পেয়ে আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা যে পাকবাহিনীর ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গেছি, এটিই ছিল মহসীনের জন্য পরম আনন্দের বিষয় তাই তাকে আমাদের কিছুই বুঝিয়ে বলতে হল না। নিজে থেকেই মহসীন বললো, 'পাকসেনাদের তাড়া না খেলে আপনারা কি আমাদের মতো গন্ড গ্রামে কখনও আসতেন? আপনাদের কোথাও যেতে হবে না, এখানেই আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিব। জাম গাছের তলায় এই যে মনোহারী দোকান ঘরটা দেখছেন, এটি আমার এক আত্মীয়ের, এখানেই আপনারা থাকবেন। পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে এখানে সহজে আসবে বলে মনে হয় না।'

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

'নিঠুর গরজি, তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাঁর তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, ভরসা দণ্ড,
তোর কী হবে উপায়?'

(মদন বাউল রচিত একটি গানের অংশ)

'দণ্ড' শব্দটার অনেকগুলি অর্থের মধ্যে একটা যে সৈন্য, তা আমার জানা ছিল না। অভিধান দেখে আজই তা জানলাম এবং জেনে মনে প্রচণ্ড আনন্দ পেলাম। পদকর্তার বিরচিত গানের কথার মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ নবজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেলো। এই আশ্চর্য দর্শনসমৃদ্ধ গানটির সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়েছিলেন আমার স্কুলজীবনের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে আমার সাহিত্যজীবনের অঘোষিত গুরু বা সাঁই (আমি তো কবি হিসেবে কিছুটা বাউল-ঘরানারও বটে), মনস্বী মার্কসবাদী লেখক শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার।

তাঁর রচিত আত্মকথা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' পাঠ করার পর, আমি অদ্য সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সুস্থ-মস্তিকে, কারও প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবিত বা কারো ভয়ে ভীত না হয়ে তাঁকে এই বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করেছি।

> জানি, প্রায় হাজার বছর আগে, বাংলার বৌদ্ধধর্ম প্রচারক পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের নামের সঙ্গে শ্রীজ্ঞান পদবীটি যুক্ত হয়েছিল অতীশের পিতৃদত্ত নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বছর বয়সে দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নতুন নাম হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পরে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হলে তিনি 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিও লাভ করেছিলেন
>
> (তথ্য - বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান)

সেই থেকে প্রায় হাজার বছর পর, আজ আমি যখন যতীন সরকারের মতো একজন মানবতাবাদী কমিউনিস্ট লেখককে শ্রীজ্ঞান উপাধিতে ভূষিত করছি, তখন আমি মনে করি তাতে ধর্মগুরু শ্রীজ্ঞান অতীশের এতটুকু অবমূল্যায়ন হয়নি, একজন যথার্থ যোগ্যপাত্রের সঙ্গে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধিটি পুনর্যুক্ত হওয়ায় বরং অতীশ দীপঙ্করেরই পুনর্জন্ম হয়েছে।

অন্য কেউ তাঁর জ্ঞানের অধীন কি না, জানি না– কিন্তু আমি জানি, আমি আকৈশোর তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি, সর্বধর্মসমন্বয়বাদী অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জ্ঞানের অধীন। তাই তাঁর সম্পর্কে আমার এবম্বিধ বিবেচনার মধ্যে অতিভক্তির প্রাবল্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমার পাঠককে এব্যাপারে আমি শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত করতে পারি যে, তাতে কোনো চোরের লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান চুরি করার বাসনা আমার পূর্বেও বিলক্ষণ ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকারের লেখা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটিকে 'প্রথম আলো' পত্রিকা যখন ১৪১১ সালে রচিত সেরা-গ্রন্থের পুরস্কার দিয়েছিল, শেরাটনে অনুষ্ঠিত সেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সুধীজনদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তখন পর্যন্ত আমার স্কুলজীবনের প্রিয় শিক্ষক রচিত ঐ বইটি আমি পড়িনি ভেবেছিলাম, এটা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আদর্শ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক, প্রাক্তন কমরেড মতিউর রহমানের 'সূক্ষ্ম কারসাজি'। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আদর্শের পতাকাটিকে বজ্রমুঠিতে ধরে রাখা যতীন সরকারকে পুরস্কৃত করে তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধবোধের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম আলো বছরের সেরা গ্রন্থ নির্বাচনে কী নীতিমালা অনুসরণ করে, প্রতি বছর প্রকাশিত সহস্র বইয়ের ভিতর থেকে কীভাবে বছরের সেরা গ্রন্থটিকে নির্বাচন করা হয়, আমি জানি না। কবে থেকে এই পুরস্কারটি চালু হয়েছে, তাও সঠিক জানি না। পুরস্কার বিষয়টা, সারা বিশ্বেই সন্দেহযুক্ত। নোবেল পুরস্কারও তার আওতামুক্ত নয়। উন্নতবিশ্বেরই যখন এই অবস্থা, তখন পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সন্দেহের পরিমাণটা দুর্নীতিদক্ষ বাংলাদেশে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে ধরে নেওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাকে বিপদ সীমার নিচে নামিয়ে আনাটা খুবই কঠিন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যারাই রাষ্ট্রক্ষমতার হাল ধরেন, তারাই তাদের প্রিয়জনদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন, জেনারেল জিয়ার আমলে স্বাধীনতা-বিরোধী শর্ষিনার পীরের স্বাধীনতা পদক পাওয়ার ঘটনাটির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বিগত জোট সরকারের আমলে বহু দুর্বল লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বাংলা একাডেমী ও একুশে পদক বা স্বাধীনতা পদক বাগিয়ে নিতে আমরা দেখেছি। স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে আমার নিজের একুশে পদক পাওয়ার ঘটনাটির কথাও। মন্ত্রিপরিষদের সভায় আমার নাম প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হয়নি– শেখ হাসিনা একুশে পদক প্রাপকের তালিকায় নিজের হাতে আমার নাম লিখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বলে শুনেছি।

আমি আচমকা বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলাম ১৯৮২ সালে। তখন আমার বয়স মাত্র ৩৭ বছর। বাংলা একাডেমীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পাওয়ার কথা আমি তখন ভাবতেও পারিনি। পরের বছর থেকে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের অর্থমূল্য যখন পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজারে উন্নীত করা হয়, তখন আমি আমার আচমকা পুরস্কার লাভের কারণ কিছুটা অনুমান করতে পারি। বুঝতে পারি, এ ছিল আমার শত্রুপক্ষের এক বুদ্ধিদীপ্ত ষড়যন্ত্র। কিন্তু ঐ পুরস্কার পাওয়ার কারণে আমার লাভ হয়েছিল অন্যভাবে, পুরস্কার প্রাপক হিসেবে আমি বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হই, তাতে আমি অর্ধেক মূল্যে বাংলা একাডেমীর বই কিনতে পারি আর পরবর্তী বছর থেকে আমি বাংলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশের যোগ্য লেখকদের নাম প্রস্তাব করার অধিকারও অর্জন করি। সুযোগ পেয়েই আমি বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদানের জন্য আমার শিক্ষাগুরু শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার ও আমার সাহিত্যগুরু খালেকদাদ চৌধুরীকে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য মনোনীত করি আমার মনে হয়, আমি উদ্যোগ না নিলে মফস্বলবাসী এই নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিকদের পক্ষে বাংলা একাডেমীর দেয়াল টপকানো সহজ হবে না। কিছুটা লবিংও করি। শেষে মনীষী কবীর চৌধুরী ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক মরহুম আবু জাফর শামসুদ্দীনের যৌথ উদ্যোগের কারণে, অশিতিপর প্রবীণ সাহিত্যিক, নেত্রকোণায় নিভৃতে বসবাসকারী খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছিলেন তাতে আমার মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। কিন্তু শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার পূর্বের মতোই আমার অন্তরে গোপন-অস্বস্তির কারণ হয়ে অদ্যাবধি থেকে গেছেন। যদিও তাঁর নিজের রচিত সাহিত্যকর্মের জন্য কোনোপ্রকার পুরস্কারের আশা বা লোভ তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র রয়েছে বলে আমার কখনও মনে হয়নি 'কর্মৈব অধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন' তত্ত্বে বিশ্বাসী সদাহাস্যময় মানুষ তিনি। তাঁর লেখা পাঠ করার সংবাদেই তিনি অন্তরে প্রীত হন। আর তাঁর লেখাকে সত্য বলে মানলে তো কথাই নেই। ওটাকেই তিনি তাঁর লেখক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে ভাবেন। তা পুরস্কার নিয়ে তিনি নিজে যাই ভাবুন না কেন, ছাত্র হিসেবে আমার শিক্ষাগুরুর প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। যোগ্য হওয়ার পরও বাংলা একাডেমী পুরস্কার না পাওয়ার জন্য তিনি যে অশান্তি বোধ করেন না, সেটা তাঁর মহত্ত্ব, কিন্তু এটা তো আমার স্বস্তির কারণ হতে পারে না। নিজেকে অস্বস্তির ভার থেকে মুক্ত করার জন্যই আমি গোপনে তাঁকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি এই মার্কসবাদী পণ্ডিতকে বাংলা একাডেমীর পিচ্ছিল পুলসিরাতের পুলটি পার করাতে ব্যর্থ হই। এসব কথা তাঁর জানবার কথা নয়। তিনিও আমার পাঠকের সঙ্গে এ-তথ্যটি জানবেন। তাঁর

সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করি, আর মনে-মনে বলি, আপাতত আমার প্রণাম নিয়েই তুষ্ট থাকেন স্যার। এবারও হল না। এভাবেই চলছিল। ড. এনামুল হক স্বর্ণপদক, খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার, মনিরুদ্দীন ইউসুফ সাহিত্য পুরস্কার, নারায়ণগঞ্জের স্মৃতি স্বর্ণপদক ও ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব সাহিত্য পুরস্কারের মতো ছোটো ছোটো পুরস্কারগুলোই তাঁর ভাগ্যে জুটবে বলে আমি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম, তখন একটি বর্ষসেরা গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি যখন প্রথম আলো প্রবর্তিত অত্যন্ত সম্মানজনক ও কিছুটা মোটা অংকের অর্থযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত হন, তখন আমি একইসঙ্গে খুব অবাক ও খুশি হই। স্বীকার করি, তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে কমরেড মতিউর রহমান দীর্ঘদিন পর একটি খুব ভালো কাজ করেছেন।

পুরস্কৃত গ্রন্থটি আগে আমার পড়া হয়নি। পুরস্কার প্রদান-অনুষ্ঠানের দিন শেরাটনে বইটি হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেছিলাম মাত্র। ঐ বইটিতে যে বেশ কয়েক স্থানে আমার কথাও আছে, তা আমার স্যারও আমাকে বলেননি, আমিও কখনও খুঁজে দেখিনি। সম্প্রতি, সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় ১৯৭১ সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখতে বসে, আমি তাঁর গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করি। সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার বই। দীর্ঘ রচনা পাঠের শক্তি ও ধৈর্য আমার নেই। আমার হচ্ছে ছোটো গরুর স্বভাব। পথ চলতে চলতে খাই। আমি খুব অস্থিরচিত্ত। বড় বই আমার চোখের বালি। একবার কিছুদিন জন্ডিসের কারণে আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। তখন আমি সময় কাটাতে দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিসমেন্ট' বইটি পড়েছিলাম। ওটাই আমার পড়ে শেষ করা সারাজীবনের সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। তারপর দীর্ঘ বিরতি শেষে আমি আবার একটি চোখের বালি পড়তে শুরু করেছি 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটি আমি যতই পড়ছি, রচয়িতার প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে আমার চিত্ত অবনত হচ্ছে। প্রতিটি অধ্যায়পাঠ শেষে আমার জ্ঞানভাণ্ড সমৃদ্ধ হচ্ছে।

আমার নিজের লেখা আত্মজীবনী নিয়ে আমার মনে একটা গোপন গর্ববোধ ছিল কলকাতার দেশ পত্রিকা 'আমার কণ্ঠস্বর'-এর ওপর একটি দীর্ঘ আলোচনা ছেপে (প্রায় ৬ পৃষ্ঠা) আমাকে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে ইতিহাসবিদ শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন:

> 'বহু দিক থেকেই নির্মলেন্দু গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর' অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশোর লেখা 'স্বীকারোক্তি' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সাথে তুলনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বেলিত, কিন্তু প্রবৃত্তির নাগপাশে জর্জরিত। এ-গ্রন্থ মানবিক অস্তিত্বে এমন এক বহুমাত্রিক প্রকাশ, যা একাধারে নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী।'
>
> (দেশ, ৪ নভেম্বর ১৯৯৫)

আলোচক সুরজিৎ দাশগুপ্তই শুধু নন, দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ও মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ও আমার আত্মজীবনীমূলক রচনাটির জন্য তখন সাক্ষাতে আমাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সাগরময় ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, সুরজিৎ-এর আলোচনাটি পড়ার পর, ওর কাছ থেকে নিয়ে তোমার বইটি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। এরকম আগ্রহ নিয়ে বহুদিন কোনো বই আমি পড়িনি। সুরজিৎ আরও বড় আলোচনা করেছিল, আমি তো ওর লেখা পুরোটা ছাপিনি। পাকিস্তানের ভিতর থেকে বাংলাদেশের হয়ে ওঠাটা বোঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। দীর্ঘ আলোচনার জন্য তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অন্নদাশঙ্কর স্মরণ করেছিলেন কর্মসূত্রে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা মোহনগঞ্জ এলাকায় তাঁর ভ্রমণের স্মৃতি।

এখন সেই সাগরময় ঘোষ বা অন্নদাশঙ্কর— দু'জনের কেউই বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে আমি কলকাতায় গিয়ে তাঁদের দু'জনের হাতে শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার বিরচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন' বইটি তুলে দিয়ে বলতাম, 'আমার কণ্ঠস্বর' নয়, বাংলাদেশকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য যে বইটি অনেক বেশি সহায়ক; অনেক বেশি তথ্য দ্বারা সমর্থিত এবং আলোচ্য প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক মার্কসবাদী ও পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষিত— সেটি হল এটি। 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কালজয়ী দলিল মাত্র নয়, নয় শুধু ঘনিষ্ঠভাবে ইতিহাসসংলগ্ন একটি আত্মজীবনীমাত্র— এটি বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ ও মিলনের এক রসঘন গাথাকাব্য বা এপিক ব্যালাড। সাবহেডিং বা অধ্যায়ের আল দিয়ে গ্রন্থটিকে খণ্ডিত না করলে পাঠক একটি মহাজীবনের উপাখ্যান পাঠের আনন্দ লাভ করতেন বলেই আমার মনে হয়। অবশ্য ছোটো ছোটো অধ্যায়ে বিভক্ত বলে খুব দীর্ঘ রচনাও পাঠক পছন্দমতো পড়ে নিতে পারেন। সাইটেশন বা সংক্ষেপে বইটি সম্পর্কে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে .. 'জাতির জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরম্পরার বিবরণ ও বিশ্লেষণ একদিকে যেমন উপন্যাস পাঠের মোহনীয়তা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পাঠকের ভাবনাকে অনবরত জাগ্রত রাখে। পাঠক শুধু একজন রুচিশীল যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির পরিচয় নয়, একই সঙ্গে পাকিস্তানের জন্মপূর্বকাল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক সময়ের পরিচয় ও তাৎপর্য-সমন্বিত উচ্চমানের সাহিত্যকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেন।'

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ-এ ১৯৯৪ এর আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ভেবে কিছুটা বিস্মিতই হচ্ছি যে, আমি 'আমার

কণ্ঠস্বর' গ্রন্থটিও রচনা করেছিলাম প্রায় একই সময়ে, ১৯৯৪ সালে। প্রায় এক বছর ধরে আমার লেখাটিও ধারাবাহিকভাবে বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাকাল নির্বাচনে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের মিলটিকে আমি কিছুটা বিস্ময়কর ও কাকতালীয় বলেই মনে করছি। দীর্ঘদিন পর, এবার একই পত্রিকায় আমরা দু'জন লিখতে বসেছি আমাদের নিজ নিজ অতিক্রান্ত জীবনের কথা তুলনায় সময়বিচারে এগিয়ে রয়েছেন শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার ১৯৯৪ সালে আমি যখন ১৯৬২ ১৯৭০ পর্যন্ত সময়খণ্ড নিয়ে লিখেছিলাম, তখন শ্রীজ্ঞান লিখেছিলেন তাঁর জন্মসাল ১৯৩৬ থেকে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়খণ্ডকে নিয়ে। এবার আমি যখন ১৯৭১ নিয়ে লিখতে শুরু করেছি, তখন —পাকিস্তানের ভূতদর্শন, এই শিরোনামে ১৯৭২ সাল থেকে তিনি শুরু করেছেন তাঁর লেখা এটি হবে তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড , আমার বেলায় তৃতীয়। গুরু-শিষ্যের দ্বৈতরাগিণী নিয়ে ইতোমধ্যেই একজন রসিক পাঠক আমাদের শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়ে একটি পত্র লিখেছেন।

শুরুতে উদ্ধৃত মদন বাউলের গানটি, আমার চঞ্চলচিত্তকে কিছুটা হলেও শান্ত করতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক ক্রিজ আগলে রেখে সে কতক্ষণ শান্ত হয়ে ব্যাট চালাতে পারে। আপাতত পুরনো বটবৃক্ষের মতো অজস্র শিকড়-বন্ধনে মাটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই।

ইতিহাস কী লিখব মাগো

ইতিহাস কী লিখবো মাগো আমি তো আর সব জানি না
এই যে মহাকালের খেরোখাতায়, রাজার কথা লিখছে প্রজায়—
আমি সে ইতিহাস মানি না
তোর মাঝে মা অনন্তকাল ফেলেছে মনমোহিনীজাল।
সবাই যে-জাল ছিঁড়তে জানে, সময় কি আর সে জাল টানে?
আমিও সেই জাল টানি না।

তোর প্রেমের ঐ সিংহাসনে সবাই কি আর বসতে জানে?
কাব্যেসাহিত্যেগানে আমি যমের বুকে বজ্র হানি,
কমের বুকে শেল হানি না
কালের ইতিহাসের পাতা সবাইকে কি দেন বিধাতা?
আমি লিখি সত্য যা তা, রাজার ভয়ে গীত ভানি না।

(রামপ্রসাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক-১ : ও বন্ধু আমার: ১৯৭৫)

আমার 'ও বন্ধু আমার' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের অন্তিম মাস, ডিসেম্বরে। বইটির প্রকাশক ছিল মুক্তধারা ঐ বছরটি সবচেয়ে বেদনাবহ ও শোকের বছর হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে আছে। 'ও বন্ধু আমার' কথাটা আমাদের জানা অধিকাংশ ভালো ও সুন্দর কথার মতোই, রবীন্দ্রনাথের। ঐ বছরে আমরা আমাদের অনেক গুণী-প্রিয়জনকে হারিয়েছি ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় নিহত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান। তার আগে ৫ আগস্ট মারা যান কবি সিকানদার আবু জাফর। ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লবে নিহত হন খালেদ মোশাররফসহ বেশ ক'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ২৬ নভেম্বর মারা যান আমার প্রিয় বন্ধু তরুণ কবি আবুল হাসান। তাঁদের সবার স্মরণে আমি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে আমার কাব্যগ্রন্থের নামটি চয়ন করি— ও বন্ধু আমার। ঐ নামের ভিতরে বঙ্গবন্ধু ও আবুল হাসান একাকার হয়ে মিশে যায়। আমি নিজেই গ্রন্থের প্রচ্ছদটি আঁকি। কালো রঙের মধ্যে রিভার্সে একটি পাখির মুখ। পাখির মুখের সঙ্গে মিশিয়ে দিই মানুষের মুখের আদল। পাখির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কাঁচা হাতের আঁকা হলেও ঐ প্রচ্ছদটি আমার বেশ লাগে মনে হয় আমাদের ঐ সময়ের সকল প্রকাশিত-অপ্রকাশিত শোক কিছুটা ভাষা পায় আমার ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলোতে ও

কিছুটা গ্রন্থের প্রচ্ছদে। তখন এর বেশি স্পষ্ট করে কিছু বলা বা করাটা সম্ভব ছিল না। আমাকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি, আমাদের রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার ভিতর দিয়ে আমাদের ললাটে যে কলংককালিমা লেপন করা হয়, যুগ যুগ ধরে আমরা সেই কলংকতিলক আমাদের কপালে বহন করবো; ভারতের জনগণ যেমন বহন করে তাদের রাষ্ট্রপিতা গান্ধী হত্যার কলংকতিলক। আমেরিকানরা যেমন তাদের ললাটে বহন করে চলেছে আব্রাহাম লিঙ্কন হত্যার কলংকতিলক। আমাদের কপাল থেকে সেই কলংকচিহ্ন মুছবার যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, আমরা পারবো না। অন্যরা পারলেও আমরা কোনোদিনই পারবো না এজন্য যে, নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা বিচারে ঐ হত্যাকাণ্ডের চেয়ে মর্মঘাতী প্রতিহিংসাবিদ্ধ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এই পৃথিবীতে আর একটিও ঘটেনি এই হত্যাকাণ্ডের মমতাহীনতার সঙ্গে তুলনীয় কোনো ঘটনা পৃথিবীর আদিকাব্য রামায়ণ বা মহাভারতসহ অন্য কোনো কালজয়ী কাব্যেও আমরা দেখতে পাই না। 'আত্মঘাতী বাঙালি' লিখেছিলেন কিশোরগঞ্জজাতক হয়েও বিশিষ্ট ইংরেজী-সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্ব-বিবেচিত নীরদ সি চৌধুরী তাঁর গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৭৫-এর আগে। তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে আর উপায় কী? জাতি হিসেবে বাঙালির পারঙ্গমতা যে মানবিকতার বদলে নিষ্ঠুর দানবিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল, —এ সত্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য চির বেদনার, চির লজ্জার

সবুজ বৃক্ষরাজি, নদীনালা-খালবিল ও অজস্র সুগন্ধি ফুলের ভিতরে বেড়ে ওঠা, নরম পলিমাটি দিয়ে গড়া একটি সমতল দেশের মানুষদের পক্ষে কীভাবে এমন অবিশ্বাস্যরকমের নিষ্ঠুর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানো সেদিন সম্ভব হয়েছিল, ভেবে বিশ্বের মানুষ চিরদিন আতকে উঠবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পাশাপাশি সেই কাল রাতে হত্যাকারীরা কেন মুজিব-পরিবারের রক্তধারায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গর্ভবতী নারী, প্রায় দুগ্ধপোষ্য শিশু-কিশোরকেও হত্যা করেছিল— আমরা হয়তো বা কোনোদিন সেই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাবো না। যদি না ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে কেউ কনফেশনাল স্টেটমেন্ট করে আমাদের তা জানতে সাহায্য করেন।

ঐ ঘটনা ঘটানোর পর থেকেই, ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কুশীলব বা পরবর্তীকালের সুফলভোগকারীরা খুব সঙ্গতকারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকে বিকৃত করার লক্ষে তাদের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম শুরু করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পাশাপাশি ইতিহাস দখলের সেই যাত্রাশুরুর পর্বটা আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার

হয়ে কিছুদিন প্রবল ভীতির ভিতরে কাটানোর কারণে দেখতে বাধ্য হয়েছি। মানসিকভাবে অত্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলাম। আমাদের গ্রামের নদীতীরস্থ শ্মশানঘাটে ছিল ব্রজেন সাধুর আশ্রম। শান্তি-সন্ধানে আমি সেই আশ্রমে যেতাম। বসতাম গান শুনতাম। ব্রজেন সাধু খুব ভালো রামপ্রসাদী গাইতেন স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন এক নির্জন দুপুরে ঐ আশ্রমে বসেই আমি রামপ্রসাদী সুরে বেঁধেছিলাম উপরের উদ্ধৃত গানটি। গানটি লিখে আমি মনে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইতিহাস কখনও আমার রচনার বিষয় হবে, সচেতনভাবে তখনও পর্যন্ত আমি তা ভাবিনি। ভেবেছি কবিতা দিয়ে শুরু করা আমার জীবন কবিতা দিয়েই শেষ হবে। ইতিহাস আমার বিষয় হতে যাবে কোন দুঃখে? আমি কি ইতিহাসবিদ বা ইতিবৃত্তকার নাকি? আমার ইতিহাসচর্চা সীমাবদ্ধ থাকবে আমার কবিতায়। হয়তো কখনও ইতিহাসনির্ভর কাব্য লিখবো, নির্ভেজাল ইতিহাস লিখতে বসবো, এমনটি আমি ভাবিনি। কিন্তু আমি না ভাবলে কী হবে, যার ভাববার কথা তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার শাস্তি। তা না হলে ইতিহাসের জালে আমি নিজেকে জড়াতে যাবো কেন?

আজ 'আত্মকথা ১৯৭১'-এর ২৯তম পর্বটি লিখতে বসে, হঠাৎ করেই কেন জানি নিজের লেখা ঐ গানটির কথা মনে পড়ে গেলো। অনেক বছর পর আজ আবার নতুন করে কবিতাটি পড়লাম। সুর করা যখন হয়নি, যখন কারও কণ্ঠে গীতও হয়নি, এমনকি আমার অসুরকণ্ঠেও না, তখন আর তাকে গানই বা বলি কেন, কবিতাই বলি। বত্রিশ বছর আগের লেখা কবিতাটিকে যে আমার নতুন পর্ব শুরু করার ভণিতা হিসেবে বেশ লাগসই বলে মনে হল, তা নয়, আমার বিবেচনায় কবিতাটিকে খুব প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ বলেও মনে হল। বিশ্বজননী হিসেবে কালীমাতার গৌরবগাথা প্রচারের জন্য কালীভক্ত কবি হিসেবে রামপ্রসাদ যে ভক্তিবাদী লোকসুর সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের গৌরবরক্ষার জন্য সেই জনপ্রিয় সুরটিকে আমি কিছুটা নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম বলেই আমার প্রত্যয় হল। রামপ্রসাদের সুরে বর্ণিত হলেও অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমার কবিতায় স্থান করে নিয়েছিল ভক্তির বদলে অশুভশক্তির অষ্টোপাসবন্ধন থেকে মুক্তির আকুলতা, ইতিহাস-বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও বিষোদগার ঐ কবিতার ভিতর দিয়ে দেয়ালের পাশে মিটমিট করে জ্বলা মাটির প্রদীপের মতোই আমি সেদিন দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম, সাবধান হও, সতর্ক হও, মুক্তিযুদ্ধের স্থপতিকে সপরিবারে হত্যা করার পর, এবার শুরু হবে মেঘনাদবধ কাব্য বা ইতিহাসবধ পালা। 'হি হু কিলস দি কিং মেরিজ দি কুইন' —ঐ গ্রীক-প্রবাদের মতোই এটি ছিল পূর্ব নির্ধারিত ও অনিবার্য। যারা ইতিহাসের নায়ককে

হত্যা করে, নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা ইতিহাসকে বিকৃত না করে পারে না। সুতরাং নবাগত রাজার কথায় ইতিহাস লেখার জন্য স্বাধীনতা বিরোধী বুদ্ধিজীবী প্রজাবৃন্দ যে মুক্তিশূন্য শূন্য মাঠে গোল দিতে নামবেন, সে আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আমার কণ্ঠ থেকে মূর্ত হয়েছিল, 'এই যে মহাকালের ধ্বজায়/ রাজার কথা লিখছে প্রজায়/ আমি সে ইতিহাস মানি না।' মানি না যখন, তখন ধরে নিতে পারি যে, বাংলাদেশের ইতিহাসটা আমি জানি বলেই মানি না

আমার লেখা ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমার পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হতে দেখলে আমি বেশ আনন্দ পাই। আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পালিত অবদানের কথা আমি সযত্নে আমার রচনায় অন্তর্ভুক্ত করি। আমি জানি, অনুল্লেখিত, অনুচ্চারিত অজস্র উজ্জ্বল চরিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের দেশের এখানে সেখানে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাদের মহামূল্যবান জীবন দান করেও আমাদের ইতিহাসের পাতায় যাঁরা তাঁদের নাম লেখাতে পারেননি, আমি ভালোবেসেই তাদের কথা লিখি। লিখবো।

সম্প্রতি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী, আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থা জাহানারা নিশির কলাবাগানের বাসায় একটি গানের আসরে অনেকদিন পর দেখা হল লায়লা বখশের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেও আমার সতীর্থা ছিল ছিল শেখ হাসিনার খুব নিকটজন। ওরা দু'জনই তখন ছাত্রলীগ করতো, ছাত্রলীগের নেত্রী আমি ওদের দল করতাম না বলে ওরা আমাকে খুব একটা পাত্তা দিতো না। আমি আসলে কোনো দলই করতাম না, কিন্তু ওরা ভাবতো আমি ছাত্র ইউনিয়ন করি। আর ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা ভাবতো আমি ছাত্র লীগ। তাই কিছুটা হাসিনা-কাজী রোজী-লায়লা-সালমা-কণা ঘেঁষা। আসলে কোনো দল ঘেঁষা নয়, আমি ছিলাম মেয়ে ঘেঁষা। কিন্তু অতটা বোঝার ক্ষমতা বিধাতা বোধহয় কোনো অজ্ঞাতকারণে মেয়েদের দেননি। তাই আমি চিরদিন উনাদের ভুল বোঝার শিকার হয়েছি।

আমি যে ইতিহাস লিখছি লায়লা তা জানে। মাঝে মাঝে পড়েও। আমাকে মুখের কাছে পেয়ে বললো, 'তুমি খসরু মন্টুর কথা লিখলা, আর পুরান ঢাকার রুচিরা গ্রুপের কথা ভুইল্যা গেলা? ষাট দশকের আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ওদের ভূমিকা কি এদের চেয়ে এতোই কম ছিল? এনাহী মারা গেলো, তুমি একবার কোন কইরাও খবর নিলা না। আউয়াল তোমারে খবর দিছে তারপরও তুমি সময় পাইলা না।'

তখন আমার মনে পড়লো এবং ওর হাত ধরে বললাম মাফ করে দাও, লায়লা ভুলে গিয়েছিলাম আমি না আজকাল সত্যি সত্যি ভুলে যাই। তার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় না।

আইয়ুব মোনায়েম খানের পোষা গুন্ডা পাঁচপাত্তু-খোকাদের হাত থেকে নতুন ঢাকা সামলাতো খসরু-মন্টু আর পুরনো ঢাকা সামাল দিতো লক্ষীবাজারের রুচিরা গ্রুপ। রুচিরা নামে পকিস্তান পর্যটন কেন্দ্রের একটি সুন্দর রেস্তোরা ছিল। ঐ রেস্তোরার পেছনে ছিল একটি জিমনিসিয়াম। ঐ রেস্তোরা ও জিমনিসিয়ামটিকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠেছিল একটা তারুণ্যের আড্ডা। কেউ কেউ অন্য দল করলেও ওদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ছাত্রলীগের ত্রাসজাগানো ক্যাডার পার্শ্ববর্তী জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজসহ পুরনো ঢাকার সব শিক্ষালয়েই ছিল রুচিরা গ্রুপের দাপট। এদের কারণে এনএসএফ নওয়াবপুর রেল ক্রসিং পার হয়ে কোনোদিন পুরনো ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। রুচিরা গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে মুখ্য ছিল এই এলাহী - এলাহী বখশ। এলাহী বখশ ছিল পার্শ্ববর্তী কায়দে আজম কলেজের জিএস ও পরে ভিপি ছাত্র ছাত্রী মহলে জনপ্রিয়। রুচিরা গ্রুপে আর যারা ছিল, তারা হল ক্যান্টোমাস, হাশেম, তারুণ, রাশেদ, আমান, গাজী, ইব্রাহিম, সুলতান, লম্বা কাশেম, বশির প্রমুখ। এলাহীর বাসা ছিল রুচিরার পেছনে। ৫৮ নবদ্বীপবসাক লেন। পার্টির জন্য প্রচুর খরচ করতো নিজের পকেট থেকে। এলাহী পড়তো জগন্নাথে, কিন্তু আড্ডা মারতে প্রায়ই ছুটে আসতো নীলক্ষেতে। কলাভবনে। পরে জেনেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা নয়, এলাহীর ছিল আরও এক দফা। সেই এক দফা মানে লায়লা শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে লায়লার সঙ্গে এলাহীর দফারফা হয় বিবাহের মাধ্যমে।

প্রিয় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে রেখে গত ২৯ মার্চ এলাহী মারা যায়। ওদের পুত্র কন্যারা সবাই থাকে বিদেশে। স্বামীর বাড়ি ও দীর্ঘদিনের জমানো স্মৃতির পাহাড় বুকে আগলে নিয়ে লায়লা এখন একা।

একাত্তরের দশ মাস

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার রচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটি সম্পর্কে পূর্বে আমি একটি অধ্যায় লিখেছি। ঐ বইটি বলা যায়, এখন আমার নিত্যপাঠ্য। আত্মজীবনীর আদলে রচিত শ্রীজ্ঞানের গ্রন্থটি আমার 'আত্মকথা ১৯৭১' রচনায় খুবই সহায়ক হয়েছে। আমি যে সময় নিয়ে লিখছি, তিনি সেই সময় নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। অবস্থানগত কারণে আমার একাত্তরের অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর একাত্তরের অর্জিত অভিজ্ঞতার পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি মিলও আছে অনেক। আমাদের গুরু-শিষ্যের মধ্যকার অনতিক্রম্য জন্মসূত্রটি আমাদের জীবনকে কতকগুলো অভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। সে কারণে 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটি আমার জন্য আরও বিশেষ ভাবে সহায়ক হচ্ছে। আমি ঐ গ্রন্থটি থেকে হয়তো খুব বেশি উপাত্ত বা তথ্য আমার রচনায় ব্যবহার করছি না, কিন্তু মহাসমুদ্রে পথ হারানো নাবিককে সমুদ্র তীরবর্তী বাতিঘর যেভাবে সাহায্য করে, আমার মুক্তিযুদ্ধের সমুদ্রযাত্রায় ঐ গ্রন্থটি সেইরূপ বাতিঘরের মতোই আমাকে সাহায্য করে চলেছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে একটি দেশের মানুষ হয়তো অনেক অভিন্ন অভিজ্ঞতাই অর্জন করে, কিন্তু সেটি হচ্ছে ঘটনার উপরি-স্তরের আলেখ্য, তার ভিতর স্তরে থাকে যোজন যোজন পার্থক্য। অভিন্ন ঘটনার মধ্যেও মানুষের আচরণে প্রচুর ভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাই দেখা যায়, কেউ হয়তো তার বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে, আবার কেউ নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বন্ধুকে নিধন করেছে সেই কারণেই প্রতিটি আত্মজৈবনিক রচনাই বাইরে থেকে একরকম বলে মনে হলেও ভিতর থেকে সে বিচিত্ররূপে আলাদা। আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যে আমরা অতিক্রান্ত সময়ের ইতিহাসটা যত অবিকৃতভাবে পাই, ইতিহাস-গ্রন্থে অনেকসময়ই সেভাবে পাই না মনে হয় সেই বিবেচনা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর আত্মজৈবনিক রচনার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মরহুম চার্চিলকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, বাংলাদেশের কোনো লেখক যদি কখনও নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পান তবে তিনি তা পাবেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ আত্মজীবনীমূলক কোনো রচনার জন্য সেক্ষেত্রে শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার রচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটিকে আমি এগিয়ে রাখবো। চার্চিল রচিত গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থটি আকারে ছোটো হলেও প্রকারে, বিষয়গুরুত্বে, বর্ণনানৈপুণ্যে বা ভাষাশৈলী বিচারে মোটেও ঊণ নয়; বরং ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থে উপন্যাস পাঠের আনন্দরসে সমৃদ্ধ 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' আরও বেশি হৃদয়সংবেদী।

আজ আমি মুক্তিযুদ্ধের বাতিঘরতুল্য আরও একটি সুসম্পাদিত গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। বইটির নাম 'একাত্তরের দশ মাস'। বইটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। মোট পৃষ্ঠা ৮০০। প্রকাশক কাকলী প্রকাশনী। প্রকাশকাল ১৯৯৭-র একুশের বইমেলা। যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চান, বা ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বা ঐসব ঘটনার অভিঘাত থেকে জন্ম নেওয়া তাদের নিজ-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা দিন ক্ষণ সহযোগে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে চান তাদের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক দলিল-গ্রন্থ হচ্ছে এটি। এটি মুক্তিযুদ্ধের দশ মাসের একটি নির্ভরযোগ্য দিনপঞ্জি। সেখানে একাত্তরের ১ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত দশ মাসের প্রতিটি দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল-পত্র'-র ভূমিকায় বলা হয়েছে — 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী 'একাত্তরের দশ মাস' বলতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে বোঝাননি। তিনি পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্ত-বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়কে তাঁর বিপুলাকার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর ফলে বছর বা মাস-বিচারে না হলেও সর্বমোট দিনের হিসেবে গ্রন্থের নামকরণের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের নাটকীয় আনন্দ ও স্বস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনে ত্রিবেদী তাঁর পাঠকদের এই ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, বনবাস থেকে রামের প্রত্যাবর্তনপর্বটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রামায়ণ সম্পন্ন হয় না। গ্রন্থটিকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রলম্বিত করে ত্রিবেদী 'একাত্তর সাল' কথাটার একটা নতুন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও দাঁড় করালেন আমাদের সামনে। তিনি যেন বলতে চাইছেন যে, আমাদের জীবনে এই একাত্তর কথাটার একটা ভিন্ন অর্থ আছে আমাদের এই একাত্তর খ্রিষ্টবর্ষের সেই একাত্তর নয় তারও বেশি কিছু। আলাদা কিছু। এটা হচ্ছে সেই মাতৃগর্ভকাল, যার ভিতর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী আমার বন্ধু, তিনি আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের কেউ নন। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন একজন আমলা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত

মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের জনসংযোগ কর্মকর্তা। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির ওএসডি হিসেবে তিনি তখন শরণার্থী ও যুব প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির দেখভাল করার গুরুদায়িত্বও পালন করেছিলেন। তখনই মুজিবনগরে রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং সে-পরিচয় ক্রমশ বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে কিছুদিন আগে তিনি অবসর নিয়েছেন।

তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক কারণেই ত্রিবেদী আমার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে বইটির অন্যতম মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে আমার নিরলস পরিশ্রমের জন্য গ্রন্থকার আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার সঙ্গত কারণ আছে। আমার ক্ষণস্থায়ী (১৯৮৭ ১৯৯২) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজিমপুর সুপার মার্কেটস্থ শতাব্দী কম্পিউটারে তাঁর বইটির অনেকখানি কম্পোজ হয়েছিল। আমার অনুজ নীহারেন্দু গুপ চৌধুরীই প্রধানত কম্পোজের কাজটা করতো আসল মুদ্রাক্ষরিক ছিল সেই। ত্রিবেদীর ভূমিকায় নীহারেন্দুর কথাও আছে। আমার দায়িত্ব ছিল প্রুফ দেখা। সেটা ১৯৯০ সালের কথা ঐ বইয়ের কাজ করতে গিয়ে বাংলা ইংরেজীর মিশেল আর টিকা টিপ্পনির অত্যাচারে আমাদের দুই ভাইয়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ভাগ্যিস ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বীরদর্পে লড়াই করে আমি জামানত হারিয়ে সগৌরবে পরাজিত হয়েছিলাম। তাই ত্রিবেদীর গ্রন্থের পুরো কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই আমার প্রতিষ্ঠানটি লাল বাতি জ্বালায়। আমার ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির অকাল মৃত্যু ঘটে। ফলে ঐ গ্রন্থের বাকি অংশ অন্যত্র (গতিধারা প্রকাশনী) কম্পোজ করা হয় এবং দীর্ঘ বিরতিতে শেষে কাকলী প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের বইমেলায়। স্বীকার করতেই হবে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর ধৈর্য তুলনাহীন। শ্রীশ্রীভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

ভবিষ্যতে কখনও তাঁর ঐ গ্রন্থটি আমার কাজে লাগবে, এমনটি তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে আমার কাজে না লাগলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্ধানী সত্যানিষ্ঠ পাঠক ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাদের যে খুব কাজে লাগবে, মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে আমার জন্য বিরক্তিকর হলেও তাঁর এই কষ্টরচিত গ্রন্থটি যে তাঁকে অমরত্ব দেবে, সেকথা তখন আমিই তাঁকে বলেছিলাম। ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে আমার ভবিষ্যতবাণী অনেকটাই ফলেছে ১৯৭১-এর ধারাবাহিক স্মৃতিবৃত্ত রচনা করতে বসে আমি বারবার হাত বাড়াচ্ছি ঐ গ্রন্থটির দিকে। ঐ গ্রন্থটি আমার হাতের কাছে না থাকলে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের ১৪ খণ্ড দলিলসমুদ্র আমাকে হাতড়ে বেড়াতে হতো। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী শেষ পর্যন্ত অন্য

কাউকে না হলেও আমাকে অন্তত সেই অভাবিত পণ্ডশ্রমের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা আমার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থটি দশ মাসে বিভক্ত। প্রতিটি মাসের জন্য একটি করে শিরোনাম রাখা হয়েছে গ্রন্থটিতে। ঐ শিরোনামগুলো গৃহীত হয়েছে বাংলাভাষার কালোত্তীর্ণ কবিতা ও গানের চরণ থেকে। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আমাকে সে মুদ্রাক্ষরিকের মর্যাদা দিলেও, শিরোনাম নির্বাচনে সে আমার কবিত্বের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তাকে আমি বন্ধুকৃত্যের নিদর্শন হিসেবেই গ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে দশ মাস গ্রন্থে আমার জন্য বরাদ্দকৃত মাসটি হচ্ছে অক্টোবর মাস। ঐ মাসের শিরোনামে ব্যবহৃত আমার কাব্য পঙক্তিটি হচ্ছে– 'মানুষের মৃত হাড়ে সে এখন সশস্ত্র সন্ত্রাস...'

এই কাব্য-পঙক্তিটি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'র অন্তর্গত 'মুখোমুখি' কবিতায় আছে। পাঠকের খেয়াল থাকতে পারে যে ২৭ মার্চের দ্বিপ্রহরে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পালিয়ে যাবার সময় ঐ কবিতার প্রথম দুটি লাইন আমার মনে এসেছিল

'তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।'

পাকসেনাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে ঢাকা ছেড়ে নদীর ওপারে পালিয়ে যাওয়া ভয়ার্ত মানুষের মিছিলে দাঁড়িয়ে পাওয়া কবিতাটি নদীর ওপারে, শুভাড্যায় থাকাকালে ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল তারিখের মধ্যে কোনো একসময় আমি লিখে শেষ করেছিলাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে রচিত আমার প্রথম কবিতা ছিল এটি। দ্বিতীয় কবিতা 'আগ্নেয়াস্ত্র'। সেই কবিতা রচনার পটভূমি আমি পরে বলবো। তার আগে বলবো পাকসেনাবাহিনীর 'জিঞ্জিরা অপারেশন' সম্পর্কে।

জিঞ্জিরা জেনোসাইড

আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে লুকিয়ে রাখা পাকসেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত একটি নির্মম ও অবিশ্বাস্য গণহত্যার প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখতে বসেছি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরা, কালিন্দি ও শুভাড্যা— এই তিন ইউনিয়নব্যাপী রোমহর্ষক গণহত্যাটি সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল, শুক্রবার। সূর্য ওঠার কিছু আগে, ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করে দুপুর বারোটা পর্যন্ত পরিচালিত ঐ বর্বর অভিযানে সেদিন কত প্রাণ ঝরেছিল, তার সঠিক হিসাব কোনোদিনই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। তবে আমার নিজের ধারণা, কম করেও এক হাজার নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশু কিশোর ঐ অভিযানে সেদিন নিহত হয়েছিল। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ২৫ মার্চের পর প্রাণ বাঁচাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অসহায় মানুষ। পরমকরুণাময় মহান স্রষ্টার অসীম করুণায় আমি সেদিন পাকসেনাদের নির্বিচার নিধনযজ্ঞের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম।

পবিত্র ইসলামের বিশ্বস্ত খাদেম, পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ও প্রফেশনাল সেনাবাহিনী ঢাকা নগরীতে তাদের 'অপারেশন সার্চ লাইট' অভিযান শুরু করেছিল পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে, অন্ধকারে পাছে পাকসেনাদের কাপুরুষ ও নৈশশিকারি বলে বাঙালিরা ভ্রম করে; বিশ্বের সামরিক-ইতিহাসে পাছে তাদের পৌরুষের ওজন হ্রাস পায়, শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, নির্বিচার গণহত্যায় তারা যে দিনের আলোতেও সমান দক্ষ, মনে হয় এইটে প্রমাণ করার জন্যই 'জিঞ্জিরা অপারেশন'-টির শুভসূচনা করা হয়েছিল কাকডাকা ভোরে, দিনের শুরুতে। ঐ দুটো গণহত্যাই শুক্রবারকে সামনে নিয়ে কেন শুরু করা হয়েছিল আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে এরকম— শুক্রবার নিয়ে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন, পাকিস্তানীদের যুক্তি এরকম ছিল— যাহা পাকিস্তান তাহাই ইসলাম। ইসলাম রক্ষা করার জন্যই তো পাকিস্তানের শত্রুদের অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের মিলিটারি অপারেশন চালাতে হচ্ছে। এটি ধর্মরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করারই সামিল। এই পবিত্র কর্মটি তো পবিত্র দিনেই করা উচিত। সুতরাং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর যুক্তি ঠিকই আছে। তারা কোনো অন্যায়ও করেনি, ভুলও করেনি। তাদের আরও একটি যুক্তি ছিল। সেই যুক্তিটির কথা আমরা

অনেকেই ভালো জানি [illegible] মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকসেনাদের যখন গোপনে পাঠানো হচ্ছিল, তখন পাক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের এমন ধারণা দিয়েছিল যে, যাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে কাফের বা মালাউন বিধর্মী। তারা পবিত্র ইসলাম ও অখণ্ড পাকিস্তানের শত্রু ভারতের চর সুতরাং মাথামোটা পাকসেনারা তাদের বসদের কথা বিশ্বাস করে ধরেই নিয়েছিল যে, তাদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের শিকার সাচ্চা মুসলমানরা খুব বেশি একটা হবে না, হবে ঐ কাফের মোনাফেক হিন্দুরাই। কাফের নিধনের জন্য শুক্রবারের চেয়ে ভালো দিন আর কোথায়?

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে আমার বুকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা পাকসেনাবাহিনীর সেই বর্বর-গণনিধনের কাহিনীটি আমি আমার আত্মকথায় বিলম্বে হলেও এখন লিপিবদ্ধ করতে পারছি। ২৫ মার্চের গণহত্যার ভয়াল বিভিষীকার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা আপারেশনের ক্ষতচিহ্নটির ওপর খুব আলো ফেলা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। হলে ঐ গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে এতো হিমশিম খেতে হতো না। অনেকের লেখাতেই আমি তার নিদর্শন পেতে পারতাম। আমাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল-পত্রের অষ্টম খণ্ডের দুই পৃষ্ঠা ফটোস্ট্যাট করে আনতে হতো না।

আমার তো মনে হয় পঁচিশে মার্চ আমরা যেমন ছোটো আকারে (একুশে টিভির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক সায়মন ড্রিং যার প্রবর্তক) হলেও পালন করি, ২ এপ্রিল তারিখটিকে 'জিঞ্জিরা ডে' হিসেবে আমাদের তেমনি প্রতিবছর পালন করা উচিত। সাত ঘণ্টা স্থায়ী (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে অবশ্য সকাল পাঁচটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত অর্থাৎ নয় ঘণ্টার কথা বলা হয়েছে) মিলিটারি অপারেশনে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের গ্রামগুলিতে সেদিন যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য সেখানে একটি স্মৃতিফলকও নির্মাণ করা দরকার মার্কিন সেনাদের বর্বরতার নিদর্শন ভিয়েতনামের মাইলাই জেনোসাইডের কথা আমরা জানি, বিশ্ববাসীও জানে— কিন্তু জিঞ্জিরা গণহত্যার কথা বিশ্ববাসী দূরে থাক, আমরা নিজেরাও খুব ভালো করে জানি না। আমাদের মায়েদের গর্ভভূমি খুব উর্বর বলে আমাদের কাছে জীবনের মূল্য কি এতোই তুচ্ছ? এতেই কম?

মহান স্রষ্টার প্রতি আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণতি, ইতোমধ্যে কোটি-কোটি প্রাণের বিলুপ্তি ঘটালেও, তিনি আমাকে আজও তাঁর সুন্দর পৃথিবীতে সহিসালামতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মনে হয় আমার জন্য তাঁর করুণার কোনো শেষ নেই। হে মহান দয়ালু প্রভু, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে সালাম।

প্রস্তাবনার সমাপ্তিশেষে, পাঠক আসুন, এবার আমরা আমার সেই শুভাড্যায় ফিরে যাই।

শুভাড্যা একটা বিরাট বড় গ্রাম। এতো বড় গ্রাম পৃথিবীতে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। ঐ গ্রামটি পাঁচ-ভাগে বিভক্ত। উত্তর শুভাড্যা, দক্ষিণ শুভাড্যা, পূর্ব শুভাড্যা, পশ্চিম শুভাড্যা ও মধ্য শুভাড্যা। শুভাড্যা গ্রাম ও তার আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছে কেরানীগঞ্জ থানার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, শুভাড্যা ইউনিয়ন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় ঐ ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি। প্রচুর হিন্দুর বাস ছিল সেখানে। মোস্তফা মহসীন মন্টুর মতে তখন শুভাড্যা ছিল একটা হিন্দুপ্রধান এলাকা। আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি নেকরোজবাগ থেকে সরে এসে আমরা যে একটি হিন্দুপ্রধান গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি, সেই বিষয়টা শুরুতে আমাদের জানা ছিল না জানলাম কয়েকদিন সেখানে বাস করার পর। দেখলাম পথে-ঘাটে প্রচুর হিন্দুর চলাচল। মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে গোল টিপ, হাতে সাদা ধবধবে শঙ্খের শাঁখা, পুরুষদের পরনে কোচামারা ধুতি। গলায় রুদ্রাক্ষের কণ্ঠিমালা। সান্ধ্য আজানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজছে হিন্দুমেয়েদের উলুধ্বনি আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। দুই প্রবল ধর্মের ঐরূপ শান্তিময় সহাবস্থান পূর্ব পাকিস্তানে খুব সহজদৃষ্ট নয়। দেখলাম ঢাকার শাঁখারিপট্টি, বাংলাবাজার, লক্ষ্মীবাজার ও সূত্রাপুর অঞ্চল থেকে দল বেঁধে পালিয়ে আসা হিন্দুরা তো রয়েছেই, ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা অনেক মুসলমানও আশ্রয় নিয়েছে ঐ সব হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে মনে হল বর্বর পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কেমন যেন একটা অভাবিত সখ্যভাব গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঐ সখ্যভাবটা কতদূর স্থায়ী হবে, পাকসেনারা যখন হিন্দুদের পৃথকভাবে হত্যা করতে শুরু করবে, যখন ইংরেজদের মতো তারা অনুসরণ করবে ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি, তখনও কি এই সখ্যভাবটা বজায় থাকবে? এ নিয়ে আমার মনের ভিতরে সংশয় দেখা দিলো। ভাবলাম আরও ভিতরের দিকে চলে গেলে ভালো হয়। কিন্তু তখন আর আমাদের পক্ষে অন্যত্র সরে যাবার সময় ছিল না। সরে যাবার বাস্তব প্রয়োজন তখনও পর্যন্ত হয়তো ছিলও না, কিন্তু আমার মন বলছিল, জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়। আমার মনে হচ্ছিল, পাকসেনারা তাদের অপারেশনের শুরুতে নির্বিচার বাঙালি নিধনে মত্ত হলেও, অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) হিন্দুরা তাদের বিশেষ টার্গেট হবেই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান রণক্ষেত্রে তার পাকিস্তানত্ব প্রমাণ না করে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিকল্পিত পথেই অগ্রসর হবে হতে বাধ্য।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ মুজিবের প্রতি সংখ্যালঘু হিন্দুদের এককাট্টা অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি হাড়েমজ্জায় হিন্দুবিদ্বেষী পাকসেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মতো কোনো অস্পষ্ট বিষয় ছিল না। তাই মুজিবানুসারী সংখ্যাগুরুদের মধ্যে মিশে থাকলেও একটি আলাদা ভীতিবোধ আমাকে ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছিল। পিঁপড়ে যেমন আসন্ন প্লাবনের আগাম আভাস পায়, আমিও তেমনি একটি বিপদের আভাস পাচ্ছিলাম। কিন্তু শুভাড্যায় থাকার মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যাওয়ার ফলে সেটা ছেড়ে দিয়ে আবার অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে মন চাইছিল না। পাকসেনারা সহসাই বুড়িগঙ্গা নদী পাড়ি দিয়ে এখানে এসে আক্রমণ চালাবে, চালাতে পারে-- এমন ধারণাও আমরা তখন করিনি। ফলে আমরা যেখানে আশ্রয় পেয়েছি, সেখানেই থেকে যেতে থাকি।

ঐ জায়গাটার ওপর আমাদের মনের মধ্যে কিছু মায়াও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন আমার নিজ গ্রামই। আমরা পথের পাশের যে দোকান ঘরটিতে থাকতাম, সেই দোকান ঘরের ছবিটা আজও আমার কল্পনার মধ্যে কিছুটা রয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করলে আমি আজও সেই দোকান ঘরটা দেখতে পাই ভালো আঁকিয়ে হলে আমার পক্ষে সেই ঘরটির একটা ছবি হয়তো আঁকা সম্ভব হতো। দোকান ঘরটার পাশেই ছিল একটা বিরাট জাম গাছ নিজে বিরাট বলে তার শাখা প্রশাখাও ছিল বিরাট ও বিস্তর। অজস্র সবুজ পত্রপল্লব বিশিষ্ট ঐ জামগাছটা তার চারপাশের এলাকাটাকে শীতল ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিল। চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে শরীর জুড়িয়ে নিতে সেই গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতো পথিকদল। গাছের নিচের চায়ের স্টলটিতে দিনরাত চলতো রাজা-উজির মারা রাজনৈতিক আড্ডা। আমার গ্রামের বাড়িতে ঠিক এরকমই একটা বিরাট জামগাছ আছে। প্রতিটি জামের মৌসুমে আমার শৈশবে আমি ঐ জামগাছের জাম খেয়ে, পাকা জামের মধুর রসে আমার মুখ বহুদিন রঙিন করেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি ঐ ফলভারনত জামগাছের ডালে ডালে, শাখা-প্রশাখায়। ঐ জাম গাছটির নিচে বসলেই আমার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়তো মনে পড়তো আমার বাবা মা, ভাইবোনদের কথা। কতদিন তাদের কোনো খবর রাখি না। তারা জানেও না আমি আদৌ বেঁচে আছি, না পাকসেনাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছি। আমার পরিবারের প্রিয়জনরা যে তখনও বেঁচে আছে, তা আমি অনুমান করতে পারছিলাম, কেননা পাকসেনারা তখনও পর্যন্ত বড় শহরগুলি দখলে নিয়ে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু আমার সম্পর্কে তাদের দুর্ভাবনার সঙ্গত কারণ ছিল। কথায় বলে দুঃসংবাদ দাবানলের মতো দ্রুত ছড়ায়। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তাতে যে কয়েক হাজার নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ গেছে, আমার কর্মস্থল 'দি পিপল' পত্রিকার অফিসটি যে

ডিনামাইট দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— ভারতের আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে সেইসব সংবাদ সারা বিশ্বে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ গণহত্যার সংবাদ শোনার পর আমাকে নিয়ে তাদের তো চিন্তিত হওয়ারই কথা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আমার গ্রামে ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোনোভাবে আমার বেঁচে থাকার অবিশ্বাস্য শুভসংবাদটি তাদের কাছে যদি পৌঁছানো যেতো। কিন্তু সেই দুর্ভাবনার হাত থেকে আমার পরিবারকে মুক্ত করার কোনো উপায়ই তখন ছিল না। পোস্ট অফিসগুলি ছিল বন্ধ। ঢাকা শহর সারা দেশ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ট্রেন চলছে না। বাস চলছে না পাকদানবদের ভয়ে পথের পাশে ও গ্যারেজে মুখ থুবড়ে পড়েছে যন্ত্রযানদানব। মানুষের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যচালিত রিকশা, ভ্যান আর ঠেলাগাড়ি। সত্তরের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের হুংকারপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে চুপসে দিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের জন্য পাকিস্তানের বিশ্বসেরা সেনাবাহিনী শেখ মুজিব ও তার অনুসারীদের এমন মার দিয়েছে, যে তারা এখন আক্ষরিকঅর্থেই ফিরে গেছে পায়ে হেঁটে পথ চলার সেই আদিম প্রস্তর যুগে। মৃত্দানবের অপশাসনের চাকা যখন সচল হয়, শান্তিকামী গণমানবের চাকা তখন কি আর অচল না হয়ে পারে? অজানা ভবিষ্যতের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে আমরা আমাদের দিনরাত্রিগুলি পাড়ি দিচ্ছিলাম। আমাদের জীবন থেকে দিন-রাত্রির পার্থক্য তখন অনেকটাই ঘুচে গিয়েছিল

আমাদের সময় কাটতো সংবাদের সন্ধানে ঐ দোকানের একটি ছোট্ট ওয়ান ব্যান্ড রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে। আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ৩০ মার্চ দুপুরের পর থেকে আমরা যখন আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কোথাও খুঁজে পেলাম না, তখন আমাদের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেলো। আমাদের আনন্দ উধাও। কোথায় কোনো বৈরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো আমাদের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি? না জানি কী ঘটেছে তার ভাগ্যে! গত ক'দিনে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রটি হয়ে উঠেছিল আমাদের সকল আশা ভরসার স্থল। অন্ধের যষ্ঠি। তখন তো আর আমরা জানতাম না যে, ৩০ মার্চ দ্বিপ্রহরে ২টা ১০ মিনিটে পাক-বোমারুবিমান থেকে ১০টি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ কিলোওয়াট প্রচার শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারটি বোমার আঘাতে অকেজো হয়ে গেলে, পরদিন ৩১ মার্চ ১ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার নিকটবর্তী পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় ও পরে সেটি নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিপ্লবী কলাকুশলীরা ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় চলে যান

'স্বাধীন বাংলা বেতার' কেন্দ্রটি আমাদের হাত ছাড়া হওয়ার পর আকাশবাণী কলকাতা আমাদের অবলম্বনে পরিণত হয়। আকাশবাণীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমরা দিনরাত খবর শুনি। সেখান থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে, জিঞ্জিরা-কলাতিয়া হয়ে দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা জনাব তাজউদ্দীন আহমদ কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে নিরাপদে প্রবেশ করেছেন। ঐ আকাশবাণীর সংবাদেই আমরা জানতে পারি যে, ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক আনীত ঐ প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হয় :

> The House records .ts profound conviction that historic upsurge of the 75 millon of people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the who.chearted sympathy and support of the people of India.

পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদীপথে টহল দিচ্ছে বলে সন্ধ্যায় লোকমুখে খবর পেয়ে মনের ভিতরে যে ভয়টা জেগেছিল, রাতে দেবদুলালের জনপ্রিয় সুরেলা কণ্ঠে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত ঐ আনন্দ-সংবাদটি শুনে আমাদের আর খুশির অন্ত থাকে না। আমাদের ভয় কিছুটা কেটে যায়। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবে বাংলাদেশ নামটি ব্যবহার করা না হলেও, পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে ইস্ট বেঙ্গল নাম ব্যবহার করাটাকেই আমরা তখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে ভাবতে শুরু করি। তাজউদ্দীনসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিভিন্ন সীমান্ত পথে ভারতে পৌঁছেছেন এবং ভারতীয় পার্লামেন্টে আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে— এই দু'টি খবর জানার কারণে অনেকদিন পর রাতে আমাদের খুব ভালো ঘুম হয়। এমন আনন্দে মানুষের সুন্দর স্বপ্ন দেখারই কথা। কিন্তু আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না।

ভোর পাঁচটার দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে দরোজায় সজোরে কড়া নাড়ার শব্দে। মসজিদ থেকে তখন সবে আজানের ধ্বনি ভেসে আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ কড়া নাড়ার কর্কশ শব্দে আমরা তিনজন প্রায় একইসঙ্গে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি দরোজা খুলতে দেরী হচ্ছে দেখে রফিক (আমাদের আশ্রয়দানকারীর পুত্র, পরম শ্রদ্ধাভরে যে আমাদের দেখভাল করতো) দরোজার ফাঁক দিয়ে চাপাস্বরে ফিসফিস করে বলে, 'আপনারা তাড়াতাড়ি পালান, তাড়াতাড়ি . দেরী করবেন না.. আর্মি আসছে... ।'

দরোজা খুলতে না খুলতেই আমাদের জাগিয়ে দিয়ে শ্রীমান রফিক উধাও। আমরা রফিকের নাম ধরে ডাকি। কিন্তু সাড়া পাই না। বাতাসে কান পেতে আমি হঠাৎ নিদ্রা ভাঙা মানুষের চাপা গোঙানির শব্দ শুনতে পাই। আমার কর্ণকুহরে ঘরছাড়া দিশেহারা মানুষের পায়ের আওয়াজ ও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে জামগাছে আশ্রয় নেওয়া কাক-পাখিগুলি বিপন্ন মানুষদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে আর্তনাদ করে ওঠে। কা-কা-কা ...।

ভোরের পবিত্র নীরবতা ছিন্ন করে তখন শুরু হয় মর্টারের শেল আর মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি।

২

মেশিনগানের ঝাঁকঝাঁক গুলির শব্দ আর মর্টার-নিক্ষিপ্ত শেলের আকাশ কাঁপানো প্রলয়ডঙ্কা শুনে মনে হল আমরা এবার আরেকটি ২৫ মার্চের মুখোমুখি হতে চলেছি। পূর্ব আকাশে তখনও সূর্য উঠেনি। সবে উঠি উঠি করছে। আর পশ্চিম আকাশে তখন কালো মেঘের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। ২৫ মার্চে আমরা ঢাকায় দেখেছি ঐরকমের কুন্ডুলি পাকানো ধোঁয়ার উৎস কী? আমাদের দোকান ঘরের সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে থাকা মানুষজনের কাছ থেকে জানলাম, গান বোট থেকে নেমে পাকসেনারা গান পাউডার ছিটিয়ে জিঞ্জিরা ও বড়িগুর বাজার দু'টি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা যাকে পাচ্ছে তাকেই নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে। দৌড়ে ছুটে যেতে যেতে একজন চিৎকার করে বললো, 'আপনারা যেখানে পারেন মেয়েদের লুকিয়ে রাখেন। ওরা মেয়েদের ধরে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাবধান আপনারা উঠেন। জাগেন। পালান। পানাপুকুরে লুকিয়ে থাকেন।' উদ্বিগ্ন মধ্যবয়সী ঐ লোকটিকে দেখে মনে হল, তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা হবেন।

হেলাল হাফিজকে নিয়ে হল আমাদের বিপদ। আমি আর নজরুল পথের ওপর দাঁড়িয়ে হেলালের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু হেলাল কিছুতেই দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না। অগত্যা দোকান ঘরের ভিতরে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি, দেয়ালে ঝুলানো একটা ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে হেলাল চুল আঁচড়াচ্ছে। ওর কাণ্ড দেখে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি চিৎকার করে ওকে ধমক দিয়ে বলি, 'এই বুঝি তোমার চুল আঁচড়ানোর সময়? আগে মাথা বাঁচাও, মাথাই যদি না থাকে, তো চুল দিয়ে করবেটা কি?'

আমার অপর সঙ্গী নজরুল ইসলাম শাহ্-র চুলের পরিচর্যার কোনো দরকার পড়ে না তার গোল মাথায় শুভ্র-সুমসৃণ টাক। টাক থাকাতে ওকে দেখতে আরও

সুন্দর লাগে। মাথার চুল থাকলে ওকে এতো সুন্দর লাগতো বলে মনে হয় না। আমার মনে হল চিরুনি আবিষ্কার না হলেও তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, আর আমি? আমার মাথাভর্তি অযত্নলালিত বাবরি দোলানো ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। হাতের পাঁচ আঙুল দিয়েই আমি চিরুনির কাজ সারি।

আমার ধমক খেয়ে হেলাল চুলের পরিচর্যা অসম্পন্ন রেখেই বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের নিকটবর্তী মসজিদটিতে গিয়ে আমরা আপাতত আশ্রয় নেবো। মনে হল মানুষজন ঐ মসজিদের দিকেই ছুটছে। আমরাও ধারণা করি, আল্লাহর ঘর মসজিদে হয়তো ধর্মপ্রাণ পাকসেনারা আক্রমণ করবে না। করে যদি তো করবে। একা তো আর মরবো না, সেখানে অনেকের সঙ্গে মরা যাবে। একা একা মরার চেয়ে অনেকে মিলে একসঙ্গে মরার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। মৃত্যুর ভয়টা সেখানে তুলনামূলকভাবে কম হবে। মৃত্যুকে আমরা অনেকে মিলে ভাগ করে নিতে পারবো। ১৯৭১ সালে আমরা যে লাখে লাখে মরতে পেরেছিলাম, সে তো এজন্যই যে ওটা ছিল অনেকে মিলে মরা। মরতে মরতে মৃত্যুর ভয়কে জয় করে ফেলা। বঙ্গবন্ধু মানুষের সমবেত-মৃত্যুর ঐ অপরিমেয় শক্তিটাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলতে পেরেছিলেন, ...'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।'

আমরা যখন এরকম ভাবছি, তখন আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে আমাদের দোকান ঘরের ওপর দিয়ে ছুটে গেলো ঝাঁক-ঝাঁক গুলি। গুলির পেছনে পেছনে মশালের মতো জ্বলতে জ্বলতে ছুটে আসে কামানের গোলা আর মর্টারের শেল। সামান্য নিচে দিয়ে গেলে সেইসব গুলি-গোলা ও শেলের আঘাতে আমাদের যে-কারও মস্তক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারতো। বিশেষ করে আমার। বাহাদুরি দেখাবার জন্য নয়, বাস্তবকারণেই আমার মাথাটি অনেকের উপরে থাকে ফলে, আমার মাথাটি নিয়ে আমার হয়েছে ভারী বিপদ। বিধাতা কেন যে আমার মস্তকটিকে এমন একটি অনাবশ্যক দীর্ঘ দেহকাঠামোর ওপর স্থাপন করে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের নাগরিক করে পাঠিয়েছিলেন, তা তিনিই ভালো জানেন তিনি কি জানতেন না আমার এই 'চির-উন্নত-শির'টি ছড়ড়া গুলির সামনে কত বিপজ্জনক হতে পারে?

অবশ্য পাকিস্তানে নয়, আমার জন্ম হয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষেই। সেই ভারত হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে আমার জন্মের দু'বছর পর দীর্ঘদেহী করে পাকিস্তানে জন্ম দেওয়ার জন্য ভগবানকে যে দুষবো, তারও আর উপায় থাকে না যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত ভগবানেরই জয় হয়। মনে হয়, আমার

জন্মের পরপরই বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের লালনভূমি ভারত যে তুচ্ছ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এভাবে ভাগ হয়ে যাবে, তা তিনিও জানতেন না জানতেন চুরুট চার্চিল, রেডক্লিফ, নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

২৫ মার্চের মিলিটারি অপারেশনের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ঢাকার মানুষ যে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, পাকসেনাদের তা অজানা থাকার কথা নয়। বিশেষ করে মুস্তফা মহসীন মন্টুর বাড়ি এখানে। খসরুও তার দলবল নিয়ে এখানে এসেছে। ওরা দু'জনই পাক আর্মি মার্ডার কেসের পলাতক দাগী আসামী। মন্টু তো ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ভেঙে সদলবলে পালিয়েছে ২৬ মার্চ সকালে কিছুসংখ্যক অবাঙালি পুলিশকে হত্যা করে তাঁরই নেতৃত্বে দখল করা হয়েছে কেরানীগঞ্জ থানা। তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রথম সারির আওয়ামী নেতারা এই পথেই ঢাকা থেকে পালিয়ে ফরিদপুর-কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানের চিরশত্রুরাষ্ট্র ভারতে প্রবেশ করেছেন। বুঝলাম, মন্টু-খসরুকে গ্রেফতার করা ও এই ভারতমুখী রুটটা বন্ধ করতেই আজকের এই মিলিটারি অপারেশন। ২৫ মার্চের পর ঢাকা ছেড়ে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পালিয়ে আসা লক্ষাধিক মানুষকে পুনরায় ঢাকায় ফিরিয়ে নেওয়াটাও পাকসেনাদের আক্রমণের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। 'মন্টু কিধার হ্যায়?' 'খসরু কাহা হ্যায়?' পাকসেনারা নদী থেকে জিঞ্জিরার মাটিতে পা দিয়েই লোকজনকে ঐরকম প্রশ্নও করছিল। বুঝলাম নেকরোজবাগ থেকে শুভাড্ডায় সরে এসে আমরা ভুল করিনি।

যতই সময় যায়, পাকসেনাদের তাড়ায় প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের আর্ত চিৎকারের শব্দ বাড়তে থাকে। শিকারি ব্যাঘ্রদলের তাড়া খাওয়া বনপোড়া হরিণদলের মতো মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিক। অমুক কই, তমুক কই— বলে পলায়নপর মানুষ তাদের প্রিয়জনদের নাম ধরে ডাকছে। সন্তানকে কেউ কাঁধে করে, কেউবা বুকে আগলে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছেন প্রাণ ও সম্ভ্রম হারানোর আতঙ্ক বুকে নিয়ে সোমত্ত মেয়েরা দৌড়াচ্ছে অজানা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কোথায় লুকালে যে তাদের প্রাণ বাঁচবে, তাদের সম্ভ্রম রক্ষা পাবে–, কেউ ভেবে পায় না। মনে হয় পাখা থাকলে তারা এই মুহূর্তে কাক-পাখিদের মতো আকাশে উড়ে যেতো। পিপড়ে বা ইঁদুর হলে মাটি খুঁড়ে গর্তে লুকাতো।

আমি উঁচু মাথা নিচু করে ছুটন্ত মানুষজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে থাকি ঐ মসজিদটিকে লক্ষ করে গুলি আর শেলের লক্ষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার সতর্কতাহেতু সামান্য দূরের পথকেও আমাদের কাছে অনেক দূরের পথ বলে মনে

হয়। একসময় আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। উত্তরের দিক থেকেই শুধু নয়, দক্ষিণ দিক থেকেও যখন এলোপাতারি গুলি আসতে থাকে— তখন আমরা বুঝতে পারি; শুধু নদী থেকে নয়, শুভাড্যার দক্ষিণ দিক দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে সড়কটি নবাবগঞ্জের দিকে গেছে, সেই সড়ক থেকেও পাকসেনারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা একটা ঘেরাটোপের ভিতরে বন্দি হয়ে পড়েছি রাতের অন্ধকারে এপারের মানুষ যখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল, পাকসেনারা তখন চুপিসারে গানবোটে এসে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে নেমে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে পজিশন নিয়েছে এই মুক্তাঞ্চলটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার জন্যই। সুকান্তর 'জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার' কথাটা নতুন করে মনে পড়লো। মনে হল, ২৫ মার্চে যাহোক কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম, আজ বোধ হয় আর বাঁচা হবে না। তবুও প্রাণ বলে কথা। সে তার নিজের ধর্ম মেনে চলে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই তার আশ। ক্রল করতে করতে মূল সড়ক থেকে নেমে, পথের পাশের খানাখন্দকে মাটির ঢালের মতো ব্যবহার করে আমি মসজিদের দিকে এগোতে থাকি। গুলিবৃষ্টি বেড়ে গেলে থামি।

একটি ডোবার ভিতরে মাথা গুঁজে বসে আমি তখন এমন একটি করুণ মৃত্যুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি, যা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না পারি নি। আমি দেখি, শেলের আঘাতে একজন ধাবমান মানুষের দেহ থেকে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে আমি যে ডোবায় লুকিয়ে ছিলাম সেই ডোবার জলে, কিন্তু ঐ মানুষটি তারপরও দৌড়াচ্ছে। শেলের আঘাতে তার মাথাটি যে দেহ থেকে উড়ে গেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। মস্তকচ্ছিন্ন দেহটিকে নিয়ে কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর লোকটা আর পারলো না। তার কবন্ধ দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। মস্তকহীন দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত স্রোতে ভিজে গেলো শুভাড্যার মাটি।

ঐরকমের একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে আমি আমার দু'চোখ চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তারপর কী আশ্চর্য নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঐ লোকটার নিষ্প্রাণ নিথর দেহটিকে পাশ কাটিয়ে আমি দ্রুত ছুটে গেলাম ঐ মসজিদের দিকে যাবার সময় হঠাৎ দেখি একটি ছোট্ট শিশু তার মার কাঁধ থেকে সটকে পড়েছে পথের ওপর। শিশুটির ভীত সন্ত্রস্ত মা একটুও টের পাননি। সন্তান তার কাঁধেই আছে ভেবে তখনও ভয়ার্ত হরিণের মতো তিনি প্রাণপণ দৌড়াচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর যখন তার খেয়াল হল যে তার শিশুটি আর তার কাঁধে নেই, তখন পেছন ফিরে তার সে কী কান্না! ভাগ্য ভালো শিশুটির যে সে মায়ের কাঁধ থেকে পিছলে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ডোবার জলে গিয়ে পড়েনি। পথের ওপর বসে সে কাঁদছিল আর তুলতুলে পায়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। তখন মা এসে তার

প্রাণের ধনকে বুকে কুড়িয়ে নিয়ে দিলেন আবারও তো দৌড় । অনেক দুঃখের মধ্যেও আমার খুব ভালো লাগলো ঐ দৃশ্যটি দেখে ওর মা ফিরে এসে পথ থেকে কুড়িয়ে না নিলে আমি কি পারতাম ওকেও পেছনে ফেলে রেখে মসজিদে চলে যেতে? কে জানে, হয়তো পারতাম । ঈশ্বর আমাকে সেই অগ্নি-পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন ।

আমি যখন মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সেই মসজিদটি লোকে লোকারণ্য । মসজিদের সামনের পাকা উঠানের ওপর বেশ ক'টি মৃত ও অর্ধমৃত পুরুষের দেহ পড়ে আছে । কেউ চিৎ হয়ে, কেউ বা উবু হয়ে আছে । কারও দিকে কেউ তাকাচ্ছে না । ঐ সব মৃত বা অর্ধমৃতরা যেন জীবিতদের কেউ নয় । তাদের দেহ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে অঝোরে । হেলাল আর নজরুলকে দেখলাম মসজিদের ভিতরে বসে কোরান শরীফ পড়ছে আমিও মহান আল্লাহর কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে ঐ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলাম ।

৩

আমার মসজিদে পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় হেলাল ও নজরুল যে আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল, ওদের সন্ত্রাসবিদ্ধ বিস্ফোরিত চোখের দিকে তাকিয়ে তা বেশ বুঝতে পারলাম । আমি আমার পায়ের কাদামাখা পাঞ্জাবির প্রতি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম দেখে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমি কীভাবে কঠিন সংগ্রাম করে শেষ-পর্যন্ত জান বাঁচিয়ে ঐ মসজিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি । ঐ জান বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা সেদিন কম কঠিন কাজ ছিল না । শুধু ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তো বাঁচিনি, পাকসেনাদের পাতা মৃত্যুকূপ থেকে বাঁচার জন্য সেদিন আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিও খরচ করতে হয়েছিল তবে কি বুদ্ধিমানরা সেদিন মারা পড়েনি? পড়েছে, যাদের ভাগ্য ছিল অপ্রসন্ন আর ভাগ্যবানদের মধ্যে যারা মারা পড়েছিল, তাদের বেলায় হয়তো বুদ্ধিদেবী প্রসন্ন ছিলেন না । ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুই দেবীর দয়া যারা পেয়েছিল, একাত্তর সালে পাকহানাদারবাহিনীর মরণবাণ থেকে তারাই শুধু বেঁচেছে ।

ঐ মসজিদটির কথা আমার বেশ মনে আছে । মসজিদটির মেঝেটা ছিল পাকা কিন্তু তার দেয়াল আর চালা ছিল টিনের । আমি নজরুল বা হেলালের কাছে না বসে ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে, দক্ষিণ দিকের একটা জানালার পাশে বসলাম । জানালাসংলগ্ন ছোট্ট কাঠের টুলের ওপর রেহেলে রাখা একটি কাপড়মোড়া কোরান শরীফও পেয়ে গেলাম হাতের কাছেই । আশ্চর্য, এটি কি কারও চোখে পড়েনি? একটা ছোট্ট মসজিদে আর ক'টা কোরান শরীফই বা থাকে! নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হল ।

স্কুলে পড়ার সময়, মুহাম্মদ (সঃ)-র জীবনী লিখে আমি আমার জীবনের প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলাম কোরান শরীফে লিপিবদ্ধ সুরাগুলি শেষ-নবী হজরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর ওহি হিসেবে নাজেল হয়েছিল। আমি ঐ কোরানটি দ্রুত লুফে নিলাম। ভাবলাম, আরবি না জানার কারণে সুরাগুলি পড়তে না পারলেও দু'চোখ দিয়ে দেখতে তো পারবো। মানুষ যে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তাদের প্রিয় ধর্মস্থান দর্শনে যায়, সে তো দু'চোখ ভরে দেখার জন্যই। সেখানে তো পাঠের বালাই থাকে না। চোখের দেখাটাকেই সেখানে পুণ্যজ্ঞান করা হয়। তো পড়তে না পারলেও কোরান শরীফের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখার পুণ্য থেকে আমিই বা বঞ্চিত হবো কেন? অমুসলমান বলে? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, মানুষ কোনো একটি বিশেষ ধর্মে জন্ম গ্রহণ করলেও কমবেশি সকল ধর্মের আবহের মধ্যেই সে বাস করে। বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দান করটা সকল ধর্মেরই মর্মকথা। অপবিত্র হওয়ার আশংকায় তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে নয়, ধর্মগৃহে আশ্রয় সন্ধানে যারা আসে, তাদের বুকে টেনে নিতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের প্রকৃত গৌরব।

চারদিক থেকে পাকসেনাদের তাড়া খাওয়া অসহায় মানুষের আর্ত চিৎকার আমাদের কানে ভেসে এলেও, মসজিদের ভিতরে আশ্রিত মানুষজনের মধ্যে তখন বিরাজ করছিল রাজ্যের নিস্তব্ধতা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। দেখলাম, মসজিদের ভিড়ের ভিতরে সবাই বসে ইষ্টনাম জপ করছে। সেখানে কতজন মুসলমান আর কতজন হিন্দু— তা বোঝার কোনো উপায় নেই। মাথাভর্তি বাবরি চুল আর মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্য আমাকেই বরং তরুণ মুসলমান বলে বাইরে থেকে ভ্রম হয়। আমার তখন মনে পড়লো নজরুলের সেই মোক্ষম কবিতার চরণ :

'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

মনে হল, মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারীরা সবাই যদি মুসলমান হতো, তাহলে আমার ভাগে কোরান শরীফ জুটবার কথা নয়। তবে কি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারীরা অধিকাংশই হিন্দু? কে জানে? মনে হল হিন্দু হয়ে প্রাণ বাঁচাতে মুসলমানদের পবিত্রস্থান হিসেবে বিবেচিত মসজিদের ভিতরে আশ্রয়গ্রহণকারী হিন্দুরা হয়তো এক ধরনের নীরব অপরাধবোধে ভুগছে। কলেমা পাঠরত মুসলমানদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা কলেমা পাঠ করতে পারছে না তারা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

মনে হল এখানে কেউ কাউকে চেনে না। সবাই ভবিতব্যের ওপর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে ক্রমঅগ্রসরমাণ একটা ভয়ংকর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে।

আমার মনে হল, মসজিদের ভিতরে বসে হিন্দুরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে নয়, অভ্যাসবশত তাদের ইষ্টদেব ভগবানকেই স্মরণ করছে। যদিও আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছিল না, কেউ বলেনি যে, আপনি এখানে কেন? তবু পবিত্র কোরান শরীফের ওপর কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তখন মনে মনে স্মরণ করলাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫-১৯১০) কথা। 'কেবল মুসলমানের জন্য আসেনিকো ইসলাম'– নজরুলের এই কথাটাও মনে পড়লো। ভাই গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ রূপ বিবেচনা থেকেই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানকে আপনার বলে বিবেচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের প্রথম অনুবাদক হওয়ার বাহাদুরি দেখাবার জন্য নিশ্চয়ই এই স্পর্শকাতর বিশাল/ পবিত্র গ্রন্থ অনুবাদের মতো কঠিন কাজটি তিনি করেননি। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনের পরামর্শক্রমে ১৮৮১-১৮৮৬ পর্যন্ত ছয় বছরের দীর্ঘ সাধনা ও পরিশ্রমে তিনি টীকাসহ কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে হয়েছিল। কোনো একদিন পূর্ববঙ্গের কিছু হিন্দু পাকসেনাদের আক্রমণ থেকে তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভভাড্যার মসজিদে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে, একথা ভেবে গিরিশবাবু সুদূর লক্ষ্ণৌয় গিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আরবি ভাষা শিখে এসে বাংলাভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করেননি। মুসলমান ও তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি পর্যাপ্ত ভালোবাসা ও সঙ্গত শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই এই দুরূহ কর্ম তাঁর পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। মনে মনে বললাম, ধন্য গিরিশ! আপনি আমার কৃতজ্ঞচিত্তের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

বেশ কাকতালীয় ঘটনাই বটে, কোরান শরীফ সামনে নিয়ে ভভাড্যার যে মসজিদটিতে বসে আমি গিরিশচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম, সেখান থেকে গিরিশচন্দ্রের জন্মগ্রাম নারায়ণগঞ্জের পাঁচদোনা খুব বেশি দূরে নয়। কর্মসূত্রে গিরিশচন্দ্র আমার নিজ জেলা ময়মনসিংহে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, জানতাম। বর্তমান রচনার সূত্রে গিরিশচন্দ্রের জীবনী পাঠ করে আরও বিস্ময়কর কিছু তথ্য আমার জানা হল, যা আমি পূর্বে জানতাম না। রবীন্দ্রনাথসহ যুক্তবাংলার বহু মনীষী যখন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র ছিলেন লর্ড কার্জনের তথা বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১০) একজন দৃঢ় সমর্থক। এই ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর হবে বলেই তিনি তখন মত প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু ভদ্রলোকরা সবাই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন বলে যারা ঢালাও মন্তব্য করেন, ভাই গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা তাদের সেই ধারণার পরিপন্থী। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলতে ভাই গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথা বোঝাননি। পূর্ববঙ্গের আদিবাসী অমুসলমানদের কথাও তিনি নিশ্চয়ই স্মরণে

রেখেছিলেন। তাঁর মুক্ত-উদার জীবনবেদ পাঠে এই প্রত্যয় হয় যে, তিনি একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে ভাবা সম্ভব না হলেও, তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের নেতৃত্বেও পূর্ববঙ্গে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তবে তো ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে আমাদের পক্ষে তাঁকে অমান্য করা চলে না।

তাঁর সম্পর্কে অন্য যে তথ্যটি জেনেছি সেটিও চাঞ্চল্যকর বটে। ময়মনসিংহে বসবাসকালীন সময়ে তিনি দু'টি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এর একটির নাম ছিল 'সুলভ সমাচার' ও অন্যটির নাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু'। স্বাধীন পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের অনেক আগেই যে পূর্ববঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু' কথাটা চালু ছিল, এই নামে একটি পত্রিকা পর্যন্ত ছিল, তা আমি জানতাম না। রামের জন্মের আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে অনেকে বলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মের আগেই 'বঙ্গবন্ধু'র ধারণাটি যে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো। ('বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান' দ্রষ্টব্য)। ধন্য গিরিশচন্দ্র, ধন্য।

আগে খেয়াল করিনি। মসজিদের ডানদিকের জানালার পাশে বসেছি। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখিনি। হঠাৎ বাঁদিকের খোলা জানালায় চোখ পড়তেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। মনে হল এর চেয়ে দান্তের ইনফারনো বা নরকদর্শনও হতো কম ভয়ঙ্কর। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমি আমার দু'চোখ বন্ধ করে ফেললাম। হা ঈশ্বর! মসজিদের সামান্য দূরেই দেখছি জলভরা বুড়িগঙ্গা নদী। সকালের নবজাগ্রত সূর্যের আলো পড়ে সেই জল চিকচিক করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা হতে পারতো একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য— সেই ভোরে ঐ দৃশ্যটির মধ্যেই আমি বহু মানুষের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম বুড়িগঙ্গা নদীর জলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাকসেনাদের একটি বিরাট গানবোট। মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত পাকসেনারা তীরের কাছে নোঙর করা সেই গানবোট থেকে এপারের মাটিতে নামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা তাদের গানবোট থেকে বিরাটাকৃতির তক্তা মাটিতে নামাচ্ছে। তক্তার মাধ্যমে নদীর এপারের মাটির সঙ্গে তাদের গানবোটটি যুক্ত হলেই পাকসেনারা দল বেঁধে এপারে নেমে আসবে। আর গানবোট থেকে নামতেই তাদের সামনে পড়বে এই মানুষঠাসা মসজিদটি। হায়, এতো পথ পাড়ি দিয়ে শেষে আমরা এ কোথায় এলাম? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হল আমাদের?

২৫ মার্চের পর পাকসেনাদর্শন ছিল যমদর্শনের চেয়েও ভয়াবহ। বুঝলাম এই ভয়ংকর দৃশ্যটি অন্যরা আগেই দেখেছে, আমি দেখলাম সবে। মসজিদের ভিতরে

ছড়িয়ে পড়া নীরবতার আসল কারণটি এবার আমার কাছে আরও স্পষ্ট হল। পাকসেনাদের শ্যেনদৃষ্টি আর মেশিনগানগুলি আমাদের আশ্রয়স্থলের দিকে তাক করা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুভাড্যার মাটিতে তাদের চরণ পড়বে। হয়তো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এসে আমাদের এই মসজিদটিকে ঘিরে ফেলবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের হাতে নির্ধারিত হবে আমাদের ভাগ্য।

আমি কি এই মসজিদে থাকবো, নাকি অন্য কোথাও চলে যাবো? আমি যখন এরকম দ্বিধার ভিতরে, তখন এক তরুণ আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো, 'কবি সাহেব, আমি আপনাকে চিনি। আপনি মসজিদ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। এই জায়গাটা আপনার জন্য নিরাপদ নয়। বলা তো যায় না, অন্য কেউ হয়তো আপনাকে পাকসেনাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। আর এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। চলে যান।' এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে তরুণটি আমার কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে গেলো। কে ছিল ঐ তরুণ, আমি আজও জানি না। তার মুখটিও আমার স্মরণে নেই আমি আর দেরী করলাম না, আমার পাশের খোলা জানালা দিয়ে দ্রুত মসজিদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

মসজিদের পাশ দিয়েই গেছে একটি এক চিলতে মাটির সড়ক। পাকসেনাদের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমি ঐ পথটা পেরুলাম। সড়কের ওপারে পাশাপাশি অনেকগুলো গৃহস্থ বাড়ি। আমি ঢুকে গেলাম ঐসব বাড়ির মধ্যে যেটিকে কাছে পেলাম তার একটির ভিতরে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি বাড়িতে কোনো মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। প্রশস্ত উঠান বেশ পরিচ্ছন্ন। গোবর দিয়ে লেপানো তুলসিতলাটি দেখে বুঝতে পারলাম, বাড়িটি হিন্দুর। চারদিকে শুনসান নীরবতা। কিছু বুঝে উঠতে না পারা একটি ছোট্ট অবুঝ কুকুরছানা দৌড়ে এসে আমাকে স্বাগত জানালো। সে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকলো ফ্যাল ফ্যাল করে বাড়িতে লোকজন নেই কেন, তারা কোথায় গেছে? মনে হল এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, তারও। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমি বারান্দায় উঠলাম। আমার চোখ পড়লো কপাট খোলা রান্নাঘরটির দিকে দেখলাম রান্নাঘরের চুলায় বসানো ভাতের ডেকচি থেকে ভাতের ফেনা চুলার আগুনে উপচে পড়ছে। চুলার পাশে কাঁসার থালায় হলুদ-মরিচের বাটনা। বুঝলাম, আর্মি আসার খবর শুনে বাড়ি ছেড়ে পালাবার সময় ঐ বাড়িতে সকালের রান্নার আয়োজন চলছিল।

ততক্ষণে পুলসিরাতের পুল পাড়ি দিয়ে পাকসেনারা গানবোট থেকে নেমে গেছে এলোপাতাড়ি ঝাঁক ঝাঁক গুলি ফাটিয়ে পাকসেনারা গুভাড্যার মানুষজনকে সেকথা জানিয়ে দিলো একটি প্রাণ হরণের জন্য একটি গুলিই যেখানে যথেষ্ট,

সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো স্বদেশজয়ী পাকবাহিনীর গুলি ফাটানোর মহোৎসব।

আমি দেখলাম রান্নাঘরের পাশেই একটি ছোট্ট মাচান। সেই মাচানটি প্রচুর লাকড়ি দিয়ে ঠাসা। আমি দ্রুত মাচানের লাকড়িগুলি দু'হাতে সরিয়ে লাকড়ির মাঝখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে তার ভিতরে প্রবেশ করলাম। দুর্গটি দেখতে অনেকটাই হল চিতার মতো। চারপাশে লাকড়ির দেয়াল থাকায় আমার গুলিবিদ্ধ হয়ে মরার ভয় দূর হল, কেননা, গুলি যে সরল রেখায় চলতে অভ্যস্ত, লাকড়ি দিয়ে তৈরি করা ব্যূহের ভিতরে সেই সরল রেখাটি পাওয়া দুষ্কর শঙ্কান্তরে হাওয়া অতি সামান্য ছিদ্রপথ দিয়েও চলতে পারে বলে সেই দুর্গের ভিতরে হাওয়ার কোনো অভাব ছিল না। তবে, পাকসেনারা যদি গান পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে হিন্দুধর্মমতেই আমার শবদেহের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিশ্চিত হবে।

কাষ্ঠনির্মিত দুর্গের ভিতরে আমি আরাম করে হেলান দিয়ে বসলাম, আমার মনে হল শেষ পর্যন্ত আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছেছি আমার আশ্রয়স্থলটি নির্ভরযোগ্য। এটি যদি আমার অন্তিম আশ্রয়ও হয়, হবে। আমার আপত্তি নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি আর কোনো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবো না। আমি যখন মরতে রাজি হলাম, দেখলাম আমার বুকের ভিতর থেকে একটা বিশাল বোঝা নেমে গেছে। আমি খুব নির্ভার বোধ করলাম বুঝলাম, ওটা ছিল জীবনের বোঝা।

দৈহিক ক্লান্তিহেতু কখন আমার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বুঝতেও পারিনি। আমার চেতনা ফিরলো বাড়িতে ফিরে আসা মানুষের কান্নার শব্দে সে কী কান্না! মানুষের সমবেত-কান্না যে কী ভয়ংকর মর্মার্ত শোনায়, তা আমি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিলের সকালে পূর্ব-শুভাড্যায় শুনেছি। হিরোশিমার মানুষ শুনেছিল ১৯৪৫ সালে, ৬ নভেম্বর সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। সেদিন আমেরিকা পরমাণু বোমা ফেলেছিল জাপানের ঘুমন্ত হিরোশিমা নগরীতে পঁচিশে মার্চের রাতে ঢাকায় আমি আক্রান্ত মানুষের ক্রন্দন এভাবে কাছে থেকে শুনিনি। সেই রাতে পাকসেনাদের গোলাগুলির আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল মানুষের কান্না। শুভাড্যায় মনে হল গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের আর্তচিৎকারে আওয়াজ।

ঐ বাড়ি ছেড়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাই তখনও ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছে তারা যারা ফিরে আসেনি তাদের জন্য কাঁদছে। কে কোথায় কোন ডোবার জলে মরে পড়ে আছে, কে জানে? ওদের মরণ-চিৎকার শুনে আমার ভারী লজ্জা হল। ওদের অজ্ঞাতসারে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই ভালো

হতো। ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো তাই করতাম। কিন্তু ঘুম বলে কথা। ঘুমের মানুষের সঙ্গে মৃত মানুষের পার্থক্য তো খুব বেশি নয়। ঘুম থেকে জাগা ও না জাগার ব্যাপার।

লজ্জার মাথা খেয়ে লাকড়ি নির্মিত দুর্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে আমি পড়লাম ঐ বাড়ির গৃহকর্ত্রীর আর্ত-চিৎকারের মুখে। আমাকে কাঠের মাচান থেকে নামতে দেখে, ভয় পেয়ে 'ও মা গো' বলে ঐ মহিলা রান্না ঘর ছেড়ে এমনভাবে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন যে, মনে হল আমি বুঝি কোনো দলছুট পাকসেনা। আরও অনিষ্ট করার জন্যই আমি ওদের রান্না ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। আমি অপরাধীর মতো করজোড়ে উঠানে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে মাফ করে দিন। আমি খুব বিপদে পড়ে পাকসেনাদের ভয়ে আপনাদের পাক-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি আপনাদের মতই একজন খাঁটি বাঙালি এবং ধর্মে হিন্দু, বর্ণে কায়স্থ।' মর্মে মানবিক কথাটাও মনে এসেছিল কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে আর বললাম না। জানি, বিপন্ন মানুষ রসিকতা জিনিসটাকে সর্বদা সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

ঐ বাড়ির একটি মেয়ে, মনে হল আমাকে বিশেষভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মেয়েটি অষ্টাদশী। বেশ সুন্দরী। টানা ডাগর চোখ। পিঠের ওপর লম্বা কালো চুলের বিনুনি। আমাকে নিয়ে বাড়ির অন্যদের মধ্যে কিছুটা শংকাভাব থাকলেও, মেয়েটির চোখেমুখে সেরকম কিছু নেই। ওর চোখে-মুখে আনন্দের ছটা। কবি বলেই সেই আনন্দের দ্যুতিটা আমার চোখে পড়লো বেশি। সুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জা পাওয়াটা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বিষয়টা মৌলিক বলে, ঐরকমের দুর্দিনেও তার ব্যতিক্রম হল না।

আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বললো, 'আচ্ছা আপনি কি কবি?' শুনে আমার তো ভয়ে-আনন্দে ভিড়মি খাওয়ার দশা। বললাম, -'হ্যাঁ'। মেয়েটি কেঁপে উঠলো। ইতিমধ্যে বাড়ির কর্তাটিও ফিরে এসেছেন। মেয়েটি তাঁর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, 'উনি কবি নির্মলেন্দু গুণ। আমার খুব প্রিয় কবি। উনি আমাদের পাকঘরের লাকড়ির ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন।'

ভদ্রলোক আমাকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ আমি তো উনাকে দেখেছি। আপনি ঐ মসজিদের ভিতরে ছিলেন না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিনি। চলে এসেছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের আর্তচিৎকার এমন করুণতা নিয়ে আমাদের আলাপের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল যে, ইচ্ছে থাকলেও সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না এবং তা শোভনও নয়। এই ভেবে, আমি চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, মেয়েটি বললো, -'আমার নাম শুভা'।

কানের ভিতর দিয়ে নামটি আমার মর্মে পৌঁছুলো।

'শুভা? ভারী সুন্দর নাম তো। আপনার নাম থেকেই বুঝি শুভাড্যার নামকরণ হয়েছে।'

মেয়েটির বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, শুভাড্যার মেয়ে তো, তাই আমি ওর নাম রেখেছিলাম শুভা। শুভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে এবারই ভর্তি হয়েছে। রোকেয়া হলে ছিল। মার্চের মাঝামাঝি হল ছেড়ে বাড়ি চলে এসেছিল না এলে কী যে হতো।'

শংকিত পিতা কন্যার মাথায় তার আদুরে হাত বুলালেন। আমি পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত্রির কথা স্মরণ করলাম ভাবলাম, ঐরকমের কত শুভার যে বাড়ি ফেরা হয়নি, তার হিসাব কে রাখে?

শুভা বললো 'আপনি থাকেন। আমাদের বাড়িতে দুপুরের ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'আমার সঙ্গে দু'জন বন্ধু আছে, তাদের খুঁজতে হবে। আমাকে বরং এক গ্লাস জল দিন। খুব তেষ্টা পেয়েছে। ভুলে গিয়েছিলাম।'

আমাকে কিছু একটা দিতে পারার সুযোগ পেয়ে শুভার মুখটা প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠলো একদৌড়ে রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে সে দ্রুত ফিরে এলো। আমি জলপূর্ণ গ্লাসটি একটানে নিঃশেষ করে ঐ বাড়ির মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে দ্রুত পথে বেরিয়ে এলাম।

জানি না শুভা আমার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিল কি না। হয়তো ছিল। হয়তো ছিল না। মনে হল, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে হঠাৎ-হাওয়ার মতো ভেসে আসা ঐ মেয়েটি পাকসেনাদের কৃত অপরাধকে কিছুটা লঘু করে দিয়ে গেলো। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার মনে হল, পাকসেনাবাহিনীর এইসব বর্বরতা সত্য নয়, ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চ লাইট' সত্য নয়, ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা-শুভাড্যা-কালিন্দির জেনোসাইড সত্য নয়; ইয়াহিয়া-টিক্কা খান সত্য নয়, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ সত্য নয়, সত্য শুধু শুভা।

৪

শেলীর মরদেহ বিলম্বে হলেও ইতালীর সমুদ্র সৈকতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল আমার কবিবন্ধু আবুল কাসেমের মরদেহ কেউ কোথাও কখনও খুঁজে পায়নি আমার ধারণা, জগন্নাথ হলের খেলার মাঠের গণকবরে বা ঐ হলের পুকুরের জলে তার শেষ-ঠাঁই হয়ে থাকবে পাকসেনারা সেদিন যদি শুভাড্যার ঐ হিন্দুবাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিতো, তাহলে আমার মরদেহটিও কেউ কখনও খুঁজে পেতো না।

পুড়ে ছাই হয়ে যেতো কিন্তু হয়নি অগ্নিতে যার আপত্তি নেই, মাটিতে তার ভয় কী? ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দি সহ কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, নবগঠিত মুক্তিবাহিনীর সদস্য ও পাকসেনা হত্যাকারী খসরু মন্টুর সন্ধানে জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দি ইউনিয়নের অনেক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেও ঐ বাড়িটি সেদিন অজানা কারণে পাকসেনাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল, সে এক রহস্য। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, যে অদৃশ্যশক্তির ইঙ্গিতে রামায়ণ রচনা করার জন্য রত্নাকর-দস্যু মহাকবিতে পরিণত হয়েছিলেন, পাকসেনাদের বর্বরতার ইতিবৃত্ত রচনা করার জন্য সম্ভবত তিনিই সেদিন আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা না হলে, এখন, ঘটনা ঘটে যাবার ছত্রিশ বছর পর 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড' কে লিখতো? ২৫ মার্চের ঢাকার গণহত্যা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। অনেকে লিখেছেন। আমাদের লেখক ও সাংবাদিকদের পাশাপাশি অনেক বিদেশি সাংবাদিকরাও লিখেছেন। কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে সংঘটিত ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা জেনোসাইড সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখা হয়নি তবে কি ঐ ঘটনাটি আমার লেখায় বর্ণিত হওয়ার জন্যই এতোকাল ধরে অহল্যার মতো অপেক্ষায় পাথর হয়ে ছিল? তাই তো মনে হচ্ছে চলমান রচনাটি লিখতে গিয়ে আমিও আমার বেঁচে থাকার একটা বিশেষ অর্থ খুঁজে পাচ্ছি মনে হচ্ছে, আমার এই বেঁচে থাকাটা শুধুই অকারণ পুলকে বাঁচা নয় এর পেছনে কারণের জোরও রয়েছে।

আগেই স্বীকার করেছি, লাকড়ি দিয়ে তৈরি করা চিতার ভিতর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার আনন্দের সঙ্গে শুভা-দর্শনের আনন্দ যুক্ত হওয়ার পর আমি একটি পরাবাস্তব কল্পজগতের ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল সাত ঘন্টাস্থায়ী সামরিক অভিযানে স্বদেশজয়ী বীর পাকসেনাদের হাতে অগুনতি নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধের অপঘাতমৃত্যু হলেও, শুভাড্যায় আমার পুনর্জন্ম সাধিত হয়েছে। আমি মরতে মরতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছি। জগন্নাথ হলের গণকবর থেকে বেঁচে যাওয়া কালীকৃষ্ণ শীলের মতো আমার বাঁচাটা অতোটা অলৌকিক হয়তো নয়, তবু কিছুটা অলৌকিক তো বটেই। তার মূল্যকেই বা খাটো করে দেখবো কেন?

আমার বাবার কথা খুব মনে পড়লো। বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে আমি যখন তাঁকে প্রণাম করতাম, তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন— 'কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম'। পাছে সংস্কৃত ভাষায় বলা শ্লোকটি তাঁর বাঙালি ভগবান ঠিক বুঝতে না পারেন, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায়ও বলতেন, —'তোর ওপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হোক। তিনিই তোকে রক্ষা করবেন।'

আমি নিজের অস্তিত্বে যতটা বিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঠিক ততটা বিশ্বাসী না হলেও, আমার মনে হলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ-ভক্ত পিতার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তা না হলে ২৫ মার্চের পর ২ এপ্রিলেও আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হতো না। পাকসেনাদের ছোড়া গুলি বা শেলের আঘাতে অন্য অনেকের মতো আমার মাথাটিও যেকোনো মুহূর্তেই উড়ে যেতে পারতো আমি পরম আদরে আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে মাথাটির অস্তিত্ব নতুন করে পরখ করলাম। না, আমার মাথাটি যথাস্থানেই আছে। আমি তাহলে সত্যিই বেঁচে আছি আহা, কী চমৎকার এই বেঁচে থাকা। শত দুঃখের ভিতরেও কী আনন্দময়, কী দুর্লভ এই মনুষ্য জীবন

মনে মনে স্থির করলাম, ভজাড্যায় আর নয়। আজই ঢাকায় ফিরে যাবো কিন্তু ঢাকায় থাকবো না। আজিমপুরের নিউ পল্টনে আমার মেসের পাশে আমার অনেক বন্ধুর বাড়ি আছে, তাদের কারও বাড়িতে রাত কাটিয়ে, যদি প্রাণে বাঁচি তো কাল সকালের দিকে আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবো। নজরুল হয়তো ওর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায় যাবে। ওর এক প্রেমিকা আছে নারায়ণগঞ্জে। কুমিল্লা যাবার পথে হয়তো তার সাথে দেখা করে যেতে পারে। আমার মতোই হেলাল হাফিজের বাড়িও নেত্রকোণায়। সে যদি আমার সঙ্গে যায় তো ভালো, দুঃসময়ে পথের বিশ্বস্ত সঙ্গী পাওয়া যাবে। না হলে আমি একাই চলে যাবো হেলালের বড় ভাই দুলাল হাফিজ সরকারী আমলা। হেলাল হয়তো ওর বড় ভাইয়ের বাসায় থেকে যেতেও পারে। দেখা যাক।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর একথা জানার পরও, পরবর্তী করণীয় নিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে আমি আমার আস্তানার দিকে পা বাড়ালাম।

সকালে মসজিদে যাবার পথে যে লোকটির মস্তকটি তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে পাশের ডোবায় ছিটকে পড়তে দেখেছিলাম, ফেরার পথে দেখলাম, বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষ ঐ মস্তকহীন মানবদেহটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মস্তক ছিল না বলে তখনও পর্যন্ত ঐ মানবদেহটিকে কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। ফলে ঐ দেহটিকে ঘিরে জড় হওয়া মানুষজনের ভিড় থেকে কোনো ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছিল না। আমি ঐ ভিড়ের জটলার মধ্যে প্রবেশ না করে মরদেহটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার অস্থায়ী বাসস্থানের দিকে মনে হলো ঐরকমের একটি নির্মম দৃশ্য আমার মতো দুর্বলচিত্তের মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা উচিত নয়।

ছোটোবেলায় আমাদের বাড়িতে যখন মাঝে মাঝে পাঁঠাবলি হতো, সেই দৃশ্য কখনও নিজ-চোখে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। পাঁঠাবলির সময় আমি আমাদের বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে বসে থাকতাম। আঙুল দিয়ে

দুই কান বন্ধ করে রাখতাম, যাতে ঐ অনাথ-প্রাণীর অন্তিম চিৎকারটি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে না পারে। একবার আমাদের বারহাট্টায় একটি দুর্গাপূজায় মহিষ বলি দেওয়া হয়েছিল। এলাকার বহু পুণ্যার্থী সেই মহিষবলির দৃশ্য দেখতে পুজোমণ্ডপে ভিড় করে, কিন্তু আমি যাইনি

মান্য করে চলতে না পারলেও ভগবান বুদ্ধের 'প্রাণিহত্যা মহাপাপ' কথাটা আমি সত্য বলে মানি। পাকসেনাদের কল্যাণে সেই আমাকেই কিনা একটি নরবলির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হল একাত্তরের পাকসেনাদের চেয়ে পাপী পৃথিবীতে আর একটি সেনাবাহিনীই আছে, হিটলার-বাহিনী নয়, সেটি হচ্ছে আমেরিকান সেনাবাহিনী। ইহকালের বিচার এড়িয়ে গেলেও পরকালের বিচারে এই পাপীরা এড়াতে পারবে না। পরকাল বলে কিছু আছে কি না, জানি না; আমি চাই থাকুক। এইসব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবার জন্য পরকাল থাকুক।

আমাদের অস্থায়ী বাসস্থানটির কাছে পৌঁছে দেখি, দোকানঘরটির সামনে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে। পাকসেনারা গানবোটে উঠে কান্ডাড্যা ত্যাগ করেছে— এই খবরটি পেয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে হেলাল আর নজরুল আমার আগেই দোকানঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে দূর থেকেই ওরা আমাকে দেখতে পেলো। ওরা দু'জনই ভিড়ের ভিতর থেকে আমার দিকে ছুটে এলো। আমরা পরস্পরকে আমাদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ওদের দু'জনকে নিয়ে, আর ওরা ভয় পাচ্ছিলো আমাকে নিয়ে

ওখানে কিসের ভিড়? প্রশ্ন করে জানার আগেই ওরা জানালো, জানিস, বুকে গুলি লেগে রফিক ছেলেটি মারা গেছে। ওর মৃতদেহ ঘিরেই দোকান ঘরের সামনের এই জটলা। রফিক? রফিকের নাম শুনে আমার মাথাটা ঘুরে গেলো। মাথায় হাত দিয়ে আমি পথের ওপর বসে পড়লাম। হা ভগবান। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি উঠলাম। হেলাল আর নজরুলের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলাম ঐ ভিড়ের দিকে। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ভিড়ের ঠিক মাঝখানটায় রক্তাক্ত দেহ নিয়ে রফিক শুয়ে আছে। মনে হল প্রাণ ভরে ঘুমাচ্ছে। ওর নিষ্প্রাণ দেহটিকে ঘিরে মাতম করছে তার আপনজনেরা। রক্তে ভেজা বুকের দিকে চেয়ে বুঝলাম, ওর বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মাটিতে শায়িত রফিকের নিথর নিষ্প্রাণ দেহটিকে দেখে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল। ভোরে আর্মি আসার সংবাদ জানিয়ে আমাদের সে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। বলেছিল, তাড়াতাড়ি পালান। সেই আমরা ঠিকই বেঁচে গেলাম, আর পাকসেনাদের গুলিতে প্রাণ দিলো রফিক?

রফিক যদি সেই সকালে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে না তুলতো? তবে তো আমরা ঘুমিয়েই থাকতাম। আমরা ঘুমের মধ্যে নিশ্চিত মারা পড়তাম পাকসেনাদের হাতে। রফিকের বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বললেন, আপনারা দোকান ছেড়ে চলে যাবার পর রফিক দোকানে গিয়ে বসেছিল ভেবেছিল, দোকানে বহিরাগত কেউ না থাকলে পাকসেনারা তাকে কিছু বলবে না। কিন্তু ওরা যখন শিলাবৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দোকানের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন রফিক ভয় পেয়ে দোকানের আলমারির পেছনে লুকিয়ে পড়ে। পাকসেনারা 'মুক্তি কাঁহা? মর্দু-খসক কিধার হ্যায়', বলতে বলতে দোকানের সামনে পজিশন নিয়ে দোকানের ভিতরে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। ঐসব ঝাঁক ঝাঁক গুলির দুটো গুলি আলমিরার পাতলা কাঠ ফুঁড়ে আলমিরার পেছনে লুকানো রফিকের বক্ষ ভেদ করে চলে যায়।

আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'র অন্তর্গত 'শহীদ' কবিতাটিতে রফিকের ছায়া রয়েছে। যতদূর মনে পড়ে কবিতাটি আমি পরবর্তীকালে কলকাতায় বসে লিখেছিলাম। মনে হয়, আমার অবচেতনে থেকে ঐ ছেলেটিই আমাকে দিয়ে ঐ কবিতাটি লিখিয়ে নিয়েছিল।

শহীদ

তুমি এখন শুয়ে আছো, মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতে মুখ।
পথের মধ্যে উবু হয়ে তুমি এখন স্বপ্নরত,
মধ্যরাতে আকাশভরা তারার মেলায় স্বপ্নবিভোর,
বুকে তোমার এফোঁড়-ওফোঁড় অনেক ছিদ্র,
স্বাধীনতার অনেক আলোর আসা যাওয়া।

তুমি এখন শুয়ে আছো ঘাসের মধ্যে টকটকে ফুল।
পৃথিবীকে বালিস ভেবে বাংলাদেশের সবটা মাটি
আঁকড়ে আছো, তোমার বিশাল বুকের নিচে এতটুকু
কাঁপছে না আর, এক বছরের শিশুর মতো থমকে আছে।

তোমার বুকে দুটো সূর্য, চোখের মধ্যে অনেক নদী,
চুলের মধ্যে আগুনরাঙা সাতসকালের দুষ্ট বাতাস,
মাটির মধ্যে মাথা রেখে তুমি এখন শুয়ে আছো
তোমাকে আর শহীদ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

(শহীদ : না প্রেমিক না বিপ্লবী)

গত ক'দিনে এই রফিক ছেলেটি আমাদের কী প্রিয়ই না হয়ে উঠেছিল। আমার কবিতার বইটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়েছিল, বলেছিল, আমার কবিতাগুলি তার খুব ভালো লেগেছে। দেখলাম কিছু কিছু কবিতার লাইন তার মুখস্থও হয়ে গেছে। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল ছেলেটি কবিতা বুঝে। ভালো কবিতা সনাক্ত করতে পারে। দুপুরে ক্যারাম খেলার ফাঁকে আমি একবার ওকে বলেছিলাম, কী ব্যাপার, তুমিও কবিতা লিখবে নাকি? লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে গিয়েছিল রফিকের মুখ। বলেছিল, ইচ্ছে তো আছে। আপনি দোয়া করবেন আমাকে। আমার কবিতার বইটির নাম নিয়ে ওর মনে প্রশ্ন ছিল। আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, প্রেমাংশুর রক্ত চাই কথাটার মানে কী? আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের অনেক প্রিয়জনকেই তাদের বুকের রক্ত দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে তো সেকথাটাই বলেছেন, ...'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' কথাটার অর্থ বুঝতে পারোনি?

তখন মাথা দুলিয়ে রফিক বলেছিল, 'ও তাই, এবার বুঝতে পারলাম। আপনার কবিতার বইটির নাম খুব সুন্দর হয়েছে তো। প্রেমাংশুর রক্ত চাই কথাটার মানে তাহলে প্রেমাংশুর জন্য রক্ত চাই? জন্য কথাটা এখানে উহ্য রেখেছেন? আর ঐ প্রেমাংশু হল আমাদের দেশ। আমাদের মাতৃভূমি। –তাই না?'

আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কবিতা নিয়ে ওর সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে দেখে। সেই রফিক নিজেই প্রেমাংশু হয়ে এখন আমাদের সবার চোখের সামনে শুয়ে আছে। গুভাড্যার মাটি ভিজে যাচ্ছে ওর কিশোর বুকের টকটকে লাল তাজা রক্তে। ওর নিমিলীত অক্ষিযুগলে খেলা করছে চৈত্র-দুপুরের রৌদ্র।

রফিক, তোমার মৃত্যুর ছয়ত্রিশ বছর পর, আমি আজ তোমার মৃত্যুকথা লিখতে বসেছি। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণের হাত থেকে তুমি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিলে, কিন্তু তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো ভাই।

২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিল ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, কাজী ফিরোজ রশিদ ও অভিনেতা এস এম মহসীন। তাঁরা রাত দশটার কিছু পর বত্রিশ নম্বরে যান। তাঁরা যখন গেট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করেন, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। তাকে খুব বিমর্ষ দেখা যায়। 'খবর কী স্যার?' ছাত্রনেতাদের প্রশ্ন শুনে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'খবর আমি কী জানি? আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন, নেতাকে জিজ্ঞেস করো।' বলে তিনি হন হন করে

বেরিয়ে যান বঙ্গবন্ধু তখন বাড়ির সামনের লনের সবুজ ঘাসের ওপর খালি পায়ে পায়চারি করছিলেন। বঙ্গবন্ধু নূরে আলম সিদ্দিকী ও মাখনকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান। তাদের সঙ্গে তাঁর কিছু গোপন কথা হয়। তারপর তিনি তাদের নিয়ে ফিরে আসেন বাইরে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, '২৭ তারিখ দেশব্যাপী হরতাল। তবে এর আগে যদি কিছু হয়ে যায় তো আমি তোদের যেভাবে যা-যা করতে বলেছি, তাই করবি। যা চলে যা।' তারপর তিনি হঠাৎ ফিরোজকে কাছে ডেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'শোন ঝন্টু (কাজী ফিরোজ রশিদের ডাক নাম) আমি আইজিপিকে বলেছি তারপরও মন্টু (ফিরোজ রশিদের ভাই) যদি মুক্তি না পায়, তো আমাকে মাফ করে দিস'

উদগত ক্রন্দনভারে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বড় করুণ সুরে বাজে। সামান্য একজন শিষ্যের কাছে এভাবে মাফ চাইছেন বঙ্গবন্ধু? কেন চাইছেন? কেন চাইলেন? তবে কি বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, তাঁর ভক্ত অনুসারীদের কাছে মাফ চাওয়ার সুযোগ তিনি আর নাও পেতে পারেন? বঙ্গবন্ধু দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে যান। ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে তখন রাত সাড়ে দশটার মতো হবে। পথে বেরিয়েই তারা দেখতে পান, বেশ কিছু পাক-আর্মির গাড়ি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

(তথ্য : এস এম মহসীন)

বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার হাত পা জড়িয়ে ধরে নেতাদের কেউ কেউ কান্নাকাটিও করেছিলেন বলে শুনেছি। বঙ্গবন্ধু সেদিন কারও পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তিনি কারও কথা শুনতে রাজি ছিলেন না তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়-অটল-অবিচল। বঙ্গবন্ধুর কথা ছিল, পাকসেনারা যদি আমাকে আমার বাড়িতে না পায়, ওরা যদি আমাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়, তো ওরা উন্মত্ত হায়েনার মতো এই নগরবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—, ঘরে ঘরে ঢুকে তারা আমার সন্ধান করবে, আর আমাকে না পেয়ে নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করবে। আমি তা হতে দিতে পারি না।

'আমাকে মাফ করে দিস'— বঙ্গবন্ধু এই অসহায়-আর্ত-উচ্চারণের মধ্যে তাঁর গ্রেফতার বরণ করার সিদ্ধান্তটির সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অনুসারীদের জন্য তাঁর বুকভরা ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধেরও পরিচয় মেলে ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ২৫ মার্চের রাত দশটার সময়ও তিনি ভুলতে পারেননি যে, কাজী মন্টু নামে তাঁর একজন কর্মী জেলে আটক আছে তিনি তাঁর মুক্তির জন্য আইজিকে অনুরোধও করেছেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে আশংকা জাগলো যে, তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষিত নাও হতে পারে।

কেননা তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই রাত্রির অবসানে কাল একটি ভিন্ন সকাল আসবে। তাঁর নির্দেশে এই দেশ হয়তো আর চলবে না। পূর্ব পাকিস্তানের অঘোষিত শাসক হিসেবে যেভাবে দেশটি তাঁর নির্দেশে চলছিল, কাল থেকে হয়তো বা তার ব্যত্যয় ঘটতে পারে

বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বরণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যারা একমত হতে পারেননি, তারা যখন দেখলো যে, পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার বরণ করেও ২৫ মার্চের নির্বিচার গণহত্যা তিনি ঠেকাতে পারেননি, তখন তারা বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ঐরূপ নীলকণ্ঠ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার মনেও কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ২ এপ্রিলের 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড'টি ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ করার পর আমার ধারণা পাল্টে যায়। মন্টু-খসরুর মতো সামান্য আর্মড-ক্যাডারদের গ্রেফতার করতে না পারার ক্ষোভে পাকসেনারা সেদিন কেরানীগঞ্জ থানার জিঞ্জিরা, কালিন্দি বা শুভাড্যা— এই তিন ইউনিয়নের বাড়ি-বাড়ি অনুসন্ধান চালিয়ে যেভাবে নির্বিচারে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষজনকে হত্যা করেছে, তাতে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ২৫ মার্চে মিলিটারি অপারেশনের শুরুতেই যদি ওরা বঙ্গবন্ধুকে (তাদের ভাষায় দি বিগ ফিস) তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করতে না পারতো, তাহলে তাদের অক্ষম রোষের আগুনে ঢাকা নগরীর আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে সেদিন প্রাণ দিতে হতো নিজে গ্রেফতার বরণ করে বঙ্গবন্ধু যে সেদিন আমাদের অনেকের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সপ্তাহান্তে পাকবাহিনী পরিচালিত সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ও চরিত্র পর্যালোচনা করলে তার সত্যতাই অনুভূত হয়।

সেদিন না জেনে, না বুঝে যারা নিজেদের নাম মন্টু বা খসরু বলে পরিচয় দিয়েছিল, তারা কেউই পাকসেনাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। মোস্তফা মহসীন মন্টু জানিয়েছেন, তার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন, তাঁরও নাম ছিল মন্টু। পাকসেনারা জিঞ্জিরায় নেমে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাঁর পরিচয় জানতে চায়। জানতে চায় সে হিন্দু না মুসলমান। তিনি বলেন, আমি মুসলমান যখন নামের প্রশ্ন আসে, তখন ঐ ভদ্রলোক ভাবতেও পারেননি যে মন্টু নামটি পাকসেনাদের কাছে এতো ঘৃণিত ও তাঁর জন্য এতোটাই বিপজ্জনক হতে পারে। আওয়ামী নেতাদের ভারতমুখী একজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত এই পথটি ব্লক করা, রাজধানী খালি করে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে আশ্রয় গ্রহণকারী নগরবাসীদের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও পাকসেনাদের আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেননি তিনি ভাবতেও পারেননি যে, পাকসেনারা খসরু-মন্টুর মতো কিছু সংখ্যক সশস্ত্র ক্যাডারকে ধরার জন্য এরকম একটি বিরাট সামরিক অভিযানে নামতে পারে।

তাই তিনি স্বচ্ছন্দে, খুব স্পষ্ট উচ্চারণেই তার নিজের নাম বললেন, বললেন—'আমার নাম মন্টু ডাক্তার '

'মন্টু? তুম মন্টু হ্যায়?'

মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই পাকসেনারা গুলি করে মন্টু ডাক্তারকে হত্যা করে। শোনা যায়, বেশ কিছু মন্টু সেদিন পাকসেনাদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিল। খসরু মন্টু যে পাকসেনাদের কাছে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা খুব কম সংখ্যক মানুষই তখন জানতেন। নব্বই ভাগ মানুষই জানতেন না। ফলে না জেনে, না বুঝে তারা সেদিন জীবনের শেষ ভুলটি করে বসেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পাকসেনারা কি জানতো না যে এরা আসল মন্টু বা আসল খসরু নয়? আসল হলে নিশ্চয়ই তারা তাদের নিজনাম-পরিচয় গোপন করত। পাকসেনারা এতো আহাম্মক ছিল না যে, তারা তা জানত না, বা বুঝতো না। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল যে, ঐ নামের কাউকেই তারা রেহাই দেবে না পারলে পুরো দেশটাকেই তারা মন্টু ও খসরু শূন্য করে দিতো।

তো, খসরু-মন্টুকে না পাওয়ার রোষেই যদি পাকসেনারা সেদিন এতো নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশ করে থাকতে পারে, তাহলে ২৫ মার্চের রাতে পূর্ব-পাকিস্তানের কবর রচনা করে সেই কবরের ওপর বাংলাদেশের স্বপ্নবীজ বপনকারী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে ক্রোধোন্মত্ত পাকসেনারা সেদিন রাতে ঢাকা নগরীর আরও কত বাড়িতে ঢুকত, আরও কত মানুষের প্রাণ হরণ করত, তা হয়তো আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না কিন্তু অন্যরা না পারলেও আমি পারি, ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা অপারেশনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। তাই শুরুতে সন্দেহ থাকলেও, পাকসেনাদের জিঞ্জিরা অভিযানের উদ্দেশ্য ও ভয়াবহতা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করার পর আমি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের প্রশংসা না করে পারিনি নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়েই তিনি সেদিন অনেক জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। অপারেশন সার্চ লাইটের দায়িত্বে নিয়োজিত পাকসেনারা নিশ্চয়ই আমার এই বক্তব্যকে সমর্থন করবেন।

২ এপ্রিল পাকবাহিনীর সামরিক অভিযান থেকে মন্টু-খসরুরা সেদিন কীভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন, আমি মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছে সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জানান, নদীপথে পাকসেনাদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য তারা কিছু লোকজনকে নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু দীর্ঘ নদীপথ পাহাড়া দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না ফলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পাকসেনারা গভীর রাতের দিকে জিঞ্জিরায় অবতরণ করে। কালিন্দি ইউনিয়নের নেকরোজবাগ গ্রামে অবস্থানকারী মন্টু-খসরুরা পাকসেনাদের অবতরণের সংবাদটি সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও অপারেশন শুরু হওয়ার কিছু আগে পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন অস্ত্রশস্ত্র

নিয়ে তারা পটকাজোর-নেকরোজবাগ খালপথ দিয়ে নৌকা বেয়ে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ধলেশ্বরী তীরসংলগ্ন আবদুল্লাহপুরে চলে গিয়েছিলেন। পাকসেনারা সেদিন মন্টু খসরুসহ সদ্যগঠিত মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের খোঁজে আবদুল্লাহপুর পর্যন্ত যেতে পারেনি।

সন্ধ্যার দিকে তারা আবদুল্লাপুর থেকে নেকরোজবাগে ফিরে আসেন এবং পথ-ঘাটে, ক্ষেতে ও ডোবায় পড়ে থাকা বহু মানুষের লাশ গণকবরে দাফন করার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী কয়েকদিন ধরে চলেছিল ঐ লাশ দাফনের কাজ। আনুমানিক কত লোক সেদিন মারা গিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্টু বলেন, সংখ্যাটা সঠিকভাবে বলা কঠিন। আমরা কালিন্দি, জিঞ্জিরা ও শুভাড্ডা ইউনিয়নের লোকজনদের মধ্যে তদন্ত করে মৃতদের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তালিকাটি সম্পূর্ণ হয়নি। তবে ঐ সংখ্যাটা ছিল প্রায় শ পাঁচেকের মতো। কিন্তু পাকসেনাদের হাতে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। আসলে ২৫ মার্চের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে যে প্রায় লাখ খানেক লোক এপারের বুড়িগঙ্গা নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, পাকবাহিনীর আচমকা আক্রমণে তারাই সেদিন মারা পড়েছিল বেশি। স্থানীয় লোকজন তো জানতো কোথায় লুকাতে হবে। কীভাবে লুকাতে হবে। কিন্তু ঢাকা থেকে আসা মানুষজন এলাকার কিছুই চিনতো না। জানতো না। তাই আচমকা আক্রমণের মুখে তারা সেদিন পাকসেনাদের অগম্য বিবরে নিজেদের লুকাতে পারেনি। দিশেহারা হয়ে তারা ছুটছিল খোলা মাঠ ও সড়কপথ ধরে। তারাই সেদিন পাকসেনাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমার নিজের ধারণা হয়েছে, ঐদিনের সাত ঘন্টাস্থায়ী মিলিটারি অপারেশনে তিনটি ইউনিয়নের মোট মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলের অষ্টম খণ্ডে (৩৭৬-৭৮ পৃ.) পাক-বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণের দু'টি অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, একটি বাংলায়, একটি ইংরেজিতে। বাংলা অন্তর্ভুক্তিটি গৃহীত হয়েছে ৩ এপ্রিল ১৯৭২ সালের দৈনিক বাংলা পত্রিকা থেকে। রচনার নাম- 'জিঞ্জিরায় নারকীয় তাণ্ডব', লেখক মোঃ সাইফুল ইসলাম। ইংরেজি রচনাটি (The Jinjira Massacare And After/ Experiences of an Exile At Home, Dec 1972) লিখেছেন জনাব মফিজুল্লাহ কবীর। আমি বাংলা রচনাটি থেকে কিছু চুম্বক অংশ উদ্ধৃত করছি।

> '২ এপ্রিলের আগের রাতে কেরানীগঞ্জের অনেক স্থানে শোনা গেলো এক চাপা কণ্ঠস্বর-- মিলিটারি আসতে পারে। ... অবশেষে ভোর হল। কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। সহসা শোনা গেলো কামান আর মর্টারের শব্দ। অনেকে লাফিয়ে উঠল ঘুম

থেকে। যে যেখানে পারল ছুটাছুটি করতে লাগল শুরু হল নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। চারদিকে কেবল চিৎকার, শুধু প্রাণ বাঁচানোর আকুল প্রচেষ্টা। পশুরা রাত্রিতে প্রস্তুতি নিয়েছিল। কেরানীগঞ্জ ঘিরে ফেলেছিল। ক্ষেতের মধ্যে নালা কেটে তারা যখন প্রস্তুতি নেয় কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন ঝোপ, ঝাড়, পুকুর, ঘরের ছাদ যে যেখানে পারল আত্মগোপন করল। কিন্তু খুনী টিক্কার কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার রশীদ রেহাই দেয়নি কাউকে। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিলো। সমানে চলল জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দি ইউনিয়নের লোকদের ওপর গুলি, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষিতা হল কেরানীগঞ্জের মা-বোনেরা। ... প্রতি গ্রামেই বর্বর বাহিনী বাড়িঘর পুড়িয়েছে। হিন্দু এলাকাগুলো পুড়িয়েছে বেশি। ... মান্দাইল ডাকের সড়কের সামনের পুকুরের পাড়ে দস্যুরা ষাটজন লোককে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। কালিন্দির এক বাড়িতে বর্বর বাহিনী পাশবিক অত্যাচার করতে গিয়ে এগারোজন মহিলাকে হত্যা করে। খোলা মাঠ ও গ্রাম দিয়ে যখন গ্রামবাসী ছোটাছুটি করছিল তখন খান সেনারা উপহাস ভরে চালিয়েছে ব্রাশ ফায়ার। বহু অপরিচিত লাশ এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল।"

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর 'একাত্তরের দশমাস' গ্রন্থে 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড'-এর অন্তর্ভুক্তিটি ছোট হলেও মর্মস্পর্শী।

"পাক সেনাবাহিনীর জিঞ্জিরা অপারেশনের কোনো তুলনা নেই সমকালীন বিশ্বে। মিলিটারিরা সেদিন জিঞ্জিরা ও বড়িশুর বাজারটি জ্বালিয়ে দেয়। চুনকুটিয়া-শুভাড্যা ধরে বড়িশুর পর্যন্ত পাঁচ থেকে সাত মাইল এলাকা মিলিটারি ঘিরে ফেলে এবং নারী শিশু নির্বিশেষে যাকে হাতের কাছে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে। নারীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। ক'জন কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করেছে। সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর দু'টা পর্যন্ত চলে এই হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মতো চরম বর্বরতা।"

(দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭২)

বিচারপতি হাবিবুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত মওলা ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের তারিখ' গ্রন্থটিতে ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা গণহত্যার কোনো অন্তর্ভুক্তি নেই।

আফসান চৌধুরী সম্পাদিত মওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ১৯৭১' (চার খণ্ড) গ্রন্থেও আমি পাকসেনাদের জিঞ্জিরা অপারেশনের কোনো তথ্য পাইনি। আশ্চর্য বটে।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে পাকবাহিনীর জিঞ্জিরা জেনোসাইড সম্পর্কে কিছু তথ্য ও কিছু ঘটনার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন।

৩ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

মর্নিং নিউজ-এ একটা হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম : এ্যাকশন এগেইনস্ট মিসক্রিয়ান্টস অ্যাট জিঞ্জিরা– জিঞ্জিরায় দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ।
গতকাল থেকে লোকের মুখে মুখে যে আশংকার কথাটা ছড়াচ্ছিল, সেটা তাহলে সত্যি? ক'দিন থেকে ঢাকার লোক পালিয়ে জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল; গতকাল সেখানে কামান নিয়ে পাকিস্তান আর্মি গোলাবর্ষণ করেছে। বহু লোক মারা গেছে।
গতকাল খবরটা আমি প্রথম শুনি রফিকের কাছে। ধানমণ্ডি তিন নম্বর রাস্তায় ওয়াহিদের বাসা থেকে রফিক প্রায় প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলেও মাঝে মাঝে ঢুঁ মারে; শরীফের সঙ্গে বসে বসে নীচু গলায় পরস্পরের শোনা খবর বিনিময় করে.
রফিকের মুখে শোনার পর যাকেই ফোন করি বা যার সঙ্গেই দেখা হয়– তার মুখেই জিঞ্জিরার কথা। সবার মুখ শুকনো। কিন্তু কেউই খবরের কোনো সমর্থন দিতে পারে না আজ মর্নিং নিউজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেটার সমর্থন দিয়েছে। খবরে লেখা হয়েছে, দুস্কৃতিকারীরা দেশের ভিতরে নির্দোষ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে জিঞ্জিরায় সম্মিলিত এরকম একদল দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা শান্তি প্রিয় নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছিল। এলাকাটি দুষ্কৃতিকারী মুক্ত করা হয়েছে।
দুপুরের পর রঞ্জু এল বিষণ্ন গম্ভীর মুখে। এমনিতে হাসি খুশি, টগবগে তরুণ আজ সে-ও স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সোফাতে বসেই বলল, 'উক ফুফু আম্মা। কী যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে জিঞ্জিরায়। কচি বাচ্চা, থুরথুরে বুড়ো– কাউকে রেহাই দেয়নি জল্লাদরা। কী করে পারলো?'
আমি বললাম, 'কেন পারবে না? গত ক'দিনে ঢাকায় যা করেছে, তা থেকেই বুঝতে পারো না যে ওরা সব পারে?'
"ফুফু আম্মা, আমার এক কলিগ ওখানে পালিয়েছিল সবাইকে নিয়ে। সে আজ একা ফিরে এসেছে– একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে

গেছে। তার বুড়ো মা, বউ, তিন বাচ্চা, ছোটো একটা ভাই— সব মারা গেছে। সে সকালবেলা নাশতা কিনতে একটু দূরে গিয়েছিল বলে নিজে বেঁচে গেছে। কিন্তু সে এখন বুক মাথা চাপড়ে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, সে কেন বাঁচল? উঃ খুকু আম্মা, চোখে দেখা যায় না তার কষ্ট।"

'অথচ কাগজে লিখেছে ওরা নাকি দুষ্কৃতিকারী।'

শরীফ বাইরে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই আরেকটি বম্বশেল ফাটালো। "শুনছো, হামিদুল্লাহ বউ-ছেলে নিয়ে নৌকায় করে ওদের গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। জিঞ্জিরার কাছে পাক আর্মীর গোলা গিয়ে পড়ে ওদের নৌকায়। ওর ছেলেটা মারা গেছে, বউ ভীষণভাবে জখম।"

হামিদুল্লাহর বউ সিদ্দিকাকে ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। ভারি ভালো মেয়ে। হামিদুল্লাহ ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেও খুব নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ। একটাই সন্তান ওদের। তার এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু? মনটা খারাপ হয়ে গেলো। খবর কাগজটা তুলে বললাম, 'অথচ সামরিক সরকার এদেরকে দুষ্কৃতিকারী বলছে।'

বিকেলে রেবা ও মিনিভাই বেড়াতে এল। তাদের মুখও থমথমে মিনিভাইয়ের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় খোন্দকার সাত্তার— তিনিও তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে নৌকায় করে দেশের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। কামানের গোলার টুকরো তাঁদের নৌকায় গিয়ে পড়ে নৌকায় ওর ছোটো ভাই এবং আরও কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে।'

(জাহানারা ইমাম : একাত্তরের দিনগুলি : পৃ- ৭১-৭২)

৫

জিঞ্জিরা অপারেশনের শুরুটা কীভাবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমি দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়েছি। ঘটনাচক্রে ওরা দু'জনই ছিল আমার আজিমপুর মেসের প্রতিবেশী। বয়সে আমার চেয়ে বেশ ছোটো। একাত্তরে তারা দু'জনই ছিল কিশোর। জাকির হোসেন মিলন ও নজরুল ইসলাম খোকা। ওরা ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে পালিয়ে জিঞ্জিরার মান্দাইল গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। ১ এপ্রিল ঐ বাড়ির গর্ভবতী মেয়েটির প্রচণ্ড প্রসব বেদনা শুরু হলে ওরা দ্রুত একটি নৌকা ভাড়া করে মেয়েটিকে নিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে যায়। মেয়েটির স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না। পিতাটিও বৃদ্ধ। পিতা ও কন্যাকে নিয়ে হাসপাতালে আসার

পথে বুড়িগঙ্গা নদীতে টহলরত পাকসেনারা নৌকা থামিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। তখনও তারা বুঝতে পারেনি যে, পাকসেনাদের নদীপথের ঐ টহলটা ছিল আগামীকালের জিঞ্জিরা জেনোসাইডের প্রস্তুতিপর্ব। তারা সেদিন প্রচুরসংখ্যক পাকসেনাকে নদীপথে টহল দিতে দেখেছিল

প্রসূতিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর মেয়েটির পিতার সঙ্গে রাত জাগবে বলে তারাও মিটফোর্ড হাসপাতালে থেকে যায়। গভীর রাতে তাদের ঘুম ভাঙে মিলিটারির বুটের শব্দে। হাসপাতালটি দখল করে নিয়ে কিছু আর্মি হাসপাতালের ছাদে উঠে যায়, কিছু আর্মি পার্শ্ববর্তী মসজিদের ছাদে ওঠে বিভিন্নরকমের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ পজিশন নেয়। ওরা ভয় পেয়ে হাসপাতালের করিডোরের শেষ প্রান্তের একটি টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ে যখন সকালের আলো ফুটে ওঠে, যাকে বলে সুবে সাদেকের আলো, তখন হঠাৎ মসজিদের ওপর থেকে পাক-আর্মিরা আকাশে গুলি ছুড়তে শুরু করে ঐ গুলিগুলো আকাশে ফেটে চৌচির হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে চারদিক আকাশে যাও কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল, পাক আর্মির ছোড়া আগুনের গোলায় তাও দূর হয়ে যায়। যে অন্ধকারে ওরা আত্মগোপন করেছিল, সেই স্থানটাকে তাদের আর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল না। তখন আল্লাহর নাম নিয়ে মিলন আর নজরুল ভয় পেয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গলিপথ ধরে ছুটতে থাকে। ছাদ থেকে পাকসেনারা তাদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে কিন্তু গলিপথ ধরে দৌড়ানোর কারণে তারা অল্পের জন্য রক্ষা পায়

ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে অবস্থিত মিটফোর্ড হাসপাতাল সংলগ্ন মসজিদটির ছাদ থেকেই সেদিন ভোর পাঁচটার দিকে নদীর ওপারের জিঞ্জিরায় মিলিটারি অপারেশন শুরু করার সিগন্যাল দেয়া হয়েছিল।

৬

পথের পাশে ছড়িয়ে থাকা বেশকিছু মৃতদেহকে দেখেও না দেখার ভান করে, তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা যখন নদীর পারে পৌঁছাই, তখন নদীর পারে অনেক মানুষের ভিড়। এক সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পালিয়ে আসার দিন নদীতে যেরকম ভিড় ছিল, দেখলাম ফেরার পথেও তেমনি ভিড় যদিও জানি, সেদিন যারা এপারে পালিয়ে এসেছিল তাদের অনেকেই আজ ফিরছে না। আর ফিরবে না কোনোদিনও। তবু ভিড়

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, লেখক বদরুদ্দিন ওমর। তিনি উদভ্রান্তের মতো নদীর পার ধরে হাঁটছেন। তিনি আমাকে চিনতেন কি না জানি না। আমি তাঁকে চিনতাম একবার ভাবলাম তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আবার ভাবলাম থাক, তিনি

যেমন মুজিববিরোধী, আমার মতো মুজিবভক্তকে পেয়ে গায়ের ঝাল মিটাতে কখন কী বলে ফেলেন। তিনি জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন।

একটি করুণ দৃশ্য আজও আমার চোখে গেঁথে আছে মাথায় গুলি লেগে স্বামীর মাথার খুলি উড়ে গেছে। খুলি-উড়ে যাওয়া মাথার ফাঁক দিয়ে তার মগজের কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লোকটি জল জল বলে স্ত্রীর কাছে জল চাচ্ছে। কিন্তু লোকজনের নিষেধের কারণে স্ত্রীটি তাকে জল খেতে দিচ্ছে না ঐরকম মুহূর্তে নাকি রোগীকে জল দিতে নেই। তাতে রোগীর ক্ষতি হয়। সামনে বুড়িগঙ্গা নদী। সেখানে টলমল করছে স্ফটিকস্বচ্ছ জল। লোকটা তৃষিত চোখে ঐ জলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে পড়লো লালনের গান— 'লালন মরলো জল-পিপাসায় কাছে থাকতে নদী মেঘনা..'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্ত্রীর কপালে সিঁদুরের গোল টিপ। হাতে শাঁখা। স্বামীকে দু'হাতে আগলে ধরে স্ত্রী বসে আছে লোকটির মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে ভিজে যাচ্ছে উভয়ের গা মনে হল বুড়িগঙ্গার ওপারে যাবার নৌকার জন্য নয়, আরও অনেক অনেক দূরে কোথাও যাবার জন্য অপেক্ষা করছে লোকটি। স্ত্রীটিও হয়তো বুঝে গেছে ঐ কঠিন সত্যটা। কী নিষ্ঠুর অমানবিক সময় তখন গ্রাস করেছিল আমাদের মানবিক বোধগুলোকে ঢাকা থেকে নদীর এপারে আসার সময়, একসপ্তাহ আগেও আমরা এরকম ছিলাম না। জিঞ্জিরার গণহত্যা কি আমাদের এতোটাই বদলে দিলো? আমরা ভাবিনি, আগে ঐ মরনোন্মুখ মানুষটিকে নৌকায় তুলে দিই। বলা তো যায় না, সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছতে পারলে লোকটা হয়তো বেঁচেও যেতে পারতো কিছু করতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু ঐ মানুষটাকে বাঁচাবার জন্য আমরা সেদিন কোনো চেষ্টাই করিনি। অনেকের মতো আমরাও সেদিন নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ঐ অপরাধবোধ আমাকে আজও তাড়া করে ফেরে। আমি চোখ বন্ধ করলে আজও সেই খুলি উড়ে যাওয়া লোকটির ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে আসা মগজের অংশবিশেষ স্পষ্ট দেখতে পাই। খোলস-অপসৃত শামুকের মতো তার নরম মগজটা আজও আমার চোখে ভাসে। আজও আমার চোখে ভাসে স্বামীকে দু'হাতে জাপটে ধরে রাখা স্ত্রীর হাতের সাদা ধবধবে শঙ্খের শাঁখা আর কপালের লাল সিঁদুরের গোল টিপটি। কিন্তু ঐ মেয়েটির মুখটা আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না। লোকটা কি বেঁচেছিল? গাঙুরের জলে লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে বেহুলার মতো ঐ মেয়েটি কি বুড়িগঙ্গার জলে স্বামীর শব নিয়ে তার নৌকো ভাসিয়েছিল? নাকি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল লোকটি? কে জানে?

বুড়িগঙ্গা, শরীফ মিয়া ও বেলাল বেগ

> In the distant past, a course of the <u>Ganges</u> river used to reach the <u>Bay of Bengal</u> through the <u>Dhaleshwari</u> river. This course gradually shifted and ultimately lost its link with the main channel of the <u>Ganges</u> and was renamed as the <u>Buriganga</u>. It is said that the water levels during high and low tides in this river astonished the <u>Mughals</u>.
>
> (from Wikipedia)

এই সেই বুড়িগঙ্গা নদী। ঢাকা নগরীর কণ্ঠহার। নদীর তরঙ্গের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এবার দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকো নৌকার জল ছুঁই-ছুঁই গলুইয়ের কাছে বসে আমি বুড়িগঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে আমার দু'হাত ডুবিয়ে দিলাম। আমার মনে হল আমি যেন বুড়িগঙ্গা নদীর জলে নয়, তার গোপন চোখের জলে হাত ডুবিয়েছি বুড়িগঙ্গা তার তীরবর্তী মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদছে। তার চোখে জল।

নদী পেরোনোর সময় আমরা বেশ ক'টি মৃতদেহকে নদীর জলস্রোতে ভেসে যেতে দেখলাম। ঐসব মৃতদেহের মধ্যে দুএকটি নারীর দেহও ছিল। বুড়িগঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছিল তাদের মাথার দীর্ঘকালো চুল। ঐ রমণীদের ভাসমান মরদেহ দেখে আমার মনে পড়ছিল, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের জননী আমিনা ও তাঁর খালা ঘসেটি বেগমের কথা। এই বুড়িগঙ্গার জলেই তাদের সলিল সমাধি রচিত হয়েছিল একদিন। ঢাকার লালবাগ কেল্লার বন্দিজীবনের অবসান ঘটিয়ে আগে থেকে তল ফুটো করা নৌকায় উঠিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নেবার নাম করে তাদের সুকৌশলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এই নদীতে। আমার মনে হচ্ছিল, বুড়িগঙ্গার জলে ভাসমান ঐ নারীদেহ দু'টি বুঝি সেই সিরাজ জননী আমিনা বেগম ও তাঁর বড় খালা ঘসেটি বেগমেরই হবে। তাদের মরদেহও নিশ্চয়ই এভাবেই সেদিন বুড়িগঙ্গার জলে ভেসে গিয়েছিল।

> 'Ghaseti Begum, the former Nawab's hostile aunt, and his mother Amina, were put in a boat, rowed out into the Buriganga river and drowned.
>
> (Clive, The life and death of a British Emperor. Page 229)

বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল— ওপারেতে যত সুখ। ওপারে সপ্তাহ কাটিয়ে পাকসেনাদের মরণতাড়া খেয়ে আজ যখন নদীর এপারে ফিরছি, তখন মনে হল, নদীর এপারে আমাদের জন্য কোনো সুখের

হাতছানি নেই। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বাঘের তাড়া খেয়ে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম কুমিরের বাদা হতে কুমিরের তাড়া খেয়ে আজ আমরা আবার ফিরে আসছি মানুষখেকো সেই পুরনো বাঘের খাঁচায়। জানি না বাঘের খাঁচা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ঢাকা থেকে আমরা বেরোতে পারবো কি না।

নদী পেরিয়ে আমরা নদীতীরবর্তী একটি ছোট্ট চায়ের স্টলে আরাম করে বসে চা-বিস্কুট খেলাম। ঐ দোকানে চা-বিস্কিট ও সিগারেট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সারাদিন যে আমাদের পেটে কিছু পড়েনি, মনেই ছিল না। কিছু খেতে বসে বুঝলাম, আমাদের পেট ক্ষিধায় চোঁ চোঁ করছে। সারা পথ পায়ে হেঁটে কামরাঙ্গীরচর হয়ে আমরা যখন ঢাকায় ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা।

নবাবগঞ্জ বাজারের কাছে, ঢাকার মাটিতে পা রাখতেই দেখা হল শরীফ মিয়ার সঙ্গে শরীফ মিয়া পথের পাশে দাঁড়িয়ে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ফিরে আসা মানুষজনকে কৌতূহলভরে দেখছিলেন। ওপার থেকে এপারে ফিরে আসা মানুষজনের কাছ থেকে নদীর ওপারে কী ঘটেছে, কত মানুষ মরেছে পাকসেনাদের হাতে সে সম্পর্কে খবরাখবর নিচ্ছিলেন।

আমাদের কাছে পেয়ে শরীফ মিয়ার খুশির অন্ত নেই। তাঁকে দেখে আমরাও মহা খুশি। তিনি আমাদের জোর করে ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পিলখানার পাশে আমাদের মেস সেখানে যাবার আগে চা খেতে খেতে আরও অন্ধকারের অপেক্ষায় আমরা কিছুটা সময় শরীফ মিয়ার লালবাগের বাসায় কাটালাম। তিনি আমাদের ডাল-ভাত খাওয়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা রাজি হইনি।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা শরীফ মিয়াকে চেনে না, জানার কথাও নয় তাদের জন্য শরীফ মিয়া সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির উত্তর দিকে, বর্তমান নাটমণ্ডলের সামনেই ছিল শরীফ মিয়ার কেনটিন সবাই বলতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটিলেকচুয়্যাল কর্নার। ঐ কেনটিনটি এখন আর নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেনটিনটি ছিল ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক কর্মীদের দখলে আর শরীফ মিয়ার কেনটিনটি ছিল ঢাকার উঠতি তরুণ কবি, শিল্পী, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদদের দখলে। আমরা নিয়মিত তাঁর কেনটিনে চা, টোস্ট বিস্কিট ও আট আনা প্লেটের বিরিয়ানি খেতাম। আমরা দিনরাত আড্ডা দিতাম ঐ কেনটিনে বসে জগন্নাথ হলে থাকতেন মধুদা। মধুসূদন দত্ত। পঁচিশে মার্চের রাতে মধুদাকে হত্যা করে পাকসেনারা। শরীফ মিয়া থাকতেন তাঁর লালবাগের নিজ বাড়িতে, তাই তিনি বেঁচে গেছেন শরীফ মিয়াকে তখন কে না চেনে? ঢাকার উঠতি তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী-সাংবাদিকদের কাছে শরীফ মিয়া ছিলেন তাদের খুব আপনজন

ঢাকার মানুষ জন্মসূত্রেই খুব রসিক হয়, শরীফ মিয়া ছিলেন আরও এককাঠি সরেস। আমার সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ রসের সম্পর্ক। ময়মনসিংহের মানুষও যে কম রসিক হয় না, সেইটে প্রমাণ করার জন্য আমি সর্বদা তাঁর পেছনে লাগতাম আমাদের মধ্যে রসসৃষ্টির একটা গোপন প্রতিযোগিতা চালু ছিল। একেকদিন আমাদের একেকজনের জয় হতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম, এতো দুঃখের মধ্যেও শরীফ ভাই আমাদের মধ্যকার গোপন প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ভুলেননি। তাঁর বাড়ি থেকে চলে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই, তিনি আমাকে তাঁর শীর্ণ বুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বললেন– "বাউকগা, আগের পাওনা পয়সা আর দিবার লাগবো না।"

ইপিআরদের চোখ এড়িয়ে কিছুটা ঘুরপথে আমি আমার মেসে ফিরলাম। দেখলাম মেস খালি সেখানে আতিক, কাসেম বা হারুন– কেউ নেই। মেস ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেছে। আমাদের মেসের সামনের বাড়িটি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহাজাদাদের ওরা সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। পাশের শরীয়তুল্লাহর ত্রিতল বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন বেলাল বেগ। পাকিস্তান টেলিভিশনের প্রযোজক। আমরা শুনলাম তিনি তখনও আছেন। একজন আত্মীয়ের বাসায় রাত কাটাবে বলে, নজরুল আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। থাকলাম আমি আর হেলাল হাফিজ। স্থির করলাম, আমরা আজকের রাতটা বেলাল বেগের সঙ্গে গল্প করে কাটাবো। বিদ্যুত না থাকাতে সুবিধেই হল। কারও দৃষ্টিতে না পড়ে আমরা আমাদের মেসের ভিতরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে পারলাম পাড়ায় কিছু বিহারির বাস, তাই সঙ্গতকারণেই ওদের নিয়ে আমাদের বেশ ভয় ছিল। পাকসেনাদের সঙ্গে মিশে ওরা কীভাবে নগরীতে বাঙালি নিধনে অংশ নিচ্ছিলো, ২৭ মার্চের সকালে আমরা নিজচোখে তা প্রত্যক্ষ করেছি

রাত দশটার দিকে বেলাল বেগ ডিআইটির টিভিভবন থেকে ফিরলেন। আমরা মেস ছেড়ে চুপিচুপি তাঁর বাসায় চলে গেলাম। তিনি আমাদের আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া কিছু করেছেন? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না সারাদিন পেটে কিছু পড়েছে।'

আমরা বললাম, 'পাকসেনাদের গুলি খাওয়ার ভয়ে আর কিছু খাইনি। আমরা লুকিয়ে এখানে এসেছি। পাড়ার বিহারীরা দেখে ফেললে বিপদ ঘটাতে পারে।'

বেলাল বেগ বললেন, 'ভালো করেছেন, গুলি খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে মরা ভালো।'

আমাদের কাছ থেকে কিছু জানার আগেই তিনি বললেন, 'ওপারে যা ঘটেছে আমি সব রিপোর্ট পেয়েছি।'

'পিটিভি সেই খবর দিয়েছে নাকি?' আমি জানতে চাই।

মুচকি হেসে বেলাল বেগ বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছে বটে। বলেছে, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় আশ্রয়গ্রহণকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হাতে নির্মূল করা হয়েছে।'

বলতে বলতে তিনি তাঁর রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। ফিরে এসে বললেন, 'ঠিক আছে, আমার বুয়া আমার জন্য যা রান্না করে রেখে গেছে, তাই আমরা ভাগ করে খেয়ে নেবো। নো প্রবলেম। যান বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসেন।'

আমরা তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে খেতে বসি কেমন ছিল সেই রাতটি? আমার অনুরোধে, সেই রাত্রির স্মৃতিচারণ করে আমেরিকা থেকে বেলাল বেগ সম্প্রতি আমাকে যে ইমেইলটি পাঠিয়েছেন, আমি তা হুবহু এখানে প্রকাশ করছি। তিনি লিখেছেন :

Hello Goon

The other day Koustuk Ahamed, the owner-editor of Weekly Bangalee of NewYork surprised me at dead of night with a rare phone-call just for the copies of the two poems I wrote on Shamsur Rahman before and after his death only because he came across an Internet message where in you expressed some of your feelings for the poems and for me. Goon, the pure poet, writing about me in all his 62 years ! I just could not believe and I started searching for the message. Finally last night I discovered your message in my Junk-mail which I generally delete without even looking. Now I have transfered you to my mailing list. Thanks to Bill Gates and others who have done what God or Gods could not do re-unite friends and lovers and the poets. Yes, you used to call me Belal Bhai occasionaly but most of the times by the name albait with Apni. Fact is I am senior to you by at least 5 years. I first saw you and Helal Hafiz as my neighbour. On my first sight, you immidiately impressed me with your striking personality. Our friendship started the day you and Helal returned from Zinzira, where you escaped from the ongoing manslaught at Dhaka during and after March 25.
You two were hungry like dogs and I felt you must be given some food. We had a little left-over daal and nothing

else to go with rice if it is cooked. Suddenly I remembered we had one live Koi fish. Our lady-cook cooked it with plenty of soup. Then I noticed how you gulped the food. Our poor but motherly cook was almost in tears seeing your plight. Then I remember how anxious I was to see you escape Dhaka.

Your stories will never end with me because I was one of the sincerest admirers of your poetic self. Well, now that we are connected, once again together we can resume our love and duty towards our country and the people. Yes, Momin Bhai also lives in New York. He loves to keep himself incognito. He is still the same arrogant goodself. I will contact him soon and tell him about you.

This far today.
Keep well
Belal Beg

হিন্দু মৌলানা কিধার গিয়া

বেলাল বেগের ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে ভাত খেতে বসে শুভার আমার কথা মনে পড়ল। শুভা আমাকে ওদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। নজরুল আর হেলালের কথা ভেবে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হইনি। ওদের খুঁজে বের করাটাই তখন ছিল আমার প্রধান কাজ। একা থাকলে আমি নিশ্চয়ই শুভার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করতাম। যাকে বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, আমি তাই করে শুধু শুভার হাতের এক গ্লাস জল গোগ্রাসে গিলে ওদের বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বেরিয়ে এসেছি ঘটনার ছয়ত্রিশ বছর পর, শুভার কথা লিখতে বসে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'চিরদিন' শব্দটা আমি আজ ব্যবহার করতে পারছি। এতোদিন যার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, অবশিষ্ট জীবনে কখনও তার দেখা পাবো, এমনটি আর ভাবি না। যখন শুভার কথা ভাবি, মনে হয় শুভা ছিল জলের দেবী। বুড়িগঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে আমাকে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে সে আবার জলের মধ্যেই মিশে গিয়েছে। 'কেঁদেও পাবে না তারে, বর্ষার অজস্র জলধারে'

জানি, জল তার নিজগুণেই গুণান্বিত, কিন্তু সেই জল যদি কোনো শুভার মমতাময়ী হাতের স্পর্শধন্য হয়, তবে তার মধ্যে যে অব্যাখ্যাত অমৃতগুণ যুক্ত হয়, সে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তার নেশা সোমরসের চেয়ে কম না বেশি, তা মর্ত্যের মানুষ বলবেই বা কিসের জোরে?

বেলাল বেগের বাসায় সেই রাতে আমরা কী দিয়ে কীভাবে খেয়েছিলাম, সেখানে তাঁর মাতৃতুল্য কাজের বুয়াটি কখন আমাদের জন্য কৈ মাছ রেঁধেছিল, আমাদের গোগ্রাসে ভাত খেতে দেখে তাঁর চোখ আদৌ অশ্রুসজল হয়েছিল কি না, তা আমার মনে পড়ে না। বেলাল বেগের মনে আছে হয়তো এজন্য যে, তাঁর স্মৃতিকোষে তখন আমার চেয়ে ঢের বেশি খালি স্পেস ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের আশ্রয়দাতা, আর আমরা ছিলাম তাঁর আশ্রয়প্রার্থী। দাতার স্মরণশক্তি বেশি প্রখর হওয়ারই কথা। অন্য একটি ব্যাপারও ছিল, যার গুরুত্বকেও খাটো করে দেখা যাবে না আমার মস্তিষ্কের জন্য বরাদ্দকৃত স্পেসের অনেকটাই ভরে গিয়েছিল জিঞ্জিরা-গণহত্যার বীভৎস দৃশ্যকাব্যে, তারপরও অবশিষ্ট যা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েছিল সুন্দরী শুভার সোনার তরী। আমার সেই রাত্রির আচরণের মধ্যে বেলাল বেগ কোনোরূপ পাগলামি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কি না, জানি না। করে থাকলেও, জানি ভদ্রতাবশত তিনি তা কখনও কাউকে বলবেন না।

বেলাল বেগ পাক-টিভিতে কাজ করতেন বলে তাঁর পক্ষে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের নীতিনির্ধারকদের সান্নিধ্য পাওয়াটা যেমন সহজ, তেমনি তাদের গোপ...

মনোভাব সম্পর্কে কিছু আগাম ধারণা লাভ করাও সম্ভব ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ তিনি। প্রখর বুদ্ধির জোরে তাঁর পক্ষে অপ্রখর পাকিদের অন্তর্জগত সার্ভিং করাটা খুব কঠিন ছিল না। তিনি বললেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, পাকসেনারা তাদের সার্চ লাইট অপারেশনের শুরুতে নির্বিচারে বাঙালি নিধনে ব্রতী হলেও এখন কিন্তু তাদের নির্বিচার-নিধনের শিকার হবে মুখ্যত হিন্দুরা। যার প্রমাণ আপনি জিঞ্জিরায় নিজেই কিছুটা পেয়েছেন সুতরাং দেশের বাড়িতে ফিরে গেলেও সেখানে গিয়ে খুব বেশিদিন আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন, এমনটি ভাববেন না। পাক সেনারা দ্রুতই মফস্বলের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। তাদের ছত্রছায়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ হবে। ওরা দেশটাকে হিন্দুশূন্য করার চেষ্টা করবে। নির্বিচারে হিন্দু-নিধনের পাশাপাশি চলবে বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধরে নিধন ও নির্যাতন করার কাজ খবর পেয়েছি, ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে, যত দ্রুত পারেন সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবেন।

পাকসেনাবাহিনীর পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে বেলাল বেগের আহরিত ধারণাগুলো আমার নিজের আশংকার সঙ্গে মিলে গেলো। স্থির করলাম, পরদিনই আমরা ঢাকা ত্যাগ করবো। বেলাল বেগ আমার সঙ্গে একমত হলেন যে, মেসে রাত না-কাটানোই ভালো। বেলাল বেগের বাসায় থাকাটাও ঠিক হবে না। তাতে আমাদের বিপদ তো কাটবেই না, বরং আমাদের মতো মুক্তিদের আশ্রয়দানের কারণে তাঁর বিপদ বাড়বে।

সন্ধ্যার পরপর আমরা যখন আমাদের মেসে প্রবেশ করছিলাম, তখন আমার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে কাছে ডেকে চুপিচুপি জানিয়েছেন যে, পাড়ার বিহারিরা মেসের আশপাশের লোকজনের কাছে আমার অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল ওরা আশপাশের লোকজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল, 'হিন্দু মৌলানা কিধার গিয়া?'

কথাটা শুনে আমার খুব হাসিও পেলো, আবার খুব ভয়ও পেলাম। বুঝলাম, আমাকে 'হিন্দু মৌলানা' বলে আমার প্রতি ঐ বিহারিরা যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তা শুধু আমাকে শনাক্ত করার সুবিধের জন্যই। আমার লম্বা চুল-দাড়ির কারণেই আমার এই উপাধিপ্রাপ্তি। দশচক্রে পড়ে আমি যে আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় দাড়ি সম্প্রতি কেটে ফেলেছি, সেই তথ্যটি তারা জানে না। আর জানে না বলে, আজিমপুরে ফিরতে দেখেও আমাকে হয়তো ওরা চিনতে পারেনি দাড়ি কাটার সময় আমার কষ্ট হয়েছিল। রাগ হয়েছিল দাড়ি কাটায় প্ররোচনাদানকারী আমার কবিবন্ধু আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, রফিক আজাদ, শহীদ কাদরীদের প্রতি। 'হিন্দু-মৌলানা' সন্ধানী বিহারিদের চোখে ধুলো দিতে পারার আনন্দে আমার সব রাগ, সব কষ্ট জল হয়ে গেলো

নেতাজী মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়ে আফগানিস্তান দিয়ে রাশিয়া হয়ে হিটলারের জার্মানিতে পালিয়েছিলেন। আর আমি আমার আসল দাড়ি কেটে, বিহারিদের চোখে ধুলো দিয়ে আমার মেসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে আমার মনে হতে লাগলো। মনে হল, কবি তো কিছুটা নেতাও বটে

পাকসেনাদের চাইতে স্থানীয় বিহারিদের ভয়টাই আমাকে বেশি পেয়ে বসলো। ভাবলাম, ওদের হাতে ধরা পড়লে ওরা আমাকে মৌলানার সম্মান তো দেবে না, মালাউন হয়ে মৌলানার লেবাস ধারণের অপরাধে আমাকে কচুকাটা করে তাদের গায়ের ঝাল মিটাবে। সুতরাং মেসে থাকার ঝুঁকি না নিয়ে স্থির করলাম, মেসের সামনে শাহাজাদাদের বাড়িতে রাত কাটাবো। ওরা শহরের বাড়ি ছেড়ে সবাই ওদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে চলে গেছে বাড়িটি সম্পূর্ণ খালি। প্রতিটি ঘরেই বড় তালা ঝুলছে কিন্তু ওদের রান্নাঘরটি খোলা পড়ে আছে। আমরা শাহজাদাদের ঐ রান্নাঘরে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম

রাতের অন্ধকারে মেস থেকে চুপিচুপি বিছানার চাদর, বালিশ আর কিছু প্রয়োজনীয় বই নিয়ে এসেছিলাম, যাতে পরদিন বিহারিদের চোখে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে আমাকে ঐ মেসে আবার ঢুকতে না হয়। পাড়ার বিহারিদের খাটো করে দেখার কোনো কারণই নেই। ঐ বিহারিদের সহযোগিতায় পাকসেনারা নিউ পল্টনে, আমাদের মেসের তিন শ' গজের মধ্যে অবস্থিত বসরুর বাড়িটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার মেসটি যদি আমার নিজের বাড়ি হতো, তবে নিশ্চিত ওরা তা পুড়িয়ে দিতো।

শাহজাদাদের রান্নাঘরের মেঝেতে চাদর বিছিয়ে শুয়েছি কাছেই পিলখানা সেখানে বিদ্রোহী বাঙালি জোয়ানরা আর নেই। পিলখানাটি পুরোপুরি তখন পাকসেনাদের দখলে। বাঙালি যারা ছিল, তারা কেউ পিলখানা ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ ধরা পড়েছে, কেউবা পাকবাহিনীর হাতে মারা পড়েছে। ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় রাতে ভালো ঘুম হল না ভয় তো শুধু পাকসেনাদের নিয়ে নয়, ভয় হিন্দু মৌলানা সন্ধানী আমাদের বেসামরিক বিহারি ভাইজানদের নিয়েও আকৃতি-প্রকৃতিতে কঞ্চির মতো দেখালেও, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার সংগ্রামে পাকসেনাদের ছত্রছায়ায় তখন বিহারিরা হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানি বউড়া বাঁশের চেয়েও বড়।

গতরাত পর্যন্ত আমরা ছিলাম কেরানীগঞ্জের শুভাড্যায়। আজ রাত কাটাচ্ছি ঢাকার নিউ পল্টনে, আমার এক প্রতিবেশীর পরিত্যক্ত রান্নাঘরে। আজকের ভোরটা শুরু হয়েছিল পাকসেনাদের দ্বিতীয় নির্বিচার গণহত্যা, জিঞ্জিরা অপারেশন দিয়ে। আমাদের আসন্ন ভোরটি কী দিয়ে, কেমনভাবে শুরু হবে, কে জানে?

সকলের অগোচরে, অদৃশ্যলোকে একজন থাকলেও, দৃশ্যলোকে পাকসেনারাই তখন হয়ে উঠেছিল আমাদের জানমালের প্রকৃত মালিক। তারা যা চায়, তারা তাই করে, করতে পারে। তারা যা চায় তাই হয়, তাই হচ্ছে, তাই হবে।

একটি জনপদের নিরস্ত্র জনগণ যখন এরকম একটি সশস্ত্র অপশক্তির উন্মত্ত রোষের কবলে পড়ে, তখন তার অসহায়তার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তখন সে তার চরম শত্রুর সঙ্গেও হাত মিলাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকে, পাক-মার্কিন অক্ষশক্তির সঙ্গেই এ জনপদের মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের জন্মশত্রু ভারতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বিকাশমান বন্ধুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল পাক-মার্কিন বন্ধুত্ব। পঁচিশ বছরের মাথায়, পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে একটি মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই অক্ষশক্তির সমর্থকরাও অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই তাদের পছন্দের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে, তাদের অপছন্দের অক্ষশক্তিটির মুখাপেক্ষী হয়ে উঠলো। পুরনো বন্ধুত্বের আপাত অবসান ঘটিয়ে শুরু হল একটি নববন্ধুত্বের নবযাত্রা। বন্ধুবদলের পরিবর্তিত আঞ্চলিক ও বিশ্বপ্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে একটু সময় তো লাগতেই পারে। সময় লাগছিলও বটে। বাইরে থেকে ততটা বোঝা না গেলেও, অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমি তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, দু'দিন আগেও যাঁরা ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী, তারা কী দ্রুত ভারতবন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছেন। তাদের কণ্ঠে রুশবিপ্লবের জয়গান। বুঝতে পারছিলাম, সাময়িকভাবে হলেও রুশ-ভারত অক্ষশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া তাদের সামনে আপাতত আর কোনো বিকল্প নেই। এই অনতিক্রম্য জটিল পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আকারে ইঙ্গিতে কেউ কেউ দায়ীও করছিলেন। যদিও মুখ ফুটে জোর গলায় সে কথা বলার মতো সাহস তখন তাদের অনেকেরই ছিল না

আগের দিন রাতে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদে শুনেছিলাম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক লোকসভায় আনীত প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি ভারত সরকার ও তার জনগণের পক্ষ থেকে জোরালো সমর্থন জানানো হয়েছে। আজ আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদে বলা হল, পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি একটি খুব কড়া-চিঠি পাঠিয়েছেন। খবরটা শুনে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুর্ধর্ষ পরাশক্তি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নও যখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, তখন আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী এবং তা এখন

কেবলই সময়ের ব্যাপার মাত্র , আমাদের ইতিহাস এবং ভূগোল দুটোই আমাদের স্বাধীনতালাভের অনুকূলে। ফলে, আমার অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল ছিল আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ। পক্ষান্তরে যাঁরা যমদূত বা আজরাইলবেশে আমাদের তাড়িয়ে ফিরছিল, তাদের অন্তর ছিল অন্তহীন পাপে পূর্ণ এবং অনিবার্য পরাজয়ের আশংকায় ফাঁকা।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠে আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত ইয়াহিয়ার কাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাপরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট পোদগর্নির লেখা সেই ঐতিহাসিক পত্রটি ছিল এরকম :

> "ঢাকায় আলোচনা ভেঙে গেছে, সামরিক কর্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পথ নিয়েছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করেছেন, এই খবরে সোভিয়েট ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের যেসব মানুষ ঘটনার আবর্তনের শিকার হয়েছেন, দুর্ভোগ ও দুঃখ কষ্টে ভুগছেন, তাদের জন্য সোভিয়েট জনগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। সাম্প্রতিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সুস্পষ্ট সমর্থন প্রাপ্ত মিঃ শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন সোভিয়েট জনগণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানি জনগণের এই সংকটের দিনে আমরা বন্ধু হিসেবে একটি কথা না বলে পারি না। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে, পাকিস্তানে যে জটিল সমস্যা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে— শক্তি প্রয়োগ না করে রাজনৈতিক পথেই তা সমাধান করা যেতে পারে এবং অবশ্যই তা করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে নির্যাতন ও রক্তপাত অব্যাহত থাকলে নিঃসন্দেহে তাতে সমস্যাগুলোর সমাধান ব্যাহত হবে এবং সমগ্র পাকিস্তানী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ক্ষতি হবে। মি. প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া খান) আমাদের জরুরী আবেদন, আপনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতন ও রক্তপাত বন্ধ করার আশু ব্যবস্থা নেবেন এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"

পোদগর্নির পত্রের ভাষা ও মর্মার্থ শুনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হল যে, ভারতের লোকসভায় আগের দিন গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পোদগর্নির ঐ হুমকিপূর্ণ পত্রটি প্রণীত হয়েছে। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। এইবার আসিয়াছি রণে আসিয়াছো রণে, বাণে বাণে হবে পরিচয়। পোদগর্নির পত্রবাণে শুধু যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল তাই না, শেখ মুজিবের জীবনাশংকাও কিছুটা দূর হল।

হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র

আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করে দিয়ে শেষ-পর্যন্ত আরও একটি ভোর হল গোলাগুলির শব্দে নয়, আজ আমাদের ঘুম ভাঙলো মোরগের ডাকে চোখ মেলেই দেখি, একটি লাল-ঝুঁটিওলা তাগড়া মোরগ গায়ের চকচকে পাতাবাহারি পালক দুলিয়ে নির্ভয়ে আমাদের রান্নাঘরের ভিতরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কার মোরগ, কীভাবে এখানে এসেছে, জানি না। রাতে কি উনি এই ঘরের ভিতরে ছিলেন, নাকি দরোজার ফাঁক গলিয়ে ভোরের দিকে আমাদের রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকেছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না দু'জন জলজ্যান্ত মানুষের উপস্থিতিকে আমলে না নিয়ে উনার সদম্ভ বিচরণ ও রান্নাঘরটির ওপর দখলি-মনোভাব দেখে মনে হল, আমাদের মতো উনি এখানে নবাগত নন। ঐ বাড়ির সঙ্গে তার অধিকার একেবারে দলিল-মূলে বাঁধা। মনে হয়, বাড়ির লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় ঐ বীর-বাহাদুরকে ধরতে পারেনি। মোরগের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে সময় নষ্ট করার মতো সময়ও তখন অনেকেরই ছিলো না। য পলায়তি স জীবতি।

মোরগটিকে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের মোরগ বলেই আমার মনে হলো। মনে হল, আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হওয়ার আগেই যে সে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে, তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। হয়তো সে চাচ্ছে, আমি যেন বিহারিদের চোখে পড়ার আগেই এই এলাকা ছেড়ে পালাই। এলাকাটি আমার জন্য নিরাপদ নয়। শুনেছি ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের ভিতরে পশু-পাখিরা তাদের স্ব-স্ব সাধ্য অনুযায়ী ভালো মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। মানুষের সঙ্গে বসবাস করার কারণে গৃহপালিত পশু-পাখিদের মধ্যে ঐ বিবেচনাবোধটি হয়তো আরও তীব্র হয় এ-রকম নির্ভয়চিত্ত মোরগ আমি খুব বেশি দেখিনি। একবার তো সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমার বুকের ওপর দিয়েই আমাকে ডিঙিয়ে গেলো। আমি তার সুঠাম পদযুগল চেপে ধরতে চেয়েছিলাম, পারতামও, কিন্তু এই ভেবে ধরিনি যে উনি আমাদের পথের বিপদই শুধু বাড়াবেন পাকসেনাতাড়িত বিপদগ্রস্ত বাঙালিদের এই অক্ষমতার কথা মোরগটিও বুঝে গিয়েছিলো। পাকসেনা বা বিহারিদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, জানি না, তবে আমাদের নিয়ে ওঁর মনে যে বিন্দুমাত্র ভয় ছিলো না– কিছুক্ষণের মধ্যে সে তা নানাভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। জানি না, ঐ নির্ভয়চিত্ত মোরগটির পরিণতি কী হয়েছিলো।

গতকাল, ২ এপ্রিল নদীর ওপারে, শুভাড্যায় আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিলো আমাদের আশ্রয়দাতার পুত্র রফিক। সময়মতো পালাতে পেরেছিলাম বলে কালকে কোনোক্রমে আমরা বেঁচে গিয়েছি, কিন্তু জিঞ্জিরা অপারেশনে পাকবাহিনীর গুলিবৃষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছে রফিক। সেই থেকে রফিক আমার পিছু নিয়েছিলো।

মোরগটির দিকে তাকিয়ে রফিকের কথা আমার মনে পড়লো আমার মনে হলো, রফিকের রুহ্ ঐ মোরগটির ভিতরে ঢুকেছে। তাই গতকালের মতো আজও মোরগ সেজে সেই রফিকই আমাদের ঘুম ভাঙালো।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার আগে মৃতের আত্মা প্রাথমিকভাবে দাঁড়কাকের (পাতিকাক নয়) ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করে তাই তারা মৃতের ক্ষুধার কথা বিবেচনা করে কাকবলি দেয়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'কাকবলি' হচ্ছে কাককে দেয় অন্নাদি, কাকের আহারের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট ভাত (অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবাকরে কুতূহলী, নতুন তণ্ডুল দেয় মুখে ভারতচন্দ্র)। মৃতের সন্তান বা তার নিকটজনেরা কাকের উদ্দেশ্যে কলার বাকল দিয়ে তৈরি করা ডোঙায় দুধ ভাত পরিবেশন করে বায়সকণ্ঠ নকল করে কো-কো, কো-কো ক'রে দাঁড়কাককে ডাকে, ডাকে সাড়া দিয়ে যতক্ষণ না দাঁড়কাক এসে সেই খাদ্য গ্রহণ করবে, ততক্ষণ নিজেও সে খেতে পারে না। কাককে না খাইয়ে সে অন্নগ্রহণ করতে পারে না। এটি একটি প্রাচীন সনাতন-ধর্মীয় লোকাচার। বৈদিক মত নয়। তাই বাংলাদেশের ভিতরেও, অঞ্চলবিশেষে তার রকমফের দেখা যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাকের পরিবর্তে কুকুরের উদ্দেশ্যে অন্ন পরিবেশন করা হয়। কুক্কুট বা কুক্কুটী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোনো ধর্মকাজে লাগে বলে কখনও শুনিনি। কিছুকাল আগেও হিন্দুরা মুরগির মাংসকে হারাম বলেই ভাবত। কিন্তু ঐ ঘুম ভাঙানিয়া গৃহপালিত প্রাণীটি আমার বড় প্রিয় মুরগি আমার প্রায় নিত্যভোজ্য।

কত মানুষের, কতরকম দুর্দশার চিত্র আমার স্মৃতিকোষ থেকে মুছে গিয়েছে, কিন্তু ঐ সামান্য মোরগটির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

আমরা বেলাল বেগের বাসায় গেলে বেলাল বেগ বললেন, আমার বাসায় আপনারা আসবেন না হোটেল থেকে নাস্তা করে আপনারা দ্রুত গুলিস্তানের দিকে চলে যান। ওখান থেকে বাস পাবেন। ঘন ঘন না হলেও মাঝে মাঝে সেখান থেকে কিছু বাস ছাড়ছে। ঢাকার মানুষজন ঐ পথেই ঢাকা থেকে বাইরে যাচ্ছে। আমরা তাঁকে আমাদের জন্য কিছু টাকা যোগাড় করে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আপনারা গুলিস্তান সিনেমা হলের আশপাশে থাকবেন। আমার হাতে এই মুহূর্তে টাকা নেই। অফিসে গিয়ে টাকা জোগাড় করে আমি আপনাদের পৌঁছে দেবো

আজিমপুর বটতলার একটি ছোট্ট হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে আমরা চললাম গুলিস্তানের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে। উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব শহরটাকে প্রাণ ভরে দেখতে দেখতে যাওয়া। দীর্ঘদিনের চেনা পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, অফিস-

আদালত; আজিমপুর-পলাশীর মোড়, জহুর হল এসএম হল ও জগন্নাথ হল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি গুলিস্তানের দিকে আমাদের প্রাণপ্রিয় শহর ঢাকা। শত ক'বছর ধরে এই নগরী আমার আনন্দ-বেদনার নিত্যসহচর। সে আমার প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম ও সঙ্গমের সাথী আমি তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা। ঢাকা তার বুকের উম দিয়ে আমাকে মায়ের মতো জড়িয়ে রেখেছিলো আজ তার সঙ্গে আমার বাঁধন ছিন্ন হবে। ঢাকার কথা ভেবে আমার খুব কান্না পেলো। আবার কবে আমি আমার এই প্রিয় নগরীতে ফিরে আসতে পারবো, কে জানে!

"এই ঢাকাতেই মুখে চুমু, এই ঢাকাতেই ধিক্-থু।
এর ধুলোতেই জন্ম আমার, এর ধুলোতেই মৃত্যু।"

নদীর ওপার থেকে ফিরে আসার পর রাস্তাঘাটে কোথাও পাকসেনাদের দেখিনি। আজ কার্জন হল পেরিয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে যাবার সময় আবারও কিছু পাকসেনার দেখা মিলল। রাস্তায় তখন বেশকিছু গাড়ি ও রিকসা চলছিলো। পায়ে হাঁটা লোকজনও ছিলো। ঢাকার অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে, বিদেশী সাংবাদিক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তদন্তকারীর এইটে দেখানোর জন্য পাকসেনারা আগ্রহী ছিলো বলে তারা তখন আর আগের মতো পথচারীদের তাড়া করছিলো না

২৫ মার্চের রাতে টিক্কা খান অপারেশন সার্চ লাইটের বর্বরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেশকিছু সামরিক আইনবিধি জারি করেছিলেন। কালক্রমে সামরিক আইনবিধি ১১৭-১৩১ নামে সেগুলো আমাদের ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে। ঐ সব আইনবিধির মধ্যে একটি ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র-সম্পর্কিত সামরিক বিধান। বিধানটির নাম আইনবিধি ১২২। ঐ বিধিতে বলা হয়: "কোনো ব্যক্তি কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না। কূটনৈতিক স্টাফ ছাড়া অন্যদের নিকটতম্ পুলিশ স্টেশনে আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে হবে, এই নির্দেশ সেনাবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য হবে না লাইসেন্স পরীক্ষার পর মালিককে নিজ নিজ অস্ত্র ফেরত দেয়া হবে।"

সামরিক বিধিতে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনের কথা বলা হলেও, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত ঐ সামরিক ফরমানটি কার্যকর করার জন্য পাকসেনারাও তাঁবু ফেলেছিলো ঢাকা হাইকোর্টের গেটমুখে। চেয়ার-টেবিল বিছিয়ে তারা সেখানে একটি অফিস পরিচালনা করছিলো। তারা সেখানে অধীর আগ্রহে বসে অপেক্ষা করছিলো ঢাকার নাগরিকদের আগ্নেয়াস্ত্র জমা নেবার জন্য। কিন্তু প্রাণের ভয়ে সেখানে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে যাচ্ছিল না। অনেকের আগ্নেয়াস্ত্রই তখন নিয়ে গিয়েছিলো স্বাধীনতাকামী তরুণ ছেলেরা। কেউ-কেউ তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাজে লাগবে ভেবে স্বেচ্ছায়

মুক্তিযোদ্ধাদের বিলিয়েও দিয়েছিলো। আমি ক্র্যাকডাউনের পরপরই তারা সবাই নগরী ছেড়ে পালিয়েছে। ফলে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করার জন্য পাকসেনাদের বিছানো টেবিলগুলো ছিলো শূন্য। আমরা কার্জন হলের ভিতর থেকে ঐ সেনাছাউনিটি দেখছিলাম। টেবিলের ওপর হাত গুটিয়ে তীর্থের কাকের মতো আগ্নেয়াস্ত্রের প্রত্যাশায় বসে থাকা পাকসেনাদের দেখে আমার ভারি মায়া হলো। বেচারা!

তখন পর্যন্ত একটি আগ্নেয়াস্ত্রও টেবিলে জমা পড়েনি। একটি টেবিলের ওপর দেখলাম– কিছু লাল ও হলুদ ফুল শোভা পাচ্ছে। দৃশ্যটিকে আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না। ফুল কেন? বর্বর পাকসেনাদের সঙ্গে নিষ্পাপ ফুলের সম্পর্ক হলো কীভাবে? এটা তো হওয়ার কথা নয়। আমরা সবাই জানি, রসুলুল্লাহ ফুল ভালোবাসতেন। স্মর্তব্য "যদি পাও একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি/ যদি পাও দুইটি পয়সা ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।" কিন্তু পাকসেনারা তো সেই পুষ্পঅনুরাগী রসুলের উম্মত নয়। জন্মসূত্রে তাঁর উম্মত হলেও, গত ক'দিনের কর্মসূত্রে ওরা তো তাঁর উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। বুঝলাম, হাইকোর্টের ভিতরে আছে জনপ্রিয় কামেল পীর খাজা শরফুদ্দিনের মাজার। সেখানে তাঁর ভক্তদের ভিড় দিনরাত লেগে থাকে। পীরের ভক্তরা অনেকে ফুল কিনে ঐ মাজারে দেয়। তাই, ফুলের চাহিদা মিটাতে হাইকোর্টের ভিতরে-বাইরে বেশকিছু ফুলের দোকান গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ছোটো ছোটো গরিব ছেলেমেয়েরাও সেখানে দিনরাত ফুল বিক্রি করে। হার্মাদ পাকসেনারা ঐসব ফুল বিক্রেতাদের কারও কাছ থেকে পয়সা দিয়ে ফুল কিনেছে বলে আমার মনে হলো না। কিন্তু ঐ দৃষ্টি কেড়ে নেয়া সুন্দর দৃশ্যটি আমার চোখে গেঁথে গেলো।

ঢাকার নাগরিকদের কাছ থেকে 'আগ্নেয়াস্ত্র' উদ্ধারের পাক-প্রয়াসটিকে মাঠে মারা যেতে দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। আমার মনের ভিতরে তখন একটি ছোট্ট কবিতার জন্ম হয়। দৌড়ের মধ্যে ছিলাম বলে, কবিতাটি তখন আমি লিখতে পারিনি। গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি ঐ কবিতাটি লিখি এবং কবিতাটির নাম রাখি — আগ্নেয়াস্ত্র।

আগ্নেয়াস্ত্র

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক, সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শটগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ, যেন দরগার
স্বীকৃত মানৎ; — টেবিলে ফুলের মতো মস্তানের হাত।

আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগ্নেয়াস্ত্র, — আমি জমা দিইনি।

২৫ মার্চের রাতে পাকসেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বরণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একজন জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর অভিমত।

Dear Goon Da

Sorry to take your time.
I want to share some words with you regarding your comment on the decision taken by Bangabandhu at the night of 25th March 1971. I totally agree with your view that it was the right decision taken by Bangabandhu to get arrested on that night. I want to differ about the reason of taking that decision by him, that you mentioned in the Shaptahik 2000, current issue.
For last many years I talk with my friends and near ones about this incidence and feel so proud of our father of the nation. It is very simple and clear decision, but hard to take by any leader. But Bangabandhu took that boldly and I should say he is the first person who took decision to sacrifice himself, before the crackdown started. If he would not take that decision at that time, what he could do? He could escape and only that single decision could make the total history of our freedom different. That could turn the liberation war into separatist movement, that the East Pakistanis wanted that time.
Just compare the different historical events, Yasir Arafat could not establish any free state as he was in exile (not in jail of Israel), so the Palestinians are still on the streets. Provakaran could not establish any Tamil state as he is treated as separatist leader. Nelson Mendela could free his country people only because he was in Jail for 40 yrs. So I believe Bangabandhu took his decision to get arrested to make sure that the new county Bangladesh can be established without any controversy. Obviously that happened.
I understand Bangabandhu had studied a lot about the previous historical events and found this way to be the best way to free the people. Obviously he took the risk of getting killed, even then independence was a must. So what was next scenario?
Bangladesh without Bangabandhu, yes, he was not looking to become the President or Prime Minister of Bangladesh rather he wanted to make sure the people are free.

I will be happy if I just can understand that you find my idea to be wrong. I am a PhD student in Kanazawa University, Japan. I was born in 1969. I am a medical graduate, passed from Sylhet Osmani Medical College.

With regards
Sufi Ahammad

এবার শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে

পঁচিশে মার্চের পর ঢাকা নগরীর বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তান এলাকায় আমাদের যাওয়া হয়নি। ঢাকার এই এলাকাটা আমাদের খুব প্রিয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন বা নিউ মার্কেটের মোনিকো বা লিবার্টি ক্যাফে বন্ধ হয়ে যেতো রাত নয়টার দিকে। কিন্তু আমাদের আড্ডার তখন মাত্র নবযৌবন দশা সেই নবজাগ্রত আড্ডার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা ছুটতাম পুরনো ঢাকার দিকে গুলিস্তানের কাছাকাছি জিন্নাহ এভিনিউতে ছিল রেক্স রেস্টুরেন্ট ও গুলসিতান বার; একটু দূরে নবাবপুর রোডে ছিল হোটেল আরজু আর ক্যাপিটেল রেস্টুরেন্ট। সুস্থ দেহের জন্য ক্ষতিকর জেনেও কম পয়সার চল্লু বা চুলাই (চৌ এন লাই নহে) মদ পানে নেশা করতে যারা ভয় পেতো না, তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল ঠাঠারিবাজারের হাক্কা আর পরিত্যক্ত ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনের খোলা মাঠের আলো-আঁধারিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাংলা মদের শুঁড়িখানা। আমাদের নৈশ জীবনের কত রকমের কত মধুময় স্মৃতিই না ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে। আমার সেই প্রিয় 'স্মৃতির শহর'কে (শামসুর রাহমানের একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থের নাম) ছেড়ে আজ আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাবো। আমার পা চলে না। পথের পিচের মধ্যে আমার অনিচ্ছুক পা আটকে যেতে চায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় মনে হয় সে আমাকে কানে কানে বলছে, যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব...। ঠিক তখনই কয়েকটা মিলিটারি ভ্যান আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। আমি সম্বিত ফিরে পাই। আমরা দ্রুত গুলিস্তানের দিকে পা বাড়াই সেখানে বেলাল বেগ আমাদের জন্য টাকা নিয়ে অপেক্ষা করবেন। তাঁকে উৎকণ্ঠার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হবে।

বর্তমান রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ভবনটি তখন পরিচিত ছিল ডিআইটি (ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) ভবন হিসেবে। ঐ ভবনের কপালে লাগানো বিরাটাকার ঘড়িটি ছিল আমাদের মতো ঘড়িহীন নগরবাসীর আকাশ ঘড়ি। ১৯৬৪ সালে ওই ভবনের কয়েকটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে পাকিস্তান টেলিভিশন যখন যাত্রা শুরু করে, তখন থেকে নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে ডিআইটি ভবনটি ঢাকার লোকজনের কাছে টিভিভবন হিসেবেই বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে পাকিস্তান টিভিতে যারা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে বেশ ক'জন ছিলেন আমাদের মতো ভুখা তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, শহীদ কাদরী, মোস্তাফিজুর রহমান, মোমিনুল হক, বেলাল বেগ, খালেদা ফাহমী, জিয়া আনসারী প্রমুখ। আমরা প্রোগ্রাম বাগানোর ধান্দায় প্রায়ই ওঁদের কাছে ধরনা দিতাম একবার আমি মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য বেশকিছু

গান লিখে দিয়েছিলাম এবং নামী শিল্পীদের কণ্ঠে গীত হবার পর কিছু গান রমনা পার্কের মনোরম নৈসর্গিক পটভূমিতে চিত্রায়িতও হয়েছিল টিভিতে ঐ গানগুলো প্রচারিত হয়েছিল কি না, তা মনে নেই।

দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা অফিসের পাশাপাশি তখন পিটিভি-ভবনেও আমাদের আড্ডা জমতো। আমাকে টিভি-ভবনের নেশাটা ধরিয়েছিল আমার নাট্যকার বন্ধু মামুনুর রশীদ। তার মাধ্যমেই পিটিভির ঐসব নামকরা প্রযোজকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে একটু নাক-উঁচু ঘরানার প্রযোজক হিসেবে পরিচিত মোমিনুল হক আমার একটি গল্প (আপন দলের মানুষ) পড়ে আমাকে গল্পটির নাট্যরূপ দিতে বলেন। তাঁর পরামর্শক্রমে আমি আমার গল্পটির নাট্যরূপ দেই। তিনি তাঁর দীর্ঘলালিত এন্টিহিরোর ধারণাটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দর্শক প্রতিক্রিয়া উপভোগ করার জন্য একদিন ঐ নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি বলি, আমি পারব না। তিনি বলেন, আমিও জানি আপনি পারবেন না। কিন্তু ওটাই আমি চাই। ঐ না পারাটাই আমার নাটক। তিনি বলেন, আপনি রাজি না হলে আমি কিন্তু ঐ নাটক করব না তখন কিছুটা বাধ্য হয়ে, কিছুটা নায়ক হওয়ার লোভে, কিছুটা মোমিনুল হকের প্ররোচনায় আমি ঐ নাটকের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করি। ঐ ঐতিহাসিক নাটকে হেলাল হাফিজকেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সেও অভিনয়সূত্রে নাটক থেকে কিছু টাকা পেতে পারে। একাত্তরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত ১২ ফেব্রুয়ারি ঐ নাটকটি পিটিভি থেকে সরাসরি প্রচারিত হয়।

ঐ নাটকের নায়ক জগি ছাত্র-মিছিল থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফুঁসে ওঠা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের কিছুটা ঝলক যদি কোনো নাটকে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই যে, তা একমাত্র ঐ নাটকটিতেই ছিল. মোমিনুল হক শুধু যে আমাকে এন্টি-হিরো বানিয়েই সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নয়, পিটিভির কোনো নাটকে ঢাকার রাজপথের সরকারবিরোধী মিছিলের ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করেও তিনি একটি অনন্য সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অল্পদিনের ব্যবধানে পঁচিশে মার্চ কার্যকর না হলে, ঐ নাটকের প্রভাব পিটিভি-র পরবর্তী নাটকগুলোতেও নিশ্চয়ই পড়ত। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে একবার মোমিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। তাকে একটু দেখে যাই। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? কিন্তু বেলাল বেগের কড়া নির্দেশ, ডোন্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট। দেয়ার বাই ইউ অনলি ইনভাইট ট্রাবল ফর হিম।

গুলিস্তানের কাছে পৌঁছে দেখি, বেলাল বেগ গুলিস্তানের সামনের ফুটপাথে ঠোঁট কামড়ে বিমর্ষ মুখে পায়চারি করছেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি দ্রুত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন যাতে আশপাশের কেউ ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারে। মোমিনুল ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথা তাঁকে বলেছি। আপনারা বেঁচে আছেন শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আমার কাছে তো টাকা ছিল না। থাকলে তো সকালেই আপনাদের দিয়ে দিতাম। এটি তাঁরই টাকা।

বেলাল বেগ দ্রুত দৃশ্যপট থেকে নিজেকে ভিড়ের মধ্যে সরিয়ে নিলেন। টিভির মতো সেনসেটিভ একটা গণমাধ্যমে তিনি কাজ করেন, পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নজরে পড়লে তাঁর চাকরি শুধু নয়, প্রাণও যাবে। আমরা তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুটা দূরে গিয়ে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। আমাদের দূর থেকে দেখলেন। আমার বক্ষসমুদ্রের তল থেকে কান্না দলা পাকিয়ে গলা বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে চাইল। মনে হল, আমার গলাটা ব্যথা করছে। পাকসেনাদের বর্বরতা দেখে দেখে মানুষ ও স্রষ্টার ওপর যখন বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম, তখন বেলাল বেগ আর মোমিনুল হকের মতো মানুষরা আমার ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে যেন আমাকে ঐ পুরনো কথাটাই নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ পাকসেনারাই শেষ কথা নয়। শেষ সত্য নয়। আরও কথা আছে। আরও সত্য আছে।

ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যাপারে হেলাল যে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে আছে, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। ঐ দ্বিধা থাকাটাই স্বাভাবিক ওর বড় ভাই দুলাল হাফিজ সরকারি চাকুরে। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে হেলালের পক্ষে একা ঢাকা ত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। বললাম, তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করে তোমার কুশল সংবাদ তাঁকে জানাব। তুমি বরং তোমার বড় ভাইয়ের সন্ধানে যাও। হেলাল বললো, তাই যাই। আমি বড় ভাইকে খুঁজে বের করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

আমি বললাম, 'তাই ভালো হবে। তুমি কিছু টাকা রাখো ' বলে আমি হাতের মুঠো খুলে টাকাটা গুনলাম দেখলাম আশি টাকা। হেলাল বলল, আমি তো ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব। আপনি টাকাটা নিয়ে যান। আমাকে দশ টাকা দেন। আমি দশের পরিবর্তে ওকে বিশ টাকা দিলাম। আমিও তো গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। বেশি টাকা দিয়ে আমিই বা কী করব? তারপর এল চোখের জলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সেই অনতিক্রম্য মুহূর্তটি। গুলিস্তান আমাদের দু'জনের অশ্রুসজল বিদায়ের মুহূর্তটির সাক্ষী হয়ে থাকল। তখনও আমার চোখে জল ছিল

আমি গভর্নর হাউজের সামনের বিআরটিসির বাস ডিপোটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। জানতাম, ডিপোর ভিতর থেকে সরকারি বাসগুলো ছাড়লেও ডিপোর বাইরে থেকে লোকাল বাসগুলো শহরে ও শহরের আশপাশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যায়। সেখান থেকে ডেমরার বাস ছাড়ার কথা। আপাতত আমার গন্তব্য হল ডেমরা শীতলক্ষ্যা নদীর তীর। আমার ঢাকা ত্যাগের নীল-নকশাটি হচ্ছে এ রকম : সম্ভব হলে আমি বাসে করে ডেমরা পর্যন্ত যাব। বাসে না পারলে, কিছুটা পথ রিকশায় যাব, কিছুটা পায়ে হেঁটে। ডেমরায় গিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী পেরিয়ে নরসিংদী কিশোরগঞ্জ হয়ে যাব নেত্রকোণায়। নেত্রকোণা থেকে বারহাট্টা।

২৭ মার্চ আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা-শুভাড্যায় আজ ৩ এপ্রিল। আজ আমি যাচ্ছি শীতলক্ষ্যার ওপারে দেখি, শীতলক্ষ্যার শীতল জলের স্পর্শে আমার প্রাণ শীতল হয় কি না।

গতকাল নজরুল চলে গেছে। নজরুল চলে যাবার পর আমার সঙ্গী ছিল হেলাল। আজ হেলালের সঙ্গ থেকেও আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। হেলাল চলে যাবার পর প্রথমবারের মতো আমার মনে হল এই নগরীতে আমি একা। খুব একা। এই বিপন্ন-বিমুখ নগরীতে এমন একা, এমন নিঃসঙ্গ আমি আর কখনও হইনি।

নদী পথে : আমাদের ইতিহাস

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ। খুব হাস্যকর শোনাচ্ছে কি তারিখটা? হাস্যকর শোনালেও বিষয়টা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমরা এভাবে কখনও তারিখ লিখি না বটে, কিন্তু এরকম করে ভাবি। আমরা এভাবেই ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সন-তারিখগুলো মনে রাখি। ইংরেজি সনের সঙ্গে সাত যোগ করলে আমরা বাংলা সনটা পেয়ে যাই; আবার বাংলা সন থেকে সাত বিয়োগ করে ইংরেজি সনটাকে শনাক্ত করি। ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও আমাদের জীবন থেকে ইংরেজি-কালচারের অবসান তো হয়নি। বাংলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতি ভিত্তিক একটি প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বারবার রক্ত দিয়েছি। কিন্তু বাংলা ভাষা বা বাংলা পঞ্জিকাকে আমাদের রাষ্ট্রজীবনে আমরা আজও প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। বাংলা সনের প্রথম দিন, পয়লা বৈশাখকে আমরা খুব সাড়ম্বরে পালন করি। কিন্তু পয়লা বৈশাখের পরের দিন থেকে আমরা আর বাংলা পঞ্জিকার দিকে ফিরেও তাকাই না। পয়লা বৈশাখের পরের দিনটি, আমি নিশ্চিত জানি, অনেকেই বলবেন ১৫ এপ্রিল। ২রা বৈশাখ, ৩রা বৈশাখ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বাংলা তারিখকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত কবিতা বা চিঠিপত্রে রচনাকাল হিসেবে বাংলা তারিখই দেখতে পাই কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় সেই ধারাটি আর রক্ষিত হয়নি। আমি নিজেও পয়লা বৈশাখে যখন কাউকে অটোগ্রাফ দেই তখন আমি বাংলা তারিখটিই লিখি, কিন্তু কিছুদিন পরের বাংলা তারিখ আর আমারও স্মরণে থাকে না।

সেজন্যই আমি যে শুরুতে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তাতে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কারও হাসবার কারণ আছে বলে মনে করি না। বরং এভাবে বললে তাদের সুবিধেই হয়। কেননা পয়লা বৈশাখ খুব সাড়ম্বরে পালন করলেও বছরের বাকি ৩৬৪ দিনে তো তারা ইংরেজি দিনপঞ্জিই অনুসরণ করেন। অন্যকে কী বলবো? আমি নিজেই করি।

শুরুতে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের 'পয়লা বৈশাখ' র কথা মনে পড়লো এজন্যই যে, ঐদিন ভোরে ঢাকার নিকটবর্তী শীতলক্ষ্যা নদী-তীরের কিছু এলাকাজুড়ে একটি প্রলয়ঙ্করী টর্নেডো আঘাত হেনেছিল। ঐ টর্নেডোর ছোবলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ডেমরার শিল্পাঞ্চল। বেশকিছু বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ও শিল্পকারখানা টর্নেডোর প্রলয়বাতাসে সেদিন উড়ে গিয়েছিল। বেশ কিছু মানুষও মারা গিয়েছিল। ডেমরার বাওয়ানী জুট মিলের নিকটবর্তী সোনা মসজিদের ইমাম সাহেব ধসে-পড়া মসজিদের টিনের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর

মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল । রমনা পার্কের বটমূলের ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে ঢাকা থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা সেদিন ছুটে গিয়েছিল শীতলক্ষ্যার তীরে, ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত ডেমরা এলাকার বিপন্ন মানুষের মধ্যে । আমিও গিয়েছিলাম । মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী একটি টর্নেডো মানুষের জন্য কত বড় ধরনের প্রলয় নিয়ে আসতে পারে, আমি ডেমরায় তা দেখেছিলাম । প্রকৃতির খামখেয়ালির কাছে মানুষ নামক প্রাণটি যে কী অসহায়, টর্নেডোবিধ্বস্ত জনপদের দিকে তাকিয়ে সেকথাই আমার বার বার মনে পড়েছিল । সেদিন শীতলক্ষ্যার জলে ভেসে যাচ্ছিল উড়ে যাওয়া ঘরের টিনের চালা, গাছের ডালপালা ও মানুষের লাশ ।

সেখান থেকে ফিরে এসে আমি লিখেছিলাম – 'একটি পৃথিবী গ্রাম, গ্রামবাসী' কবিতাটি । কবিতাটি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রেমাংশুর রক্ত চাই এ ঠাঁই পেয়েছে আগ্রহী পাঠক কবিতাটি পড়তে পারেন । ডেমরার ওপর রচিত ঐ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের মাসিক সাহিত্যপত্র 'পরিক্রম' এ । কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঐ সাহিত্যপত্রটি সম্পাদনা করতেন । মনে পড়ে হাসান ভাই আমার কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁর আগ্রহেই কবিতাটি পরিক্রম-এ ছাপা হয় । পরে কবিতাটি যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে গ্রহণ করি তখন কবিতাটির দুটো স্তবক কীভাবে যেন বাদ পড়ে যায় । আমি নিজেই কি সচেতনভাবে ঐ স্তবক দু'টি বাদ দিয়েছিলাম? মনে করতে পারছি না । বাদ দেবার কোনো সঙ্গত কারণও খুঁজে পাচ্ছি না ।

তখন খুব এলোমেলো জীবন-যাপন করতাম আমি । করতাম মানে, করতে বাধ্য ছিলাম । তখন আমার কোনো চাকরি ছিল না । আমার থাকার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না । ভেসে বেড়াচ্ছিলাম । এক একদিন একেক জায়গায় আমাকে থাকতে হতো । এরকম অবস্থায় কবিতার পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করাটা বেশ কঠিন ছিল । আমার কিছু কবিতা তখন হারিয়েও গিয়েছে । হতে পারে যে, বর্জিত স্তবক দু'টি হয়তো পরে কবিতার সঙ্গে যুক্ত করবো ভেবে ভিন্ন কাগজে লিখেছিলাম । কবিতাটি পরিক্রমে দেয়ার সময় ঐ স্তবক দু'টি পাইনি । প্রকাশের পর কোথাও খুঁজে পেয়েছিলাম । ঐ বর্জিত স্তবক দু'টি পরে কোনো একটি লিটল ম্যাগে প্রকাশিত হয় । ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত আমার 'প্রিয় নারী, হারানো কবিতা' কাব্যগ্রন্থে ঐ বর্জিত স্তবক দু'টি আছে । 'প্রিয় নারী, হারানো কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রকাশিত বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে ও একুশের সংকলনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল । আমার আত্মজীবনী 'আমার কণ্ঠস্বর' রচনার জন্য বাংলা একাডেমীর সংগ্রহশালায় কাজ করতে গিয়ে একাডেমিতে

সংরক্ষিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন ও একুশের সংকলন ঘেঁটে আমি আমার বেশকিছু অগ্রন্থিত কবিতার সন্ধান পাই। প্রেমাংশুর রক্ত চাই কাব্যগ্রন্থে গৃহীত মূল কবিতাটিতে বাওয়ানী জুট মিলের উল্লেখ থাকলেও ডেমরার উল্লেখ নেই। কিন্তু ঐ কবিতার পরিত্যক্ত স্তবক দু'টিতেই ডেমরার উল্লেখ আছে। ডেমরা যাওয়ার পথে সেকথা মনে পড়লো।

একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী
পরিত্যক্ত অংশ

ডেমরা যেন ডোমের ঘর
পরিত্যক্ত শূকরবিহীন ফাঁকা,
হাজার চোখের এক নদী ঢেউ–
বিধুর ব্যথার অশ্রুজলে মাখা
ডেমরা যেন ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে
সকাল-বিকাল ডুকরে ওঠে কেঁদে,
প্রেতলোকের শত্রু কাঁদে
বিস্মরণের ভয়াল নির্বেদে

প্রকাশকাল ১৯৬৯

অনেক দিন পর আমি আজ আবার সেই ডেমরায় যাচ্ছি। ১৯৬৯ সালের পয়লা বৈশাখ গিয়েছিলাম সেদিনকার টর্নেডোবিধ্বস্ত ডেমরার মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কাজে অংশ নিতে। সেদিন ঢাকার মানুষ দল বেঁধে ছুটে গিয়েছিল ডেমরায়। আমার সঙ্গে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু।

পাকসেনাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে আজ ডেমরা যাচ্ছি ঢাকা থেকে নিষ্ক্রমণের পথসন্ধানে। আজ আমি একা। ডেমরা, আমাকে রক্ষা করো, বোন। আমি তো তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছি তোমার কবিকে রক্ষা করাটা তোমার কর্তব্য।

ডেমরাগামী বাসের জন্য আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ঢাকার লোকজন এবার ডেমরা দিয়ে শীতলক্ষ্যার ওপারে পালাচ্ছিল বলে বাসস্টপে যাত্রীদের বেশ ভিড় ছিল বাসগুলোও দ্রুত ভরে যাচ্ছিল যাত্রীতে। আমি একটা লক্কর মার্কা বাসে ঢুকে সিটে বসার সুযোগও পেয়ে গেলাম। চলন্ত বাসের ভিতরে বসে আমি ডেমরার ছবিটা চোখে আনতে চেষ্টা করলাম। এই পথে আমি আগে কখনও কোথাও যাইনি শীতলক্ষ্যা নদী পেরিয়ে ঐ পথে যে নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণায় যাওয়া যায়, তা আমার জানাই ছিল না। পাকবাহিনীর তাড়া না খেলে, ঐ পথের সন্ধান

হয়তো আমি কখনই পেতাম না। পাকসেনাদের অত্যাচারের একটা সুফল ছিল এই যে, বাংলাদেশের মানচিত্র-উদাসীন মানুষ একাত্তরে দেশটাকে কিছুটা হলেও চিনেছিল।

পাকসেনাদের ধন্যবাদ যে, বুড়িগঙ্গা নদীলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শীতলক্ষ্যা নদীতে গানবোটের পাহারা বসায়নি। ডেমরায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর যে ফেরিঘাটটি আছে, সেটি যদি ওরা বন্ধ করে দিতো, বা সেখানে যদি পাকসেনারা পাহারায় থাকতো তাহলে আমাদের পক্ষে ঐ পথে ঢাকা ছাড়ার সাহসই হতো না। তারপরও ভয় ছিল, হঠাৎ যদি পাকসেনারা ঐ পথটা বন্ধ করে দেয়। বাস থেকে নেমে যদি আমরা ওদের সামনে পড়ে যাই? যদি ফেইস টু ফেইস উইথ ম্যান ইটিং টাইগারের অবস্থা হয়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লক্কড়মার্কা (ভারতীয় জিনিসপত্রের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি করতে মওলানা ভাসানী এই শব্দটিকে খুব জনপ্রিয় করেছিলেন) বাসটি এসে থামল একেবারে ডেমরা ফেরি ঘাটের গা ঘেঁষে।

আমি যখন ডেমরায় পৌঁছলাম তখন দুপুর। আমার 'হুলিয়া' কবিতায় বর্ণিত মধুময় চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরটির মতো। চতুর্দিকে চিক চিক করছে রোদ, শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। কিন্তু অনেক বদলে গেছে ডেমরা, তা বলা যাবে না। বছর দুয়েক আগে ডেমরাকে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, মনে হল ডেমরা অনেকটা সেরকমই আছে। 'ছিচকাঁদুনে মেয়ে' ডেমরার চোখের গোপন অশ্রুধারা নিয়ে বয়ে চলেছে শীতলক্ষ্যা নদী। কী চমৎকার নাম নদীটির আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কবি ছিলেন, বাংলাদেশের নদী ও গ্রামের নামকরণ থেকে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

নদীর এপারের হোটেলগুলোতে ক্ষুধার্ত মানুষজনের ভিড়। সবাই দ্রুত কিছু খাদ্য পেটে পুরে নিচ্ছে। ক্ষুধার্ত হলেও তাদের মধ্যে খাওয়ার তাড়াটা যেন মুখ্য নয়, নদীর ওপারে যাবার তাড়াটাই বেশি। ওপার থেকে এপারে মানুষজন আসছে না খুব একটা। শীতলক্ষ্যার ওপারে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ফেরিগুলো যখন এপারে ফিরছে, তখন দেখছি সেগুলো অনেকটাই ফাঁকা।

আমি 'যা থাকে কপালে' বলে একটি নামগোত্রহীন হোটেলে ঢুকলাম। তারপর শীতলক্ষ্যা নদীর তাজা গুলসা মাছের গরম ঝোল ও গরম ভাত দিয়ে অনেকদিন পর পেট ভরে খেলাম। বেলাল বেগ ভাইয়ের (তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়) হাত দিয়ে পাঠানো মোমিনুল হক ভাইয়ের টাকাটা আমাকে পেট পুরে মাছ-ভাত খেতে খুব অনুপ্রাণিত করল। আবার কখন খাওয়ার সুযোগ হবে কে জানে? শুধু পকেটে টাকা থাকলে তো হবে না, খাওয়ার মতো হোটেলও তো থাকতে হবে। পেট পুরে ভাত খাওয়ার পর এক প্যাক ক্যাপস্টান সিগারেটও

কিনলাম। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির প্রাণ মাতালো সুগন্ধে এলাকাটা মৌ মৌ করে উঠল। মনে মনে বললাম, আহ্ কী চমৎকার এই মনুষ্যজীবন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, তিনি দুপুরের ভাত খান, ভাত খাওয়ার আনন্দ লাভের জন্য নয়, খাওয়ার পর সিগারেট খাওয়ার আনন্দটাকে প্রাণ ভরে উপভোগ করার জন্য। বুদ্ধদেব বসুর কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি করলাম প্রতি টানে। মনে মনে স্থির করলাম, যদি কখনও পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়ি, যদি ওরা আমার শেষ ইচ্ছা জানতে চায়, তাহলে আমি তাদের কাছে এক থালা গরম ভাত, কৈ বা মাগুর মাছের গরম ঝোল, এক বাটি মসুরের ডাল ও সব শেষে একটা সিগারেট খাওয়ার অনুমতি চাইবো। গরম ভাত, মাছের ঝোল, মসুরের ডাল ও সিগারেট এই চারটির মধ্যে যদি তারা আমাকে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলে, তাহলে আমি চাইবো সিগারেট। হ্যাঁ, তখন সিগারেট আমার কাছে এতোটাই প্রিয় ছিল পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে, ২৭ মার্চ দুপুরে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গার ওপারে পালিয়ে যাবার আগে আমি আজিমপুরের চায়না বিল্ডিংয়ের সামনের একটি দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে এক প্যাকেট থ্রি ক্যাসেল সিগারেট কিনেছিলাম। তখন আমার পকেটে দশ বারো টাকার বেশি ছিল না।

সিগারেটে সুখ টান দিয়ে, জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ অংশটাকে মাটিতে ফেলে পায়ের স্যান্ডল দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিয়ে যখন ফেরিতে উঠবো বলে মন স্থির করেছি, তখন হঠাৎ দেখি সাইফুল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সাইফুল পিপল পত্রিকায় আমার সহকর্মী। আমার মতোই সাইফুলও পিপলের সাব-এডিটর। অনেকটা সময় একা কাটানোর পর পথে সাইফুলকে পেয়ে আমি তাকে আনন্দে সর্বশক্তি দিয়ে আমার বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ছাড়ো ছাড়ো বলে চিৎকার করলেও আমি সাইফুলকে সহজে ছাড়লাম না। বললাম, একদম কোনো কথা বলবা না, আমাকে আমাদের বেঁচে থাকাটা এনজয় করতে দাও।

আমাদের কাণ্ড দেখে লোকজন খুব মজা পেলো। তারা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। যারা আমাদের দেখে খুব মজা পাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সাইফুলের বোন, ভগ্নিপতি ও ওর বোনের দুটো তুলতুলে ভাগনিও ছিল। ওদের আমি আগে থেকেই চিনতাম। সাইফুল আমাকে একদিন ওদের পলাশীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। ওরা থাকতো বিটিপি হাউসে। সাইফুলের ভগ্নিপতি কী একটা বিদেশী ফার্মে কাজ করেন। চমৎকার সুদর্শন মানুষ। সাইফুলের বোনটিও ভারী সুন্দরী। ওদের বাচ্চা দু'টিও তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করেই জন্মেছে।

যে ট্রাকটা ফেরীতে উঠানো হচ্ছিল, সাইফুল বললো, ওটা আমরাই ঢাকা থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছি। ঐ ট্রাক নিয়েই আমরা নরসিংদি হয়ে কিশোরগঞ্জ যাবো তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমার একাকিত্ব কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো। নদী পার হওয়ার পর কীভাবে নরসিংদি পর্যন্ত যাবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না, তখন আকাশ থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার জন্য সারথীসহ স্বর্গের রথ পাঠালেন। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেলো। ভাবলাম আমি যদি ডেমরার স্মৃতির টানে কালক্ষেপণ না করে আগের ফেরীটিতে নদী পেরিয়ে যেতাম, তাহলে সাইফুলের সঙ্গে আমার দেখাই হতো না। মনে হল ডেমরা তার স্মৃতিকাব্যে আটকে রেখে সাইফুলের সঙ্গে খুব কায়দা করে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছে এখন আর আমার মনে যাত্রাপথের কোনো ভয় নেই। কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ওদের সঙ্গে চলে যাওয়া যাবে।

সাইফুলের বড় ভাগনিটির বয়স তখন পাঁচ ছয় হবে। ছোটটি তখনও মায়ের কোলে। আমি বড়টিকে আমার কাঁধে তুলে নিয়ে ফেরীতে উঠলাম আগে থেকেই আমাকে চিনতো বলে মেয়েটি আমার কাঁধে চড়তে একটুও আপত্তি করলো না বরং ব্যাপারটাতে সে খুব মজা পেলো মনে হল কারও কাঁধে চড়তে পারায় মজা পাওয়াটা মেয়েদের বেলায় হয়তো কিছুটা মজ্জাগতই হবে।

ওর মা অবশ্য মেয়েকে বললো– 'মামাকে কষ্ট দিচ্ছো, দুষ্টু মেয়ে। উনার কাঁধ থেকে নামো।' কিন্তু মেয়েটি তার মায়ের কথা শুনলে তো।

আমাদের ট্রাকটি ছাড়াও আরও কিছু গাড়ি ও ট্রাক উঠানো হল ঐ ফেরীতে। ফেরীতে উঠে সে আমার কাঁধ থেকে নামলো। নামলো আমার স্কন্ধের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় শীতলক্ষ্যার জলটা আসলেই শীতল কিনা, তা নিজের হাতে ছুঁয়ে পরখ করে দেখতে। আমাদের নিয়ে ফেরীটি চলতে শুরু করলো ওপারের উদ্দেশে।

'আমাদের কাছে কোনো কেয়াপাতা ছিল না
আমরা ভালোবাসার নৌকা ভাসিয়েছিলাম নদীতে।
হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের দোলায়
দুলতে দুলতে বুড়িগঙ্গা থেকে শীতলক্ষ্যা—;
শীতলক্ষ্যা থেকে পদ্মা-মেঘনা হয়ে
সে ছুটে গিয়েছিল নদীর চূড়ান্ত লক্ষ্য, সমুদ্রে

ভদ্রে, তোমার কি মনে পড়ে না সেই
ভেঁপুর আওয়াজে বধির রাত্রিগুলি?

দেখতে দেখতে সময় গিয়েছে চলে,
তুমি পরিণীতা, উড়ে গেছো, গীতপাখি।
বিরহে তোমার স্বাধীন হয়েছে দেশ।
ভালোবাসা পেলে কে আর স্বাধীন হতো?'

(নদীপথে : আমাদের ইতিহাস ধাবমান হরিণের দ্যুতি)

২

'তোমার ভূমিকা মানি, স্বাধীনতা যুদ্ধে যেরকম
বাংলাদেশে নদীর ভূমিকা চিরায়ত।

ভালোবাসা আল ভঙ্গে কোনসেচা জলে,
অন্যকে প্লাবিত করে বাঁচায়, বাড়ায়, খেলে-
প্রসারিত করে তার ক্রীড়াযোগ্য ভূমি।
তখন জাগ্রত চরে ভালোবেসে মুখ তোলো তুমি।'

(এক দুপুরের স্বপ্ন : চৈত্রের ভালোবাসা)

নদী তো শুধু ভাঙেই না, গড়েও। নদীর এপার ভাঙে, ওপার গড়ে — এই তো নদীর খেলা। সমুদ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত বাংলাদেশের নদ-নদী ও হাওর বাঁওড়ের নিত্যচিত্র যারা কাছে থেকে দেখেননি, তারা এই বঙ্গীয় বদ্বীপের অপার সৌন্দর্যের অনেকটাই দেখেননি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে পদ্মা-যমুনার সঙ্গমভূমির কবি, পল্লীকবির সম্মানে ভূষিত জসীম উদদীন আমাদের নদ-নদীগুলিকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ভালোবাসার কামনামিশানো চোখ দিয়ে দেখেছিলেন। তাই প্লাবনের পলি জমতে জমতে নদীতে জেগে ওঠা নতুন চরের মধ্যে তাঁর হারানো-প্রেয়সীর মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন এরকম একটি বিস্ময়জাগানিয়া কাব্যপঙক্তি— 'কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মতো।'

'তখন জাগ্রত চরে ভালোবেসে মুখ তোলো তুমি।'—এই চিত্রনির্মাণে অন্তরাল থেকে পল্লীকবির ঐ-প্রবাদপঙক্তিটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। মজার ব্যাপার হল, ১৯৭৪ সালে আমি যখন এই কবিতাটি লিখি, কবি জসীমউদদীন তখনও বেঁচে ছিলেন। বাংলাবাজারে মাওলা ব্রাদার্সের বুক কাউন্টারে তাঁর সঙ্গে আকস্মিকভাবে আমার দেখা হলে, আমাকে তিনি তাঁর কমলাপুরের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য একটি সাহিত্যবাসরে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন কাঁপা-কাঁপা হাতে আমার নাম লিখে তিনি তাঁর 'সুচয়নী' কাব্যসঞ্চয়নটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমিও আমার প্রিয় কবিকে সেদিন আমার সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' উপহার দিয়েছিলাম বলেছিলাম, আমি আপনার কবিতা দ্বারা প্রভাবিত কবিদের একজন কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করেননি। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসেছিলেন। ১৯৭৫ সালের জুনে প্রকাশিত হয় আমার 'চৈত্রের ভালোবাসা' কাব্যগ্রন্থটি। 'এক দুপুরের স্বপ্ন' ঐ গ্রন্থেরই একটি কবিতা। আমার কর্তব্য ছিল, ঐ কবিতাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ

কাব্যগ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দেয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্ট ভয়াল ভাঙনের কারণেই এর পর কবির সঙ্গে আমার আর দেখা করা হয়ে ওঠেনি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হই। অল্পদিনের ব্যবধানে, ১৩ মার্চ ১৯৭৬ কবি জসীম উদদীন মারা যান।

কে জানে মৃতেরা হয়তো জীবিতের লেখা ঠিকই পড়তে পারেন। তাদের কথা শুনতে পান। আমাদের ভাষা তাদের অতীতজীবন থেকে জানা বলে বুঝতেও পারেন হয়তো বলতেও পারেন। কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে মৃত্যুজগতের কোনো ছাপ নেই বলে আমরা হয়তো তাদের বলাটা বুঝতে পারি না। তারা হয়তো নদীর স্রোতের ভাষায় কথা বলেন; পাখির গানের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের ভিতর দিয়ে তারা হয়তো বর্ষার বৃষ্টি ও শীতের দিনের প্রিয় রোদের ভাষায় কথা বলেন। হে প্রিয় অগ্রজ কবি, আজ আমি আপনাকে স্মরণ করছি। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ২ এপ্রিল ঢাকায় ফিরে, পরদিন ৩ এপ্রিলের দ্বিপ্রহরে যখন শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ি দেয়ার ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করছি, তখন নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর দিকে আমার চোখ ও মন নিবদ্ধ হয়। আমাদের নদ-নদীগুলোর জীবনী জানার জন্য আমি খুব আগ্রহী হয়ে উঠি, অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর আজিজ মার্কেটের বই পত্র থেকে প্রয়াত মীজানুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ প্রায় সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার নদী সংখ্যাটি সংগ্রহ করি। মনে পড়ছে, এই সংখ্যাটি প্রকাশের সময় (১৯৯৯-২০০০) মীজানুর রহমান সাহেব আমার কাছে নদী বিষয়ক লেখা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে তখন কোনো লেখা দিতে পারিনি। নদী সম্পর্কে আমার তখন আগ্রহের কিছুটা ঘাটতিও ছিল। ভাবিনি যে, তাঁর পরিকল্পিত ঐ নদী সংখ্যাটি ভবিষ্যতে কোনোদিন আমার 'আত্মকথা ১৯৭১' রচনায় এভাবে কাজে লাগবে। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী-গ্রন্থ সম্পাদনা করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নদী-প্রেমিক মরহুম মীজানুর রহমানের প্রতি আমি আজ গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। হয়তো তাঁর সুসম্পাদিত নদীগ্রন্থ থেকে খুব বেশি তথ্য আমি আমার রচনায় ব্যবহার করবো না, কিন্তু আমাদের দেশের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদ নদীগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, গতিপথ ও কাণ্ডকীর্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য তাঁর সম্পাদিত নদী-গ্রন্থটি আমার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। আমাদের দেশের নদ-নদীগুলোর মধ্যকার মিলন-বিরহ গাথা যে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের মহাকাব্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ, মীজানুর রহমান সাহেব তাঁর সম্পাদিত নদী-সংখ্যায় যেন এই সত্যটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে তাঁর সম্পাদিত নদী-

সংখ্যাটি শুধু বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে আমাদের ভূগোল-তৃষ্ণা নিবারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। বাংলা ভাষার বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা থেকে আহরিত নদীসংক্রান্ত অনুভবকেও তিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে নদীজল জালে জুড়ে দিয়েছেন, যা থেকে এরকম ধারণা পাঠকচিত্তে সংক্রমিত হয় যে, এই ভূখণ্ডের মানুষ ও নদ নদীগুলি যেন যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে একই মহাসাগরের ডাকে, একই মহাসিন্ধুর সন্ধানে

১৯৮২ সালে আমার সোভিয়েত ভ্রমণকালে রাশিয়ার বিখ্যাত নদী ভলগা দর্শনের অব্যবহিত পর আমি একটি কবিতায় লিখেছিলাম, ... 'যখন সে নদী, তখন ভলগা; যখন মানুষ, তখন লেনিন।' যদিও লেনিনের শৈশব কেটেছে ভলগার তীরে, তবু তিনি তাঁর লেনিন ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন লেনা নদী থেকে। তাতে বোঝা যায়, মহামতি লেনিন নদীকে কোন চোখে দেখতেন। নদী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধিও কম আকর্ষক ছিল না। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' এই শ্লোগানটিকে তিনি আমাদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাবিকাশের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন জনসভায় আমি যখন ঐ শ্লোগানটি তাঁর কণ্ঠে শুনতাম, যখন তিনি তাঁর দরাজ বজ্রকণ্ঠে আমাদের প্রাণপ্রিয় নদীগুলোর নাম উচ্চারণ করতেন, তখন আমার মনে হতো, তিনিই আমাদের মেঘনা, তিনিই আমাদের পদ্মা, তিনিই যমুনা। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে পাকসেনাদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো।' তখন আমার মনে হয়েছিল, আমাদের তরঙ্গিত নদ নদীগুলোর ওপর দিয়ে তিনি পালতোলা নৌকার মতো তাঁর কৃতজ্ঞ-মুগ্ধ চোখ দু'টি বুলিয়ে গেলেন। গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাতিকে তৈরি হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তিনি যেন আমাদের এই অভয়বাণীটিও শুনিয়ে গেলেন যে, আমরা একা নই, আমাদের আছে নদী। অসংখ্য নদ-নদী। এটা পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব নয়, এটা হচ্ছে হাজার নদ-নদীর দেশ, বাংলাদেশ। সুতরাং তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা—'পানিতে মারবো' কথাটার মধ্যে একটা বাস্তবসম্মত গেরিলা-রণকৌশলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বলেই মনে করি।

শুরুতে উদ্ধৃত আমার 'এক দুপুরের স্বপ্ন' কবিতার মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর চিরায়ত ভূমিকাকে আমি সে-আলোকেই স্বীকৃতি দিয়েছি। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ত্বরান্বিত না হলে, আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের নদ-নদীগুলোর আনুকূল্য নিয়ে, কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশে হানাদার পাকসেনাদের সলিল সমাধি আমরা ঠিকই রচনা করতে পারতাম। পাকসেনাদের দ্রুত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত

গ্রহণের পেছনে আমাদের দেশের অসংখ্য নদ-নদীরগুলিরও যে একটা বড় ভূমিকা ছিল না, তাই বা বলি কেমন করে? ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনারা শুধু মিত্রবাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেনি, আমাদের রুদ্রচণ্ডী নদ নদীগুলির কাছেও তারা-সেদিন আত্মসমর্পণ করেছিল। সুতরাং হে বঙ্গদেশীয় নদ-নদীগণ, আপনারা আমার প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করুন।

> মীজানুর রহমান সম্পাদিত নদী সংখ্যাটিতে কবি-গবেষক দীপঙ্কর গৌতম প্রদত্ত তথ্যে আমার একটি ভুল বা অস্পষ্ট ধারণার অবসান হয়েছে। তথ্যটি হচ্ছে— নবাব সিরাজের মাতা আমিনা বেগম ও তাঁর বড় খালা কুচক্রী ঘষেটি বেগমের মৃত্যু সম্পর্কিত। আমার ধারণা ছিল, আন্দাজ করে লিখেওছিলাম যে, বুড়িগঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারার আগে আমিনা বেগম ও ঘষেটি বেগমকে লালবাগের কেল্লায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের জীবনী থেকে আমি শুধু বুড়িগঙ্গার জলে তাদের ডুবিয়ে মারার তথ্যটিই পেয়েছিলাম, তাদের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, কার নির্দেশে তাদের জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তা জানতে পারিনি। দীপঙ্কর গৌতম জানাচ্ছেন...' ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলে মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মুহম্মদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। সিরাজকে হত্যা করার পর সিরাজের মা আমিনা বেগম এবং খালা ঘষেটি বেগমকে জিঞ্জিরার একটি প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মীরনের নির্দেশে একদিন তাদের নৌকায় তুলে এনে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। সে করুণ আর্ত চিৎকার ও আহাজারি আজও 'শূন্যতায় শোকসভা' করে চলে বুড়িগঙ্গা তার শীর্ণকায় বিমূর্ত বিলাপে।'
>
> (দ্রঃ মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার নদী সংখ্যা- ৩৩১পৃ.)

৩

'ভাসতে ভাসতে শীতলক্ষ্যা, ভাসতে ভাসতে পদ্মা,
পদ্মা থেকে ভাসতে ভাসতে একটানা এক নদী।
ভাসতে ভাসতে ভালোবাসা, ভাসতে ভাসতে দোলা,
একটি মাত্র নৌকা আমার ভাসতে ভাসতে যায়।'

(কৃষ্ণচূড়াঞ্জলি চৈত্রের ভালোবাসা)

শীতলক্ষ্যা আমার খুব প্রিয় নদী। আমাকে এই নদীটি চিনিয়েছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু পূরবী। পূরবীর বাড়ি 'ধলেশ্বরী নদী-তীরে', মুন্সীগঞ্জে নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে আমি পূরবীর সঙ্গে অনেকবার মুন্সীগঞ্জে গিয়েছি। গেলে ফিরতে হয় বলে একই জলপথে অনেকবার ফিরেছিও। খুব মনে পড়ে, একবার গহনা-নৌকায় চড়ে ধলেশ্বরী শীতলক্ষ্যায় ভেসে আমরা মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে ফিরেছিলাম দিনটি ছিল খুব বৃষ্টিমুখর আকাশে ছিল কালো মেঘের ভেলা। নদীতে জলের কল্লোল।

আমার 'তুমি চলে যাচ্ছো' কবিতাটি ছিল সেই সুন্দরীতমা শীতলক্ষ্যা ও রুদ্র ধলেশ্বরীর জল দিয়ে লেখা

অনেকদিন পর আমি আবার আমার প্রিয় নদী শীতলক্ষ্যার জলে চোখ রাখলাম। কী ভালোই না লাগলো আমার। এই নদীর জল একই সঙ্গে শীতল এবং এই নদী লক্ষীমন্ত চরিত্রের বলেই না তার ভাগ্যে এমন সুন্দর নামটি জুটেছে। এটা যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয়, এ-নদীর ইতিহাসই তা সাক্ষ্য দেয়। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে বেরিয়ে ১০৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শীতলক্ষ্যা মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিলেছে। ড. করুণাময় গোস্বামীর বরাত দিয়ে মীজানুর রহমান তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নদী সংখ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, ইংরেজ আমলের নথিপত্রে শীতলক্ষ্যাকে ঢাকা জেলার সুন্দরীতমা নদী হিসেবে অভ্যায়িত করা হতো। তখন এই নদীর জলের এমনই সুনাম ছিল যে, একটি ব্রিটিশ কোম্পানি এই নদীর জল দিয়ে সোডা-ওয়াটার বানাতো। কোম্পানিটির নাম ছিল ডেভিড কোম্পানি। ঐ ডেভিড কোম্পানির তৈরি করা সোডা ওয়াটারের বোতলের গায়ে লেখা থাকতো- 'মেড বাই শীতলক্ষ্যা ওয়াটার।' শীতলক্ষ্যার জল সম্পর্কে এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে?

সম্প্রতি বুড়িগঙ্গার মতো শীতলক্ষ্যার জলও তার পূর্বের সুনাম হারিয়েছে। ১৯৭১ সালেও শীতলক্ষ্যার হাল এমন ছিল না। শীতলক্ষ্যা তখনও মানুষকে তার শান্ত শীতল জলে দেহপ্রাণ জুড়ানোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকতো। প্ররোচিত করতো জলখেলায়। মনে পড়লো, ১৯৬১ সালে আমরা যখন প্রথমবারের মতো ঢাকা ভ্রমণে আসি, তখন আমরা নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড রোডের একটি হোসিয়ারি দোকানে উঠেছিলাম। দীর্ঘ ভ্রমণের সঙ্গে রাতের অনিদ্রা যুক্ত হওয়ায় আমার শরীর মন ছিল খুবই ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়ি আমি। কিন্তু কী আশ্চর্য! পরদিন ভোরে শীতলক্ষ্যার স্বচ্ছ-শীতল জলে প্রাণ ভরে সাঁতার কাটার পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। শীতলক্ষ্যার ঘাটে সিনানরতা টানবাজারের রমণীরাও যে সেদিন আমাকে তাদের সঙ্গসুধাদানে ধন্য করেছিল, তার মূল্যকেও আমি কখনও খাটো করে দেখি না।

সাইফুলের ভাগনিটি সেদিন যে শীতলক্ষ্যার জলে গোসল করার জন্য বায়না ধরেছিল, তাও অকারণে নয়। আমার নিজেরই খুব ইচ্ছে করছিল, ঐ মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ফেরী থেকে শীতলক্ষ্যার জলে লাফিয়ে পড়ি। ১৯৬১ সালে একবার নেমেছিলাম। তারপর থেকে পাগলচোখে শীতলক্ষ্যার জল শুধু দেখেই এসেছি, তার জলে কখনও নামিনি। আজও তার জলে আমার নামা হল না।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে পৌঁছার পর আমরা যখন নারায়ণগঞ্জের মাটি স্পর্শ করলাম, মনে হল এবার আমরা একটি বিস্তৃত মুক্ত-এলাকার ভিতরে প্রবেশ করেছি। আপাতত আমাদের মধ্যে পাকসেনার ভয়টা আর নেই। এখন থেকে আমরা পাকসেনাদের আওতা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবো। আমাদের সামনে এখন দিগন্ত বিস্তৃত মুক্ত-প্রান্তর। আহ্! কী আনন্দ। কী স্বস্তি!

ফেরীতে সাইফুলের সঙ্গে ২৫ মার্চের রাত নিয়ে আমার অনেক কথা হয়। সাইফুল জানায়, ২৫ মার্চে নাইট শিফটে তারও ডিউটি ছিল, কিন্তু আমার মতোই সে-ও ঐ রাতে পিপল পত্রিকার অফিসে যায়নি। ওর বোন ও ভগ্নিপতি ওকে যেতে দেয়নি। ফলে সাইফুল বেঁচে গিয়েছে। ঢাকায় আর্মি ক্র্যাকডাউন হলে পিপল পত্রিকার অফিসটি যে পাকসেনাদের টার্গেট হবেই– এই বিষয়টি প্রায় অনেকেরই জানা ছিল। কয়েকজন প্রেস-কর্মচারী ও পিয়ন মারা গেলেও কোনো সাংবাদিক বা পিপলের কোনো কর্মকর্তা ২৫ মার্চের রাতে মারা যায়নি, এই তথ্যটি আমার কাছ থেকে জেনে সাইফুল নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করার পাশাপাশি কিছুটা স্বস্তিও প্রকাশ করে। সাইফুল জানতো, আমি নাইট শিফট করতে খুব ভালোবাসি। আমার ডে-অফ (আমার বেলায় নাইট-অফ) থাকলেও আমি পারতপক্ষে ঐ কর্মবিরতি এনজয় করতাম না। অফিসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। গভীর রাতের আড্ডার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। তাই সাইফুলের ধারণা ছিল আমি নিশ্চয়ই সেই রাতে অফিসে গিয়েছি এবং দি পিপল অফিসের অনেকের সঙ্গে আমারও নির্ঘাৎ মৃত্যু হয়েছে। ওর ধারণাটা মোটেও অসঙ্গত নয়। ঐ রাতে আমার সত্যিই বাঁচার কথা ছিল না। আমার বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ কীভাবে সেই রাতে আমাকে এ্যালিফেন্ট রোড থেকে আমার আজিমপুর নিউ পল্টনের মেসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, সাইফুলকে সেই ঘটনাটি বলি। ঘটনাটি আমি সুযোগ পেলেই রসিয়ে রসিয়ে বলি। ঘটনাটি বলতে আমার খুব ভালো লাগে। ওটা হচ্ছে ২৫ মার্চের রাতে আমার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার গল্প। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, সুযোগ পেলেই গল্পটি আমি বলবো। আমারটির মতো না হলেও, সাইফুলের বেঁচে যাওয়ার গল্পটিও আমার কাছে কিছুটা অলৌকিক বলেই মনে হল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে বাংলাদেশ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মোজাম্মেল হোসেন, যিনি ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চ লাইট' বাস্তবায়নকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকসেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের মধ্যকার ওয়ারলেস-কথোপকথন টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছিলেন– সেখানে দি পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়ার পরমুহূর্তের একটি রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় তিনি লিখছেন– 'ধীরস্থির গলায় হুকুম দিচ্ছিলো কমান্ডার এতটুকু উত্তেজনা ছিল না কণ্ঠস্বরে। পরে জেনেছিলাম, ঐ গলা ছিল ব্রিগেডিয়ার আবরার খানের (আবরার?)। ঐ গলায় আলাপে বিভিন্ন টার্গেট দখলের খবর দিচ্ছিলেন, সবাইকে জানাচ্ছিলেন যে, দৈনিক পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কী সাংঘাতিক ক্রোধ ছিল পিপল পত্রিকাটির ওপর, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করেছে পিপল পত্রিকার অফিসের ওপর পাকসেনারা। এটি ছিল ২৬ নম্বর ইউনিট। পরে জেনেছি, এর 'ইমাম' ছিল কর্নেল তাজ। যার হেড কোয়ার্টার প্রেসিডেন্ট হাউস।'

> 'এই ২৬ নম্বর ইউনিট হত্যা করেছে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে। বলেছে তাকে ধরতে যাওয়া হয়েছিল, বাধা দেয়ায় নিহত হয়েছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে জীপের পেছনে দড়িতে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মৃতদেহ এই ২৬ নম্বর ইউনিট আক্রমণ করেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। সবচেয়ে উল্লাস ছিল এই ২৬ নং ইউনিটেরই। তার বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে কর্নেল তাজকে করা হয়েছিল ডিএসএএমএল– ডেপুটি সাব এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মার্শাল ল। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিলো কন্ট্রোল বলছে, দ্যাট ইজ অলি গুড। দ্যাট ইজ এক্সেলেন্ট বা হি ইজ ইউজিং এভরিথিং হি হ্যাজ গট।
> সেই এভরিথিং-এ ছিল ট্যাংক, রিকয়েললেস রাইফেল, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি '
>
> (বা. স্বা.যু. দ.প.: ৮ম খণ্ড: পৃ: ৩৫৪)

ট্রাকের পাটাতনে বিছানার চাদর বিছিয়ে, তাতে আরাম করে বসে আমি জিঞ্জিরা জেনোসাইডের ঘটনাটি সাইফুল, ওর বোন ও ভগ্নিপতির কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করছিলাম। সাইফুলের বেঁচে যাওয়ার চেয়ে আমার বেঁচে যাওয়ার মধ্যে যে একটা বড় রকমের হিরোইজম আছে, আমার গল্প বলার মধ্যে সেই সত্যটাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ছিল। ফলে আমার প্রতিটি কথা সবাই পিনপতন নীরবতার মধ্যে শুনছিল

আমরা ছাড়াও ঐ ট্রাকে সেদিন আরও কিছু অচেনা মানুষজন ছিল। ঢাকা থেকে পালিয়ে তারাও নরসিংদির দিকে যাচ্ছিল। শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে অন্য কোনো

যানবাহন না পেয়ে তারা আমাদের ট্রাকেই সওয়ার হয়। তাদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল আমার মতোই জিঞ্জিরা জেনোসাইড থেকে বেঁচে যাওয়া। পরিবারের সদস্য তিনজন। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একটি কিশোরী-কন্যা। ওরা ট্রাকের এক কোণে বসে আমার মুখে জিঞ্জিরা হত্যাকান্ডের বর্ণনা শুনছিল। আমার ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে মহিলাটি হঠাৎ হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিলো। সে কী কান্না!

সাইফুলের ভাগনিটি মহিলার বুকফাটা করুণ কান্না শুনে, ভয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। মাথায় হাত বুলিয়ে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে মহিলার স্বামী আমাদের জানালেন যে, ওরা যখন জিঞ্জিরায় গিয়েছিল তখন তাদের সঙ্গে ছিল তাঁর এক শ্যালক। শ্যালকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুবক। ২ এপ্রিল ভোরে পাকসেনাদের আচমকা আক্রমণের মুখে ওরা তাদের অস্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, তখন ঐ যুবক তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাকসেনাদের আট-নয় ঘণ্টাস্থায়ী সামরিক অভিযান শেষ হলে জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জিঞ্জিরার পথে-ঘাটে ও বনবাদাড়ে অনেক খুঁজেও তারা আর ঐ ছেলেটির দেখা পায়নি। সেই থেকে ঐ যুবক নিখোঁজ। রাস্তা ঘাটে মরে পড়ে থাকা মরদেহ বা অর্ধমৃত অবস্থায় কাতরাতে থাকা অনেক মানুষজনকে তারা কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু তাকে কোথাও তারা পায়নি। ভগ্নিপতিটির ধারণা, তার শ্যালকটি বেঁচে আছে। কিন্তু তার স্ত্রীকে কিছুতেই সেকথা সে বুঝাতে পারছে না। স্ত্রীটি তার ভাইয়ের জন্য থেকে থেকেই কেঁদে চলেছে। বোনের ধারণা তার ভাইটি বেঁচে নেই। জিঞ্জিরার পথে-ঘাটে বা বনে-বাদাড়ে কোথাও নিশ্চয়ই মরে পড়ে আছে। সব মৃতের মুখ তো আর তারা উল্টেপাল্টে দেখেনি।

ভাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যুবক-বয়সী বলে বোনের সন্দেহটাকে অমূলক বলে আমিও উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তবুও ক্রন্দনরত বোনটিকে মিথ্যে অভয় দিয়ে বললাম,. .' কিছু ভাববেন না, আপনার ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ও হয়তো আপনাদের আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

আমার শেষের কথাটাই ছিল বোনটিরও শেষ-ভরসা। আমার মুখে তার সেই শেষ-ভরসার প্রতিধ্বনি শুনে মনে হল বোনটি যেন নতুন করে আশায় বুক বাঁধলো। এতোক্ষণ টানা ঘোমটার মেঘের আড়ালে মেয়েটি ওর চাঁদপনা মুখটিকে লুকিয়ে রেখেছিল, এবার মুখ থেকে সমস্ত লজ্জা মুছে ফেলে, ঘোমটা সরিয়ে মেয়েটি তার ডাগর চোখ দুটি মেলে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালো। মনে হল সে যেন আমার মুখের মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া ভাইটিকে খুঁজছে। মুখ ফুটে বলতে না পারলেও মনে-মনে বলছে, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনার কথা সত্য হোক। আমিও চাই আমার কথা সত্য হোক।

সন্ধ্যার দিকে নরসিংদি বাজারে পৌঁছে আমরা সেখানেই রাত্রিযাপনের কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু নরসিংদির স্থানীয় লোকজনই আমাদের বললো যে আমাদের নিজেদের ট্রাক যখন রয়েছে, তখন নরসিংদিতে রাত্রিযাপন না করে কিশোরগঞ্জের পথে যতটা সম্ভব অগ্রসর হয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। পাকসেনারা তখন নরসিংদিতে আসবে আসবে করছে। কখন এসে পড়বে, কে বলতে পারে? নরসিংদির আকাশে নাকি দিনের বেলায় টহল দিয়ে গেছে পাকবিমান বাহিনীর বিমান। যেকোনো সময় পাকসেনারা নরসিংদিতে চলে আসতে পারে। বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে পাকসেনাদের জিঞ্জিরায় গণহত্যা চালানোর খবরটি জানার পর থেকে নরসিংদির মানুষজনও নরসিংদি থেকে দূরে পালাচ্ছিল। তাই মুক্ত অঞ্চল হলেও নরসিংদির মানুষজনের চোখে-মুখে স্বাভাবিক আনন্দ-উল্লাস ছিল অনুপস্থিত।

অগত্যা নরসিংদিতে নিশিযাপনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, একটি ছোট্ট পরিচ্ছন্ন হোটেলে পেট পুরে ভাত খেয়ে আমরা সারা রাজ্যের অন্ধকার সামনে নিয়ে রওয়ানা দিলাম শিবপুরের পথে–, মনোহরদির উদ্দেশে। নরসিংদি থেকে মনোহরদি মাইল বিশেক পথ। আজকের বিশ মাইল নয়, ১৯৭১ সালের বিশ মাইল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাঙা কাঁচা রাস্তা। তবে মনোহরদি পর্যন্ত আমাদের আর কোনো নদী পেরোতে হবে না।

জিঞ্জিরায় প্রিয়জন হারিয়ে আসা পরিবারটি আমাদের ট্রাক থেকে নরসিংদিতে নেমে গেলো। ওরা যাবে রায়পুরা ওদের পথ ভিন্ন। ওরা যাবে নরসিংদি থেকে পুব দিকে, আর আমরা সোজা উত্তরে। শিবপুর হয়ে মনোহরদি।

সাইফুলদের সঙ্গে একটি মাল্টি ব্যান্ডের ট্রানজিস্টার ছিল, ব্যাটারির জোর ছিল না বলে আমরা সেটি কাজে লাগাতে পারছিলাম না নরসিংদি বাজার থেকে অনেক খুঁজে আমরা চারটি নতুন তরতাজা চাঙ্গা ব্যাটারি সংগ্রহ করলাম চলন্ত ট্রাকের পাটাতনে আরাম করে বসে ট্রানজিস্টার থেকে পুরনো ব্যাটারিগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ব্যাটারিগুলো ঢুকালাম। নতুন ব্যাটারি পেটে পেয়ে দীর্ঘ সময় নীরব হয়ে থাকা রেডিওটি আনন্দে গান গেয়ে উঠলো– 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন / শ্যামল-কোমল পরশ ছাড়া যে নাই কোনো প্রয়োজন।'

এই দেশাত্মবোধক গানটি, যতদূর মনে পড়ে কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বা কবি হাবিবুর রহমানের লেখা। যেমন সুন্দর গানটির কথা তেমনি তার হৃদয়স্পর্শী সুর ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে প্রিয় স্বদেশরূপে জ্ঞান করে পূর্ব-পাকিস্তানের কবি ও গীতিকাররা বেশ কিছু ভালো দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। আমাদের কণ্ঠশিল্পীরাও কী দরদ দিয়েই না সেই দেশগানগুলি তখন গেয়েছিলেন। ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত ঐ জনপ্রিয় দেশগানটি শুনে আমার মনটা জুড়িয়ে গেলো

কোনোদিনই বাঙালির কোনো স্বাধীন দেশ ছিল না বটে, কিন্তু তার দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। তাই আবহমান বাঙলার কবিদের রচিত কাব্যে-গানে তার দেশপ্রেমের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে বারবার। অন্য জাতির সঙ্গে বাঙালির পার্থক্য এখানেই যে, তার প্রাণের ভিতরে দেশপ্রেম এসেছে আগে, পরে তার দেশপ্রেমকে অনুসরণ করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নরূপে জাগ্রত হয়েছে তার দেশমূর্তি। অনেকটা রামের জন্মের আগে রামায়ণ লেখার মতো।

চলন্ত ট্রাকে বসে আকাশবাণীর সন্ধানে রেডিওর নব ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ করেই আমরা পেয়ে গেলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ৩০ মার্চ পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণে চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দেয়ার পর, ঐ স্টেশনটি আকাশ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার স্থান দখল করেছিল আকাশবাণী কলকাতা। অনেকদিন পর আজ আবার নরসিংদির আকাশ চিরে ঘোষিত হল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে জয় বাংলা বলে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

তখন নরসিংদি ছিল নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। বেলাবো, পলাশ, শিবপুর, রায়পুরা ও মনোহরদি— এই পাঁচটি থানা নিয়ে নরসিংদি। মনোহরদির যে শিক্ষক-মহোদয় আমাদের রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিমনস্ক সাহিত্যরসিক মানুষ। আমি যে কবি, আমার যে একটি কবিতার বই (প্রেমাংশুর রক্ত চাই) বেরিয়েছে, সে খবরও তিনি রাখেন। তিনি আমার 'হুলিয়া' কবিতাটির কথা বললেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছিল। নামটি ভুলে গেছি খুব স্বাভাবিকভাবেই শহীদ আসাদের কথা আমাদের আলোচনায় উঠে আসে। তিনি আসাদকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, জানতেন। আসাদ ছিল সকলের প্রিয়জন।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি দুপুরের দিকে স্বৈরাচারী আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের এক পর্যায়ে একটি জঙ্গী মিছিলে নেতৃত্বদানকালে জনৈক পুলিশ অফিসারের পিস্তলের গুলিতে যখন আসাদ নিহত হয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে আমিও সেদিন চাঁনখাঁর পুলের চৌরাস্তায় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষরত সেই মিছিলে আসাদের খুব কাছাকাছি ছিলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের বেডে বুকে-গুলিবিদ্ধ আসাদের মৃতদেহও আমি দেখেছি আসাদ যে শিবপুরের কৃতী সন্তান— নরসিংদি, বিশেষ করে শিবপুরের মানুষ গর্বের সঙ্গে তা স্মরণ করে। আসাদের কথার সূত্র ধরে আমাদের আলোচনায় আসেন কবি শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমানের জন্ম পুরনো ঢাকার আওলাদ হোসেন লেনে হলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদি মহকুমার রায়পুরা থানার অন্তর্গত পাড়াতলী গ্রামে

আসাদের মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে, আসাদের রক্তাক্ত শার্টটিকে পতাকার মতো বহন করে একটি দীর্ঘ মিছিল সেদিন ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করেছিল। সেই মিছিলের পুরোভাগে লাল পতাকার মতো উড্ডীন আসাদের রক্তরঞ্জিত শার্টটি শামসুর রাহমানের চোখে পড়েছিল। তখনই তাঁর মনের ভিতরে একটি কবিতার জন্ম হয়। দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়ে গিয়ে সম্পাদকীয় লেখার পরিবর্তে শামসুর রাহমান নিউজপ্রিন্টে লিখেন তাঁর বিখ্যাত 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। নরসিংদির বীর সন্তান, কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মওলানা ভাসানীর শিষ্য শহীদ আসাদ নরসিংদির আরেক কৃতীসন্তান কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় এভাবেই অমর আসন লাভ করেন।

শহীদ আসাদ (১৯৪২-১৯৬৯ ; জন্মঃ ধানুয়া গ্রাম, থানা শিবপুর) এবং কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬ ; পিতৃনিবাসঃ পাড়াতলী গ্রাম, থানা রায়পুরা)-এর জন্মস্থানের ওপর দিয়ে আমি আমার নিজ জন্মস্থানের দিকে যাচ্ছি। শহীদ আসাদ ও কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে আলোচনা করে আমার খুব ভালো লাগলো। ২৫ মার্চের পর কবি শামসুর রাহমান কেমন আছেন, কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না, কিছুই জানি না। আমার বন্ধু কবি আবুল হাসান বা মহাদেব সাহার খবরও নিতে পারিনি। তবে কোনো দুঃসংবাদ যখন পাইনি, তখন ওঁরা বেঁচে আছেন বলেই মনে হল।

বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, কবি শামসুর রাহমান যে নরসিংদির মানুষ, তা নরসিংদির অনেকেই জানে না। তিনি গ্রামের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক রাখেন না। এলাকায় তাঁর যাতায়াতও প্রায় নেই বললেই চলে। বাস্তবকারণেই, নাগরিক কবির অভিধায় ভূষিত শামসুর রাহমানের কবিতাতে নরসিংদি-রায়পুরার গ্রাম জীবনের চিত্রও ছিল অনুপস্থিত। পাক-দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর শামসুর রাহমান আমাদের একটি লেখায় জানিয়েছেন যে, একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে জীবন বাঁচাতে তিনি তাঁর পৈত্রিক নিবাস, যেখানে রয়েছে তার শিকড়, সেই সাত-পুরুষের গ্রাম পাড়াতলীতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ গ্রামের বাড়ির পুকুর-ঘাটে বসেই তিনি এক দুপুরে লিখেছিলেন তাঁর দু'টি বিখ্যাত কবিতা– 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা'। তাঁর ভাষায়, 'ঐ কবিতা দু'টি কে যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল।'

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি আবার আকাশে ফিরে আসাতে আমাদের সবারই খুব আনন্দ হল। যতক্ষণ শোনা গেলো আমরা পিনপতন নীরবতার মধ্যে বসে ঐ বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানে আমার বেশ ক'জন বন্ধুর পরিচিত কণ্ঠ শুনতে

পেয়ে আমি খুব উত্তেজিত বোধ করলাম। ইচ্ছে হচ্ছিলো, পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাই। মনে হচ্ছিল, আমার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে যে আহ্বান, সেই আহ্বানে আমাকে সাড়া দিতেই হবে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আমার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে আমি সেখানেই যুক্ত করবো নিজেকে।

কিন্তু বেতারকেন্দ্রটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা জানার কোনো উপায় ছিল না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সেদিন রাতের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ঠিক কী কী বলা হয়েছিল, তা ভুলে গিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সম্পাদিত 'একাত্তরের দশ মাস' গ্রন্থ থেকে সেদিনের কিছু সংবাদ-কণিকা এখানে উদ্ধৃত করছি।

সকাল ১০টায় ও রাত ৮-৩০ মিঃ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু করা হয় ভারতের আগরতলা বিএসএফ-এর ১২ ব্যাটেলিয়নের সদর দফতর থেকে। ৮ এপ্রিল পর্যন্ত বিপ্লবী বেতার চালু থাকে। ৯ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি বেলাল মোহাম্মদের কাছে পরে জেনেছিলাম, 'অনিবার্য কারণে' বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার অন্তরালের আসল ঘটনাটা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তখন অনেক অনুষ্ঠানেই দখলদার পাক-সেনাদের বর্বরতার কাহিনী প্রচারিত হতো। পাকসেনা মানেই পাঞ্জাবি-সেনা। পাকসেনাদের মধ্যে পাঠান, বা বালুচরা থাকলেও তাদের সবারই নিয়ন্ত্রক ছিল মূলত পাঞ্জাবি সেনারাই। জাতিপরিচয়ে যারা ছিল পাঞ্জাবি। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলার মতো পাঞ্জাবও দ্বিখণ্ডিত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিম পাঞ্জাব পড়ে পাকিস্তানে আর পূর্ব পাঞ্জাব পড়ে ভারতে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তখন প্রচুর প্রাণ ও সম্পদহানির ঘটনা ঘটে। তারপরও জাতিতৃষ্ণা বলে কথা ধর্মের চেয়েও অনেক পুরনো এই ব্যাধি। তাই পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেলেও পাঞ্জাবিরা তাদের জাতিসত্তার গর্বিত পরিচয়কে ঠিকই আগলে রাখে বাঙালিদের মতোই। বিএসএফ-এর সদর দফতরে কর্মরত হিন্দু-পাঞ্জাবি সৈনিকরা তাদের মুসলমান-পাঞ্জাবি ভাইদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দামন্দ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাতে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ রচনা যেমন সম্ভব নয়, পাঞ্জাবিদের বাদ দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রামায়ণ রচনাও তেমনি সম্ভব নয়। কিন্তু সরদারজীরা তার মর্ম বুঝতে রাজি নয়। যারা আশ্রয়দানকারী, তারা আশ্রিতের যুক্তি মানবে কেন? তাই একপর্যায়ে জাত্যাভিমানী সর্দারজীরা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার গায়ের জোরে বন্ধ করে দিলে ৯

এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায় পরে উপরমহলের ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপের পর ১২ এপ্রিল থেকে আবার তার সম্প্রচার শুরু করা সম্ভব হয়।

ঐদিনের উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে আরও ছিল— আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে বিএসএফ-এর প্রধানের যোগাযোগ ঘটে। তাঁকে দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য বলা হলে তাজউদ্দিন দিল্লী যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পাকবাহিনীর একটি দল জামাত ও মুসলিম লীগের দোসরদের সহায়তায় মৌলবীবাজারের দেওড়াছড়া চা বাগানের শ্রমিকদের উলঙ্গ করে হাত-পা বেঁধে হত্যা করে। দেওড়াছড়া হয় জনশূন্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদে আরও জানা যায় যে, কর্নেল এমএজি ওসমানী, আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী ও আলহাজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরীসহ বেশ ক'জন উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ নেতা নিরাপদে ভারতের আগরতলায় পৌঁছেছেন। মুক্তির নৌকার পালে যে মহাসমুদ্রের টান লেগেছে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মুক্তিযুদ্ধে শামসুর রাহমানের কবিতা

২৫ মার্চের গণহত্যার পর কিছুদিন ঢাকায় এবাড়ি-ওবাড়িতে পালিয়ে বেড়ানোর পর অন্য অনেকের মতো কবি শামসুর রাহমানও তাঁর গ্রামের বাড়ি নরসিংদির পাড়াতলীতে চলে গিয়েছিলেন। ঢাকা শহরে পাকসেনাদের নির্বিচার গণহত্যা চালানোর এই একটা সুফল ফলেছিল ১৯৭১ সালে। পাকহানাদার বাহিনীর ভয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ গড়ে ওঠা শিকড়চ্ছিন্ন নব্যনাগরিক শ্রেণীর অনেকেই তখন 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' ধরে তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। শামসুর রাহমানের যে একটি গ্রাম আছে, তাঁরও শিকড় যে গ্রামে, তা ১৯৭১ এর আগে আমার মতো অনেকেরই জানা ছিল না। শামসুর রাহমানকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যেতে বাধ্য করার জন্য পাকসেনাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। ঐ ঘটনাটি আত্মনিমগ্ন নাগরিক কবি শামসুর রাহমানকে আমাদের দেশের বৃহত্তর গ্রাম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, এবং তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল জনঘনিষ্ঠ এবং প্রতিবাদমুখর।

তাঁর গ্রামের বাড়ির বাঁধানো পুকুর ঘাটে বসে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতাদ্বয় 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা।' সেকথা আমি আগেও কিছুটা বলেছি কিন্তু যা বলা হয়নি, তা হল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বন্দিশিবিরে বসে লেখা শামসুর রাহমানের মুক্তিযুদ্ধের সাহসশিখা-উসকানো উদ্দীপক কবিতাগুলি পাকসেনা ও তাদের দোসরদের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে ভারতের আগরতলা ও কলকাতায় পৌঁছেছিল, সেই চমকপ্রদ বীরত্বের কাহিনী সেই কাহিনীও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শামসুর রাহমানের ঐ কবিতাগুলি আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রণক্ষেত্রে সাহসে, আশায় ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত করেছিল। অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলাভাষার অগণিত পাঠককে। তাঁর কবিতাগুলি সাইক্লোস্টাইল করে ছাপিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গণে বিলি করা হয়েছিল এবং কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে, তাঁর কবিতা অনেকের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। শামসুর রাহমানের সেই টাটকা কবিতাগুলো তখন মুজিবনগরস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়েছিল।

আমাদের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কবি রফিক আজাদ, যিনি অস্ত্র হাতে কাদের বাহিনীর সদস্য হয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছিলেন, শামসুর রাহমানের ঐ কবিতাগুলি সম্পর্কে তিনি আমাদের জানিয়েছেন—

> 'তিনি [শামসুর রাহমান] মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছেন কলম নিয়ে। 'বন্দিশিবির থেকে'

> কবিতার কথা মনে করুন। এটি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিল অসামান্য কিছু। আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তাঁর হাতে লেখা কবিতা, সাইক্লোস্টাইল করে শাহাদত চৌধুরী সখীপুরে পৌঁছাতো। সেখান থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে পৌঁছাত আশ্চর্যভাবে তাঁর কবিতায় স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকতো যে, বেশি দিন যুদ্ধ করতে হবে না। শিগগিরই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করবো। এই যে কথা তা আজকে সাধারণ মনে হলেও যুদ্ধকালে তা ছিল অমিয়বাণীর মতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আশার বাণী তা কি তোলার মতো?
>
> 'দেশ' পত্রিকায় মজনুন আদিব নামে তিনি লিখেছেন সেসময়। কলকাতার দেশ পত্রিকা তখন শামসুর রাহমানের কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে। সাইক্লোস্টাইল করা কিছু কিছু কবিতা হয়তো বা টাঙ্গাইলে পাওয়া যেতে পারে।'
>
> (দ্র মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা : রফিক আজাদ।
> মোহাম্মদ শাজাহান সম্পাদিত 'শামসুর রাহমান : জীবনমঙ্গলের কবি')

শামসুর রাহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পারিবারিক কারণে ঢাকা ছেড়ে ভারতে যেতে পারেননি। তখনকার ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মতিউর রহমান (প্রথম আলো সম্পাদক) তাঁকে পাড়াতলী থেকে ভারতে নিয়ে যেতে নরসিংদি গিয়েছিলেন, কিন্তু পরিবারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে তিনি যেতে পারেননি। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর ভাষায় 'বন্দিশিবিরে' দুঃসহ দিন কাটিয়েছেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লিখেছেন।

একবার ভাবুন তো, বন্দিশিবিরে বসে লেখা তাঁর সেই কবিতাগুলি যদি তাঁর হাতেই থেকে যেতো, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যদি সেগুলি আলোর মুখ না দেখতো, যদি তাঁর ঐ কবিতাগুলি সাইক্লোস্টাইলে মুদ্রিত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে না পৌঁছাতো? যদি ঐ কবিতাগুলি ছাপা না হতো দেশ পত্রিকায়? যদি পঠিত না হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা আকাশবাণী থেকে, তবে?

মুক্তিযুদ্ধের অবসানে ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় লাভের পর তাঁর ঐ সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতো ঠিকই, কাব্যপাঠকদের প্রশংসাও নিশ্চয়ই জুটতো তাদের ভাগ্যে কিন্তু শিল্পমান বিচারে যত ভালো কবিতাই হোক না কেন, তারা কখনও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে পারতো না তাঁর ঐ কবিতাগুলি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবিতার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া 'মুক্তিযোদ্ধা কবিতা' হিসেবে কখনও গণ্য হতে পারতো না। মুক্তিযোদ্ধারাও বঞ্চিত হতো রণক্ষেত্রে প্রেরণা ও প্রত্যয়

সৃষ্টিকারী তাঁর ঐ বলিষ্ঠ উদ্দীপক কবিতাগুলোর সুধারস থেকে। সুতরাং শামসুর রাহমানের কবিতা ছড়িয়ে দেয়ার ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সেদিন যারা সম্পন্ন করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা শামসুর রাহমানের কবিতা বুকে-পিঠে বহন করে দেশের ভিতরের মুক্তাঞ্চলে এবং দেশের বাইরে ভারতের আগরতলা ও কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। তাদের ভূমিকাকে আমরা যেন এতটুকু খাটো করে না দেখি আমি মনে করি, তাঁরা যদি আর কিছু নাও করতেন, তবু শুধু এই দায়িত্বটুকু পালন করার জন্যই আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতাম।

এই কাজের কাজটি শামসুর রাহমানের কবিতার ভক্ত যে দু'জন তরুণ সেদিন সম্পন্ন করেছিলেন, তারা হলেন সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, চারুশিল্পী শাহাদত চৌধুরী ও জনাব হাবীবুল আলম বীরপ্রতীক। ১৯৭১ সালে ওঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমাদের কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে গঠিত ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য শাহাদত চৌধুরী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমার দুঃখ, সে জেনে যেতে পারলো না, আমি তাঁরই রেখে যাওয়া পত্রিকায় আমার জীবনের দীর্ঘতম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে লিখছি। কবি শামসুর রাহমানও গত বছর ১৭ আগস্ট লোকান্তরিত হয়েছেন। আমি কেন যে আরও আগে এটি লিখিনি। তাহলে শামসুর রাহমানও নিশ্চয়ই খুশি হতেন। তবে তিনি বেঁচে থাকলে আমার লেখায় তিনি এতোটা জায়গাজুড়ে আসতেন কি না, কে জানে?

শামসুর রাহমানের কবিতা পাচারের বিষয়টি নিয়ে ঘটনাটির প্রত্যক্ষকারী হিসেবে জনাব হাবীবুল আলম বীরপ্রতীকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলেছেন, এই ঘটনাটির সমস্ত কৃতিত্ব শাহাদত ভাইয়ের আমি শুধু তাঁর সঙ্গে ছিলাম তিনিই আমাকে নিয়ে দু'বার কবি শামসুর রাহমানের বাসায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার জুলাই মাসে ও পরে আগস্টের কোনো একদিন, দিনের বেলায়। শামসুর রাহমান দু'বারই তাঁর রচিত কবিতা শাহাদত ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শামসুর রাহমান তাঁর পুরনো ঢাকার আওলাদ হোসেনের বাসায় তাদের চা দিয়ে খুব সঙ্গোপনে আপ্যায়নও করেছিলেন এবং কবিতা নিয়ে ফেরার সময় তাদের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় নেই শামসুর রাহমানের কবিতা ও অভয়বাণী সেদিন দুই তরুণের মনেই নতুন করে সাহস সঞ্চার করেছিল

কবিতা নিয়ে তারা চলে যান। হাবীবুল আলম যান তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র ২নং সেক্টরের মেলাঘরে। শাহাদত যান আগরতলায়। সেখানে 'দি হিন্দু' পত্রিকার

সাংবাদিক ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য। তাঁর মাধ্যমেই শামসুর রাহমানের কবিতা কলকাতায় পাঠানো হয়।

শামসুর রাহমানের কবিতা কীভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, তার বিবরণ শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন।

> 'অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে একদিন বিকেলে আমাদের বাসায় এসে হাজির হলেন তেজী মুক্তিযোদ্ধা আলম (হাবীবুল আলম বীরপ্রতীক) এবং তার সহযোগী শাহাদত চৌধুরী। কিছুক্ষণ ওরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আমি তাঁদের কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালাম। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রচিত কবিতাবলি শুনে ওঁরা কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে স্থির করলেন। কয়েকটি কবিতা শেষ পর্যন্ত শিল্পী আলভির মাধ্যমে শাহাদত চৌধুরী কলকাতায় শ্রদ্ধেয় আবু সায়ীদ আইয়ুব-এর কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন। আবু সয়ীদ ও তাঁর সহধর্মিণী গৌরী আইয়ুবের উদ্যোগ ও উৎসাহে আমার 'বন্দিশিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতায় ১৯৭২ সালে-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের দু'চারটি কবিতা কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ মজলুম আদিব ছদ্মনামে বেরিয়েছিল। এই ছদ্মনামটি রেখেছিলেন খোদ আবু সয়ীদ আইয়ুব। মজলুম আদিব-এর অর্থ হচ্ছে নির্যাতিত লেখক
>
> আমার কয়েকটি কবিতা শার্ট ও প্যান্টের কোনও কোনও অংশে লুকিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ওঁরা আমার এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন '
>
> (কালের ধুলোয় লেখা - পৃঃ ২৮০)

'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতা দুটোর রচনার পটভূমি আমি তাঁর মুখে শুনেছি। ঘটনাটি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> 'এপ্রিল মাসের সাত অথবা আট তারিখ দুপুরের কিছুক্ষণ আগে বসেছিলাম আমাদের পুকুরের কিনারে গাছতলায়। বাতাস আদর বুলিয়ে দিচ্ছিলো আমার শরীরে। পুকুরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, কিশোর-কিশোরীও ছিল ক'জন, সাঁতার কাটছিল মহানন্দে। হঠাৎ আমার মনে কী যেন বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো খেলে গেলো সম্ভবত একেই বলে প্রেরণা। কবিতা আমাকে জড়িয়ে ধরলো আমি চটজলদি আমার মেজ চাচার ঘরে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটা কাঠপেন্সিল এবং কিছু কাগজ চাইলাম

সে কাঠপেন্সিল এবং একটি রুলটানা খাতা দিল। এই কাঠ পেন্সিল এবং খাতা দিয়ে সে যেন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করলো।) আমি সেই কাঠপেন্সিল এবং খাতাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি পুকুরের দিকে ছুটলাম পুকুর মুন্সীবাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে তার অবস্থান ঘোষণা করছে যেন সগর্বে। পুকুরের প্রতিবেশী সেই গাছতলায় আবার বসে পড়ে খাতায় কাঠপেন্সিল দিয়ে শব্দের চাষ শুরু করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা কিংবা কিছু বেশি সময়ে পর পর লিখে ফেললাম দু'টি কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা।'

(কালের ধুলোয় লেখা পৃঃ ২৭০)

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কবি শামসুর রাহমান নরসিংদিতে তাঁর গ্রামের বাড়ি রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে গিয়েছিলেন। আমি নরসিংদিতে ছিলাম ৩ এপ্রিল। কে জানে, হয়তো তখন তিনিও নরসিংদিতেই ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে ঢাকা ছেড়ে নরসিংদির গ্রামের বাড়িতে যাবার তারিখটি লিপিবদ্ধ নেই। তবে নরসিংদির পথে শামসুর রাহমানের ঢাকা ত্যাগের বর্ণনাটি আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খুব মেলে। তিনি লিখেছেন :

'সকাল দশটা সাড়ে দশটার সময় ঢাকা থেকে বাসে চেপে রওয়ানা হলাম নরসিংদির উদ্দেশে। সেখান থেকে নৌকায় মেঘনা নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয় আমাদের পাড়াতলীর আকুঘাটায়। সেখানে কিছু পথ পেরুলেই আমাদের মুন্সিবাড়ি। এটা বলা তো খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন পাড়াতলী পৌঁছতে পারাটা তেমন অনায়াস ছিল না। শুরু হল আমাদের যাত্রা বাসের দুলুনি খেতে খেতে। মনে সংশয়, বিপদের আশংকা পদে পদে। ডেমরার কাছে এক জলাশয়ে দেখতে পেলাম ভাসমান চার-পাঁচটি মৃতদেহ। পাক হানাদারদের করুণ শিকার চোখ ফিরিয়ে নিলাম সেই দৃশ্য থেকে পলায়নপর আমি '

(কালের ধুলোয় লেখা পৃঃ ২৬৮)

শহীদ আসাদকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি ছিল কবি শামসুর রাহমানের কাব্যজীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই কবিতা রচনার পটভূমি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন .

'চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল লাঠির ডগায় ঝুলে-থাকা একটি রক্তাক্ত শার্ট। আসাদের শার্ট। যাকে আমি দেখিনি কোনদিন, সেই মুক্তিকামী, রাজনীতিসচেতন, দেশপ্রেমিক যুবকের কথা ভেবে মনে এক ধরনের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে আশার এক

পবিত্র প্রদীপ জ্বলজ্বলে হয়ে কাঁপছিল। এই আত্মদান কি বৃথা লুণ্ঠিত হতে পারে পথের ধুলোয়? আমাদের দুঃখিনী বাংলা কি পরাধীনতার শেকলবন্দি হয়ে গুঁমিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে শুধু? মুক্তির আলোকধারায় স্নাত হবে না কি তার সত্তা? অফিসের চেয়ারে বসেই আমি আমার অজান্তে যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করছিলাম দু'টি শব্দ 'আমাদের শার্ট' সেদিন দুপুর কিংবা বিকেলে কারও সঙ্গে বেশি কথা বলিনি। বলতে পারিনি। গোধূলিবেলায় হেঁটে বাড়ি ফিরেও নীরব ছিলাম। সন্ধ্যারাতে লেখার টেবিলে ঝুঁকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখে ফেললাম 'আমাদের শার্ট' কবিতাটি।...

'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শামসুর রাহমান, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের বাড়ি নরসিংদির পাড়াতলীতে আত্মগোপনে থাকার সময় কবি শামসুর রাহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনে ভীষণ উজ্জীবিত বোধ করতেন। তাঁর আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থে শামসুর রাহমান লিখেছেন :

> 'খবর পাওয়ার একমাত্র উৎস ছিল রেডিও। প্রায় সারাক্ষণই খুলে রাখা হতো, কান পেতে শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী এবং বি.বি.সি। তবে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই ভল্যুম চড়িয়ে। কারণ পাড়া-পড়শিদের কয়েকজন হাজির হতেন সংবাদ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। সেদিন স্বাধীন বাংলা বেতার শোনা যেতো না, সেদিন সবকিছু কেমন আবছা মনে হতো। এক ধরনের মনের তো বটেই, সারাদিনের মুখও নিরাশায় কালো হয়ে যেত। আরপর হঠাৎ সেই বেতার কেন্দ্র সচল হলেই মনে সূর্যোদয়।'
>
> (কালের ধুলোয় লেখা, পৃ ২৭০)

কবির কাছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল, তাঁর নিজের ভাষায়— 'সচল হলেই মনে সূর্যোদয়।' ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুধু শামসুর রাহমানের মনে নয়, মুক্তিকামী সকল বাঙালির মনেই সূর্যোদয়ের আনন্দ ছড়িয়ে দিতো। 'সচল হলেই মনে সূর্যোদয়..'-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব শামসুর রাহমান রচিত এই চিত্রকল্পের মধ্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি। ঐ বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা সেদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনও সম্মান জানানো হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম ও বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত 'শব্দ সৈনিক'দের মধ্য থেকে কাউকে তেমন কোনো খেতাব প্রদান করা হয়নি। বিলম্বে হলেও এটা করতে হবে ভুল হয়ে গেছে। ভুলটা অবশ্যই আমাদের শোধরাতে হবে। বেটার লেইট দ্যান নেভার। আগেও আমি এই দাবি উত্থাপন করেছি, কবি শামসুর রাহমানকে সাক্ষী রেখে সেই দাবি আজ

আবারও উত্থাপন করছি ন্যায্য কথা বারবার বললেও দোষ নেই। লজ্জা নেই। অধিকন্তু ন দোষায়।

লেখক-গবেষক আফসান চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি। স্বাধীন বাংলা বেতারের যাত্রা শুরুর দিনগুলি ঐ গ্রন্থে স্বল্পপরিসরে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

> '২৫ মার্চ অষ্টম বেঙ্গল এবং ইপিআর-এর প্রতিরোধের ফলে চট্টগ্রামে 'অপারেশন সার্চ লাইট' ব্যর্থ হয়। পাক সৈন্যরা শুধু চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম বাঙালিদের অধীনে চলে আসে। এই হিসাবে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রও তাদের দখলে আসে।
>
> চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসিরউদ্দিন, প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, টেকনিশিয়ান আবদুস শুকুর (শাকের), দেলওয়ার, মোসলেম খান প্রমুখের চেষ্টায় ২৬ মার্চ দুপুরে বেতার চালু হয়। বেতার কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন রাখালচন্দ্র বনিক। আগ্রাবাদে বেতারের এই সম্প্রচার সময়ের কার্যকাল ছিল মাত্র ৫ মিনিট
>
> ঐদিনই বেতার কর্মকর্তা বেলাল মোহাম্মদের প্রচেষ্টায় কালুরঘাটে বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। সন্ধ্যা ৭-৪০মি আবুল কাসেম সন্দীপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি' ঘোষণার মাধ্যমে। আধ ঘণ্টা অনুষ্ঠানের পর, পরদিন ২৭ মার্চ সকাল ৭ টায় পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
>
> ২৬ মার্চেই রাত ১০টার সময় মাহমুদ হোসেনের প্রচেষ্টায় ফারুক চৌধুরী, বেতারশিল্পী রঙ্গলাল দেব এবং কবির হোসেনের সহায়তায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকটি অধিবেশন প্রচারিত হয় বেতারের দু'জন প্রকৌশলী দেলওয়ার ও সোবহান তাদের সঙ্গে ছিলেন। এই সময়েও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই অধিবেশন চলে প্রায় ১০ মিনিট।
>
> ২৬ মার্চ এভাবে তিনটি গ্রুপে তিনবার বেতার কেন্দ্র চালু করে একবার আগ্রাবাদে, দুইবার কালুরঘাটে
>
> ২৭ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র পুনরায় চালুর কথা জানা যায় তবে আগের দিনের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ঐ দিন বেতার চালু করে ডা. এম এ মান্নান (হান্নান) প্রথমে ভাষণ

দেন। বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ পাঠ এবং প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। এ-সময়ের বুলেটিনে টিক্কা খান নিহত হওয়ার খবর প্রচার করা হয়েছিল। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন শাহ-ই জাহান চৌধুরী, ডা. মাফুজুর রহমান, ডা. বেলায়েত হোসেন এবং কয়েকজন বেতার প্রকৌশলী।

এদিন বিকেল থেকে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দীপ, আমিনুর রহমান সহ অভিজ্ঞ বেতার কর্মীগণ বেতারের পরিকল্পিত অনুষ্ঠান শুরু করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ যে এক সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে; বাঙালি ইপিআর, সৈনিক ও জনতা যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তা সকল প্রতিরোধ-যোদ্ধাকে জানিয়ে দেয়াটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

(বাংলাদেশ ১৯৭১ : ১ম খণ্ড : পৃ-৫১১-৫১২)

Bangabandhu's recorded voice message of declaration of Independence of Bangladesh ("Th.s may be my last message ") were sent from Bo dha Garden, Pilkhana BDR (then EPR) communication centre and written telegram messages ("JARURI GHOSHONA. ADDO RAT BARO TA BORBOR PAK BAHINI DHAKAR PILKHANA & RAZARBAG POLICE . ... Joy Bangla"") were sent through T & T transmission Centre at Dhaka, just after the crack down at late n ght of 25 03 71 (early hours of 26 03 07)

- Chittagong District Awami League General Secretary, Mr M A Hannan, read the Bangabandhu's Message of Declaration of Independence of Bangladesh at about 2.30 PM of 26 03 71 Chittagong City (Agrabad) Radio Station
- Mr Abul Kashem Swandip, Mr Abdullah Al Faruk, Mr Sulatanul Alam, Belal Mohammed & others read the Bangabandhu's declaration of Independence of Bangladesh at about 7 40 PM of 26 03 71 from "SHADIN BANGLA BIPLOBI BETAR KENDRA" at Kalurghat (Chittagong) Radio Station
- Major (then) Zia read the similar message of declaration of Independence of Bangladesh by Bangabandhu (that was drafted ,in English, by Zia & Mr Be.al Mohammed and in Bengali translation by Prof Momtazuddin) on behalf of our great nat onal leader Bangabandhu about 7 30 PM of 27 03 71 from "SHADIN BANGLA BETAR B PLOBI KENDRA) Kalurghat (Chittagong) Rad o Stat on

References:

- Pakistan Crisis by Mr David Losac, The Reporter of the Daily Telegraph, 1971
- Witness to surrender by Brig Siddique Salik of Pak Army
- American suit Report
- White papers of Pakistan Government
- Massacre by Mr Robert Pain
- "SHADIN BANGLA BETAR KENDRA" by Mr Belal Mohammed

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা হবে। ঘুরে ফিরেই আসবে স্বা.বা.বে.কে আপাতত ঐ প্রসঙ্গের ইতি

যাত্রাপথে রেডিওটি সঙ্গে রাখার জন্য সাইফুলকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, তোমার রেডিওটি থাকার কারণে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান আবারও শুনতে পেলাম কী ভালো যে লাগলো আমার! বুকে জড়িয়ে ধরে রেডিওটির গায়ে চুমু খেয়ে বললাম, তুমি বেঁচে থাকো সোনা। তুমি তো শুধু রেডিও নও, তুমি হলে আমাদের সকলের প্রিয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের প্রাণভোমরা তোমার মধ্যে বাঁধা। তুমি আবার আকাশে হারিয়ে যেও না।

সাইফুল জানালো যে, রেডিওটি আসলে তার নয়। ওটি তার ভগ্নিপতির। বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে কিন্তু তেমন মনে হল না মনে হল, রেডিওর আসল মালিক নকল মালিকের কাছে হার মেনেছেন। মালিক নিজে তা কদাচ ব্যবহার করার সুযোগ পান। সাইফুলের স্টেশন নির্বাচনের সঙ্গে তাল মিলানো ছাড়া বেচারা ভগ্নিপতিটির আর উপায় থাকে না। ভাবি, আহা আমারও যদি একটি রেডিও থাকতো। আমি কেন যে সময়মতো একটি রেডিও কিনিনি। থাকলে আজ সেটি আমার কত কাজেই না লাগতো। যখন খুশি বিবিসি, আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পেতাম। জানতে পারতাম মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, বুঝতে পারতাম বিশ্বপরিস্থিতি। আমাদের বাড়িতে অবশ্য একটি এক ব্যান্ডের ফিলিপস রেডিও আছে। বাড়িতে গিয়ে প্রাণের তৃষা জুড়িয়ে ঐ রেডিওটিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যাবে। জানতে পারবো, আমার পরিচিত ও বন্ধুদের মধ্যে কারা কারা সেখানে জয়েন করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি কবিতা পাঠ করছি, এরকম একটি প্রিয় দৃশ্য কল্পনা করতে করতে, ভাবতে ভাবতে, চাদর বিছানো মাটির মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পাকসেনাদের আক্রমণের ভয় না থাকায় রাতে অনেকদিন পর খুব ভালো ঘুম হল

আজ ৪ এপ্রিল। রবিবার। ঘুম ভাঙলো প্রভাত-সূর্যের ডাকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। চোখের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো মনোহরদির দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মনোহর মাঠ। রোদ-সেঁকা ভোরের হাওয়া ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লো আমার গায়ে। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো নজরুলের গানের কলি...

'এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায়
হেরিনু পল্লী জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদামাটি জলে
ঝলমল করে লাবণি।'

আহা! কী অপূর্ব সুন্দর আমার এই রূপসী বাংলা। মনে পড়লো জীবনানন্দের কথা। তিনি কী ভালোই না বেসেছিলেন এই বাংলা নামের দেশটিকে। তাঁর রচিত রূপসী বাংলার কবিতার চরণ দিয়ে আমরা আমাদের প্রাণের শহীদ মিনার সাজিয়েছি—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। মনে পড়লেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একটুও বাড়িয়ে বলেননি তিনি—

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

এমন সুন্দর একটি দেশের পক্ষে কি পরাধীনতা মানায়? না, মানায় না। মানায় না। যা মানায়, যা আমাদের মানানো উচিত, সেকথাই তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ বলে গেছেন ব্রিটিশ-কবলিত বন্দিদেশমাতৃকার স্বাধীনচিত্ত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। আমরা পূর্ব বাঙলার বাঙালিরা তো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে 'স্বাধীনতার কবি'র সেই স্বপ্নের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি।

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?'

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার
আত্মনাশে যে করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার

একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়
নিভাইতে সে-অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়?'

রঙ্গলালের এই প্রবাদকাব্যের প্রথম স্তবকটি অনেকের মতো আমারও মুখস্থ ছিল। কিন্তু পরের স্তবকগুলি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না বাকি স্তবকগুলির সন্ধান করতে গিয়ে আমি গবেষক সাহিত্যিক শামসুজ্জামান খানের শরণ নিলে তিনি আমাকে ঐ কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকটি উপহার দেন। চতুর্থ স্তবকটি পেয়েছি কবি-সাংবাদিক ঔপন্যাসিক-নাট্যকার আনিসুল হকের সৌজন্যে। ঐ চারটি স্তবক হচ্ছে একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। যাঁরা পুরো কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। তবে ঐ উপাখ্যানকাব্যটি কোথায় পাওয়া যায়, আমি জানি না।

১ পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকথা

শীতলক্ষ্যার তীর থেকে নরসিংদি বাজার পর্যন্ত সড়কটা মোটামুটি চলনসই ছিল। তারপর থেকেই সড়কপথের ইতি, নরক-পথের শুরু। ভাঙা-চোরা, উঁচু-নিচু খানাখন্দে ভরা অপ্রশস্ত পথ। পথের কোথাও ইঁট বিছানো আছে, কোথাও নেই। ঢাকা থেকে সাইফুলরা যে ট্রাকটি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল, আমাদের মনোহরদিতে নামিয়ে দিয়ে কাল রাতেই সেটি ঢাকার উদ্দেশে ফিরে গেছে। তখনই স্থির হয়েছিল, বাকি চার-পাঁচ মাইল পথ আমরা পায়ে হেঁটেই চলে যাব। প্রয়োজনে রিকশাও নেয়া যাবে। মনোহরদি থেকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সড়কপথটি ভারী ট্রাক চলার উপযোগী না হলেও রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চলে।

সকালে তেলেভাজা মচমচে পরোটা ও মুরগীর মাংস দিয়ে পেটপুরে নাস্তা করে দশটার দিকে মনোহরদির মায়া ছেড়ে আমরা রওয়ানা দিলাম কিশোরগঞ্জের প্রবেশধার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী মঠখলা বাজারের উদ্দেশ্য আমাদের মতো মনোহরদিতে কাল রাতে যারা যাত্রাবিরতি করেছিল, তারাও এসে কিশোরগঞ্জের পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। বেশ ছোটোখাটো একটা কাফেলা।

মনোহরদি থেকে নাক বরাবর উত্তরের দিকে আমরা চলেছি। আমার কল্পনায় তখন আরও একটি নদীর হাতছানি। বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার পর এবার আমার যাত্রাপথে পড়বেন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র মহাশয় ব্রহ্মপুত্র নদী নয়, নদ। নারী নয়, পুরুষ। সেই পুরুষনদ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আমরা যাব মঠখলা। মঠখলা কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি থানার অন্তর্গত একটি ছোট্ট বাজার

নদীমাতৃক দেশের মানুষ আমি। হাজার নদীর দেশ বাংলাদেশ। তার দু'কূল ভাসানো আগ্রাসীমূর্তির কথা স্মরণে রেখেও বলতে পারি, আমি নদী খুব ভালোবাসি। ভালো না বেসে উপায় নেই বলে নয়, তাকে ভালোবাসতে ভালো লাগে বলেই। জানি নদী সবাই ভালোবাসে। আমি হয়তো একটু বেশিই বাসি। বেশি বলি এজন্য যে, আমি যখন কোনো নদীর দিকে অগ্রসর হই, আমার মন এক অব্যাখ্যাত অজানা আকর্ষণে চঞ্চল হয়। আমার রক্তের মধ্যে জাগ্রত হয় নদীদর্শনের তৃষ্ণা। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষই কমবেশি কবি। আর নদীমাতৃক দেশের মানুষদের মধ্যেই কবিদের পাল্লা ভারি। তা না হলে আমাদের প্রিয় ভাটিয়ালি গানগুলি রচিত হতে পারতো না। আমাদের লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত সারি আর ভাটিয়ালি গানগুলির রচয়িতাদের নাম সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারবেন কি? ঐ সব প্রাণমনকাড়া গান তো আর আকাশ থেকে নদীতে পড়েনি, নদী থেকে জন্ম নিয়ে, নানা কণ্ঠে গীত হয়েই তারা বাংলার আকাশে বাতাসে উড়েছে। অতুলনীয় ভাবসম্পদে আমাদের লোকসাহিত্যের

সঙ্গীতভাণ্ডকে করেছে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্ররচনাতেও তার অকাট্য প্রমাণ মেলে। সবচেয়ে বেশি মেলে বোধ করি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তিনি যেন নিজেই নদী। আর কবি না হলেও কবিপ্রায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নদীদর্শন আরও চমকপ্রদ তিনি নদীকে একটি 'গতি-পরিবর্তনশীল জীব' বলে মনে করতেন। আমিও মনে করি, নদীর প্রাণ আছে। তার তীরে তীরে যে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সে শুধুই তার সুপেয় জলের জন্য নয়, তার সুমিষ্ট জলের ভিতরে লুকানো প্রাণের জন্যও।

আমাদের সঙ্গে একটা লক্করমার্কা রিকশা ছিল। সেই রিকশা তার যাত্রীকে ত্বরা করে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নেয়নি, যুক্তিসঙ্গত কারণেই তার সে ক্ষমতাও ছিল না তার সাধ্য শুধু পায়ে হাঁটার দায় থেকে যাত্রীকে কিছুটা মুক্তি দেয়ার মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে পায়ে হাঁটার দায় থেকে মুক্তি মিললেও, রিকশা থেকে ছিটকে পড়ার ভয় থেকে যাত্রীকে অব্যাহতি দেয়ার সাধ্য ছিল না রিকশাচালকের। পড়ে যেতে পারি, – এই ভয়টা সত্যিকারের পড়ে যাবার চেয়ে কম ক্ষতিকর নয় মোটেও। তাই, এক পর্যায়ে সাইফুলের বোনটি রেগেমেগে রিকশা থেকে নেমে গেলো। বলল, 'এর চেয়ে পায়ে হাঁটা আমার ঢের ভালো। রিকশার মধ্যে বসে থাকার জন্য সংগ্রাম করার কোনো মানে হয়? পাকসেনাদের হাত থেকে বেঁচে এসে, শেষে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রিকশা থেকে পড়ে মরব নাকি?'

তখন রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে দেয়া হল। আমরা মরুতীর্থপথে হিংলাজ যাত্রীদের মতো পদব্রজে এগিয়ে চললাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের দিকে। ভাঙা বায়সকণ্ঠে আমি গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলাম 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে।'

সাইফুলের ভাগনিটি বলল, 'মামা, তুমি গান জানো?'

বললাম, 'সবসময় জানি না, তবে মাঝে মাঝে জানি।'

যার জন্য গাওয়া, সে ঠিকই বুঝল। তাই আমার কথায় পিঠে ফোড়ন কেটে বললো, 'তা, বেদনার দিনে এই আনন্দের গান কেন?'

আমার গান প্রাণ না ছুঁলেও তার কান যে ছুঁয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েই আমি খুশি। তাই আনন্দই আমাকে ভাষা আর যুক্তি জোগাল। বললাম, 'বেদনা ছিল, আছে, থাকবে; কিন্তু সে জীবনের বড় সত্য নয়। আনন্দই বড় সত্য। তাই আনন্দের গানই মনে আসছে।'

শুভার গল্পটা রাখলাম লুকিয়ে।

কী কারণে জানি না, আজ সকাল থেকেই আমার মন ছুটেছে গানের টানে ঢাকা থেকে যতই আমি দূরে সরে যাচ্ছি, যতই আমি এগিয়ে যাচ্ছি আমার জন্মগ্রামের দিকে, ততই যেন আমার কাছে ছুটে আসছে গান।

বারোটার দিকে, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে আমরা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে দাঁড়ালাম। জায়গার নামটা ভারী মজার। ড্রেইনের ঘাট। ড্রেইন কখনও কোনো স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, আমি ভাবতেও পারিনি নামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোনো ড্রেইন আমাদের চোখে পড়ল না, কিন্তু নামটা গেঁথে রইল আমার মনের ভিতরে

চৈত্রের দাবদাহে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে তখন গ্রীষ্মের জাগ্রতদশা গ্রীষ্ম আঘাত হানে। তারই টান পড়েছে আমাদের নদী নালায়, খালে-বিলে-ঝিলে। দেখলাম, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র জলাভাবে শুকিয়ে এসেছে এতো বড়ো নামকরা পুরান-প্রসিদ্ধ নদের এই দশা? ব্রহ্মপুত্রের স্বল্পদীর্ঘ মূল প্রবাহটি পাড়ি দিতে যদিও আমাদের নৌকার সাহায্য নিতে হল, কিন্তু নদীর অবশিষ্ট জলপ্রবাহদৃষ্টে 'আমাদের ছোটো নদী'র কথাই মনে পড়ল বেশি। কবি বলেছেন– বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। তাও সর্বত্র থাকলে হতো। কোথাও কোথাও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবতে চায় না

বুড়িগঙ্গার কথা মনে পড়ল। গঙ্গার মূল প্রবাহটি ধলেশ্বরীতে সরে যাবার কারণে সৃষ্ট ক্ষীণস্রোতা গঙ্গা নদীর নাম যদি বুড়িগঙ্গা হতে পারে, তবে তো মূল প্রবাহ ছেড়ে বেরিয়ে আসা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের নাম হওয়া উচিত ছিল বুড়া বা বৃদ্ধ ব্রহ্মপুত্র। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কেন? নদ-নদীতেও পুরুষতন্ত্র? পুরানকাহিনী অনুযায়ী বুড়িগঙ্গা তো কাঙালিনী সুফিয়ার মতো বলতেই পারে, ... 'বুড়ি হইলাম তোর কারণে।'

ময়মনসিংহ জেলা শহরের উত্তর-পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আমার অনেকদিনের দেখা, প্রিয় নদ। সেখানে তাঁর এমন দীনজলদশা তো কখনও দেখিনি। আমি আমার মা-কাকীমাকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে বহুবার অষ্টমী স্নানে নিয়ে গেছি। সেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও ব্রহ্মপুত্রের জল গৌরব ছিল, মঠখলায় যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে দেখলাম, তার নাম ব্রহ্মপুত্র না হয়ে অন্য কোনো নাম হলেই আমি খুশি হতাম বেশি। অন্য কোনো নদীর দীনজলদশায় আমার খুব যায় আসে না, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ছোটো হলে আমার কষ্ট হয় বৈকি। আমি যে নিজেকে মনে মনে ব্রহ্মপুত্র বলে ভাবি। ঐরকম ভাবার একটি গোপন কারণও আছে। ব্রহ্মপুত্রের এক নাম হচ্ছে লৌহিত্য-নদ। লৌহিত্য মুনির নামে এই নদের নামকরণ আমাদের বংশগোত্র হচ্ছে– লৌহিত্য গোত্র তার মানে, লৌহিত্য মুনি আমাদের কুলগুরু? ব্রহ্মপুত্রই হচ্ছে আমাদের নদীরূপ, আর ব্রহ্মপুত্রের মানুষরূপ হচ্ছি আমরা, যাদের বংশ-গোত্র লৌহিত্য।

কৈশোরে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি অনুভব করে আসছি যে, ঐ নদটির প্রতি আমার অন্তরের মধ্যে একটা গোপন টান আছে।

ব্রহ্মপুত্রের পৌরাণিক জন্মকথা ও মাহাত্ম্যগাথা শুনে ঐ নদের সঙ্গে আমার হৃদবন্ধন কালক্রমে দৃঢ় হয়েছে। আসুন আমার প্রিয় নদের সঙ্গে আমি আপনাদের কিছুটা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি

ব্রহ্মপুত্র হচ্ছে তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশ— এই তিন দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একটি দীর্ঘ নদের নাম। তিব্বতের মানস সরোবর থেকে বের হয়ে সাংপো নামে প্রায় হাজার মাইল পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের আসাম সীমান্তে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমগামী হয়ে আসামের লোহিত এবং ডিবং নদের ভিতরে মিশে এই প্রবল জলধারাটি ব্রহ্মপুত্র নাম ধরেছে। রংপুর ও পাবনার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহটি যমুনা নাম নিয়ে পদ্মায় পড়েছে। আর ব্রহ্মপুত্রের পুরনো একটি ধারা বাহাদুরাবাদ থেকে ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারের কাছে গিয়ে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। বিশ্বের বড়-নদ নদীগুলির অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২,৯০০ কি মি (বিশ্বের ১৯তম নদ)।

ব্রহ্মপুত্রের জন্মকথা এরকম : মহর্ষি শান্তনু এবং তাঁর স্ত্রী অমোঘা কৈলাস পর্বতে বসবাস করতেন। গর্ভবতী অমোঘা সন্তানের পরিবর্তে একবার জলরাশি প্রসব করেন। মহর্ষি শান্তনু সেই জলরাশিকে পুত্রসন্তানরূপে গ্রহণ করেন এবং তার নাম রাখেন ব্রহ্মপুত্র। এরপর ব্রহ্মপুত্রকে তিনি কৈলাস, গন্ধমাদন, জারুধি ও সংবর্তক নামক চার পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত একটি কুণ্ডে রেখে দেন। কুণ্ডের নাম রাখা হয় ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের জল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

জমদগ্নি নামে এক মুনি তাঁর স্ত্রীর অপরাধের দণ্ড দিতে একদিন তাঁর পুত্রদের ডেকে বলেন, —'তোমরা তোমাদের মাকে হত্যা কর।' তাঁর অন্য সব পুত্ররা পিতৃআজ্ঞা লংঘন করলেও, ছোটো পুত্র পরশুরাম কুঠারাঘাতে তাঁর মাকে দু'ভাগ করে ফেলেন মাতৃহত্যার পাপে কুঠারটি পরশুরামের হাতের সঙ্গে লেগে যায়। জমদগ্নি তখন পুত্রকে বলেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডে বন্দি ব্রহ্মপুত্রকে মুক্ত করতে পারলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং তোমার হাতের কুঠার খসে পড়বে।'

পরশুরাম তখন ক্রৌঞ্চরন্ধ্র খনন করে ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করেন পরশুরামের হাতে লেগে যাওয়া কুঠারটি তখন তাঁর হাত থেকে খসে পড়লে মাতৃহত্যার পাপ থেকে পরশুরাম মুক্তি লাভ করেন। সেই থেকে হিন্দুরা ব্রহ্মপুত্রকে পুণ্যতোয়া হিসেবে মানেন এবং যাবতীয় পার্থিব পাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় বাসন্তী পূজা (দুর্গাপূজা) চলাকালীন অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্রকল্পিত জলে পুণ্যস্নান করেন

নদীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আরও একটি সঙ্গত কারণ আছে। পৃথিবীর প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল নদীর তীরে, ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে মিথুনরত

পাখির মৃত্যুদৃশ্য দেখে দস্যু রত্নাকর ক্রোধান্বিত হয়ে ব্যাধকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটিই পৃথিবীর প্রথম কবিতা দস্যু রত্নাকর তখনও কবি হয়ে ওঠেননি। তখনও পর্যন্ত তিনি ছিলেন শুধুই দস্যু রত্নাকর। মহাভারতবর্ণিত তমসা নদীর তীরে ছিল তাঁর আস্তানা। সেখানেই তিনি দস্যুবৃত্তি করে দিন কাটাতেন। মহর্ষি নারদের কৃপায় তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন এবং মিথুনরত পাখি নিধনকারী ব্যাধকে তিনি যে ভাষা ও ছন্দে অভিশাপ দেন, তাই পরবর্তীকালে তাঁকে রামায়ণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তার মানে, পৃথিবীর প্রথম কাব্যপঙ্‌ক্তিদ্বয় তমসা নামক নদীর তীরেই রচিত হয়েছিল।

চরণবদ্ধ সমান অক্ষরবিশিষ্ট বীণাদি সহযোগে গীত হওয়ার যোগ্য রত্নাকরের সেই অভিশাপ বাক্য তথা পৃথিবীর প্রথম কাব্যশ্লোকটি ছিল নিম্নরূপ

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥'

পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে এখান থেকেই ছন্দের উদ্ভব ঘটে এবং এই ছন্দ দিয়েই পরে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা করেন।

তমসা নদীর তীরে বসবাসকারী দস্যু রত্নাকর আর পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়ানো দস্যু নির্মলেন্দু গুণের মধ্যে কাল ও কাব্যশক্তি বিচারে যত দূরত্ব বা পার্থক্যই থাক না কেন, তারা একই কাব্যকলার অচ্ছেদ্যমিলে বাঁধা। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমি নিজের ভিতরে যুগপৎ একজন দস্যু রত্নাকর ও মহাকবি বাল্মীকির সহাবস্থান অনুভব করলাম। মনে হল, আমি তো একজন ছোটোখাটো দস্যু রত্নাকরও বটে আমি তো ডাকাতি মামলার আসামি ছিলাম। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হুলিয়া মাথায় নিয়ে আমাকেও কিছুকাল পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। সেই পলাতক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই আমি লিখেছি আমার হুলিয়া কবিতাটি। 'হুলিয়া'-ই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'-এর প্রথম কবিতা।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল, কী জানি বাবা, আমি হয়তো কলিযুগের বাল্মীকিই হবো। হয়তো আমার হাতেই রচিত হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য। ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরে মিথুনরত পাখিযুগলের একটিকে হত হতে দেখে বেদনাবিদ্ধ ক্রুদ্ধ রত্নাকর যদি মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত হতে পারেন, মহর্ষি নারদের কৃপা পেলে, বিশ্ববর্বর পাকসেনাবাহিনীর নির্বিচার মানবনিধনযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার মর্মবেদনা বুকে নিয়ে তবে আমিই বা বাল্মীকি হতে পারবো না কেন?

কিশোরগঞ্জ পর্ব

প্রস্তাবনা

চলতি অধ্যায়-রচনার শুরুতেই ঘটনাটি বলে নিই। আমি লক্ষ করে দেখেছি, পরে একসময় আরও সুন্দর করে বলবো ভেবে মগজের একপাশে সরিয়ে রাখা অনেক ঘটনার কথাই আর শেষতক বলা হয়ে ওঠে না। অনেক সময় ভুলে যাবার কারণে এমনটি ঘটে, আবার অনেক সময় মনে পড়লেও প্রাসঙ্গিক পটের অভাবেই জন্মের জন্য অপেক্ষমাণ গল্পটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠা আর হয়ে ওঠে না। দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই পট, নাকি পটের মধ্যে সৃষ্ট শূন্যতা দূর করার জন্য বা পটের ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রতিমাযোজন , তা বলা মুশকিল। পট আর প্রতিমা এই দুইয়ে মিলেই দুর্গা। পট যেমন দেবীর অংশ, দেবীও তেমনি পটের।

যাক, অনেক জল্পিতা হল। এবার ঘটনাটি বলি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলাকারী ঘাতকদলের হাত থেকে যে সামান্য ক'জন বেঁচে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের বয়সী ঐ ছেলেটি ১৫ আগস্টের পুরো হত্যাযজ্ঞটি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এখনও স্মৃতি থেকে সে পুরো ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে আগত দর্শকদের সামনে সে এখন ঐ কালরাত্রির ঘটনা বয়ান করে। এটাই তার চাকরি

আমি একদিন ওর মুখে ১৫ আগস্টের পুরো ঘটনার বিবরণ শুনেছি। ছেলেটির নাম কিশোর। বেশ তাগড়া জোয়ান। পরিপূর্ণ যুবক সে। তাকে ছেলে না বলে লোকটা বলা উচিত। ওর কিশোর নামটা শুনে আমার খুব হাসি পেলো। বললাম, 'এই মিয়া, তোমার নাম কেডা রাখছে? নাম বদলাও '

আমার কথা শুনে কিশোর মাটির দিকে ওর মুখ নত করে রাখলো। কী যেন ভাবলো আপন মনে। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে বললো, 'স্যার, বঙ্গবন্ধু আমারে এই নামডা দিছিলেন। তাই এই নামডা আমি আর বদলাই না। আমি রাসেল ভাইয়ার লগে খেলতাম খালাম্মা আমারে রাসেল ভাইয়ার মতোই একচোখে দেখতেন। আমরা একসঙ্গে খেলতাম, খাইতাম, ঘুমাইতাম। একদিন বঙ্গবন্ধু আমারে কাছে ডাইক্যা আমার নাম জিগাইলেন। আমি আমার নাম কইলাম। নাম শুইনা তিনি খুশি অইলেন না। কইলেন, তোর বাড়ি কই? আমি

কইলাম, কিশোরগঞ্জ সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বঙ্গবন্ধু কইলেন, '...বা, আইজ থিইক্যা তোর নাম হইলো গিয়া কিশোর।'

'তারপর থিইক্যা সবাই আমারে কিশোর বইল্যাই ডাকতো অহনও ডাকে। আব্বাও ডাকেন। ঐ নাম হুনলে আমারও কষ্ট অয়। কিন্তু স্যার, কষ্ট অইলেও এই নাম আমি বদলাইতাম না।'

আমি লজ্জা পেয়ে কিশোরকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'এই ঘটনাটি জানলে আমি কি আর তোমার নাম বদলাতে বলতাম? কী সৌভাগ্য তোমার যে, বঙ্গবন্ধু তোমার নাম রেখেছেন। তোমার নাম বদলালে বাংলাদেশের নামটাও তো বদলাতে হয়। তুমি বরং কিশোর নাম নিয়েই বাঙালি জাতির হৃদয়মন্দিরে হাজার বছর বেঁচে থাকো, ভাই।'

বঙ্গবন্ধুর শব্দচয়ন-ক্ষমতা যে কতটা সহজাত, কতটা প্রখর ও লক্ষ্যভেদী ছিল, কিশোরের নামকরণ থেকে তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া গেলো। রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে নয়, আমি বঙ্গবন্ধুকে কবিত্বশক্তির অধিকারী বলে মানি এজন্যই তিনি শব্দ নিয়ে খেলতে জানতেন।

পাঠকের কি মনে হয় না যে, কিশোরগঞ্জ পর্বের শুরুতে, অশ্রুজলে লেখা ঐ গল্পটি ঠিক যথাস্থানেই সংস্থাপিত হয়েছে?

পুরাতন ময়মনসিংহকথা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও শহীদ ডাক্তার সমর কর

ময়মনসিংহ ছিল ব্রিটিশভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। প্রথম স্থানে ছিল বিশাখাপত্তম (অন্ধ্র প্রদেশ)। ময়মনসিংহের অন্তর্গত পঞ্চমহকুমাগুলো ছিল যথাক্রমে ময়মনসিংহ সদর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও টাঙ্গাইল। ভাবা যায়, পাঁচটি মহকুমা নিয়ে একটি জেলা? অথচ ময়মনসিংহের আকৃতি ছিল বিশ্বের কিছুসংখ্যক দেশের চেয়েও বড়। আর লোকসংখ্যাবিচারে ঘনবসতিপূর্ণ ময়মনসিংহের স্থান মনে হয় বিশাখাপত্তম নয় শুধু, কিছু কিছু দেশের চেয়েও এগিয়ে ছিল এ নিয়ে ময়মনসিংহের মানুষদের মধ্যে ছিল একটা পৃথক গর্ববোধ। তার সঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গৌরব যুক্ত হলে ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে আমার ভিতরে একধরনের কালচারাল অহং ও আঞ্চলিক-সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আমার মনে হতো আমার পায়ের তলায় যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র শক্ত মাটি আছে, তেমনটি আর কারও পায়ের তলায় নেই। আমি এক অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী। আমার অতিনিকট পূর্বপুরুষ ও রমণীগণ (যথা চন্দ্রাবতী) কাব্য ও পালাগান রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' পাঠান্তে রোমাঁ রোলাঁ মন্তব্য করেছিলেন,

> 'I was specia.,y delighted with the touchıng story of Madına which although only two centunes o.d ıs an antique beauty and a purıty of sentiment which art has rendered faithfully without changıng ıt. Chandravatı ıs a very noble story and Madına, Kanka and Lıla are charmıng.'

শিল্পাচার্য উইলিয়াম রদেনস্টাইন বলেছিলেন: 'এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'

তবে আমি মনে করি, পশ্চিমা মনীষীদের মধ্যে যিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অভ্যন্তরের সত্যিকারের সুপ্ত-শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর নাম উইলিয়াম ডি এ্যালেন। মার্কিন লেখক ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি স্বাধীনচেতা বাঙালির সুপ্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পান, যা বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এ পূর্ণবিভায় প্রকাশিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

তিনি বলেছিলেন : 'গীতিকাব্যগুলি পড়িয়া মনে হইলো বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারায় নাই।'

> 'In these Mymensing ballads I found an instinct for original thinking, countless instances of individual ... *swaraj* and a high value attached to deeds in contrast to passiveness. all of which confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless bearing within it the roots of unweakening youth.
> For an occidental to doubt the essential unity of East and West is impossible if he has the pictures and emotions awakened by these ballads in his mind. The same love of nature, the same desire for freedom, the same exaltation of the individual's right to live happily which we are proud to discover in our literatures we find in these songs by and for the simple peasants of Bengal.
>
> (Eastern Bengal Ballads Vol 4 Part I
> Calcutta University Published in 1932.)

পাকিস্তানের শেষ দিকে, টাঙ্গাইল (১৯৬৮) মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইলের বিচ্ছিন্ন করাটাকে আমি মন থেকে কখনও সমর্থন করতে পারিনি। বাংলাদেশ হওয়ার পর, ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহের অবশিষ্ট মহকুমাগুলোকেও জেলার মর্যাদা দিয়ে ময়মনসিংহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একদিকে ময়মনসিংহবাসীকে তার দীর্ঘলালিত বড়ত্বের গৌরব থেকে যেমন বঞ্চিত করা হয়, তেমনি এর খণ্ডীকরণের ফলে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও তার নামকরণের তাৎপর্য হারায়। কেননা, 'মৈমনসিংহ গীতিকার' পালাগুলির রচয়িতারা হয় কিশোরগঞ্জ নয় নেত্রকোণার কবি ছিলেন। বর্তমানের অবশিষ্ট ময়মনসিংহের সঙ্গে তাদের জন্মকর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের ঘটনাটির মধ্যে আমার কষ্টের কারণ ছিল ব্যাপক হারে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুহারা হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার মতো অমানবিক সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নিহিত। ভারতের খণ্ডিত হওয়ার বেদনা সেখানে আদৌ মুখ্য ছিল না। আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জাতক, প্রজাপীড়ক রাষ্ট্র হিসেবে সমরশাসিত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামে আমি তো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নিজেই সানন্দে শরিক হয়েছি। সেই সংগ্রামের সাফল্য অনেকের মতো আমারও চিরআনন্দের সঞ্চয়। ক্রমশ ছোটো হতে অভ্যস্ত সেই আমি, ময়মনসিংহ-ভাগটাকে আজও মন থেকে

মানতে পারিনি। আমার মতো অনেকেই যে তা পারেননি, তার প্রমাণ পাই যখন রাজধানী ঢাকার কোনো মিলনায়তনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের কোনো অনুষ্ঠানে আমরা মিলিত হই তখন আমি খুব স্মৃতিকাতর বোধ করি। মনে হয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই ময়মনসিংহ জেলাটাকে অখণ্ড রাখা দরকার ছিল। এখনও তা করা যেতে পারে। তাতে বহির্বিশ্বে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি পাবে

৩ এপ্রিল নরসিংদির মনোহরদিতে রাত কাটিয়ে, পরদিন ৪ এপ্রিল গ্রীষ্মশুষ্ক পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে মঠখলা বাজার দিয়ে আমরা কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করি। তখন কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করার মানে ছিল, আমার জন্মজেলা মৈমনসিংহের প্রিয়-পবিত্র মাটিতে পা রাখা। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। অজস্র মৃত্যুকে পেছনে ফেলে শেষপর্যন্ত আমার জন্মজেলায় তাহলে পৌঁছুতে পারলাম।

মৈমনসিংহের অন্তর্গত বলে নয়, কিশোরগঞ্জ জায়গাটা আমার কাছে আরও একটি বিশেষ কারণে খুবই আপন ছিল। কিশোরগঞ্জ হচ্ছে আমার মামাবাড়ি। আমার মা ছিলেন অষ্টগ্রামের পূর্ব-পাড়ার সুখ্যাত দত্তবংশের মেয়ে। সত্যমিথ্যা জানি না, আমার বড়-মাসিমার (বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. অসীম রায়ের মাতা) মুখে শুনেছি, মনসামঙ্গলের আদিকবি কানাহরি দত্ত নাকি তাদের পূর্ব-পুরুষ। আমার মায়ের 'পদ্মপুরাণ' মুখস্থ থাকার কারণ নাকি সেটাই। আমার বাল্যকালে, আমার বয়স যখন চারের কাছাকাছি, আমার মা অল্পবয়সে মারা যান। আমাদের অনেকগুলো ভাই বোনের কথা ভেবে আমার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবার কিশোরগঞ্জ সীমান্তবর্তী কেন্দুয়ার নওহাটা গ্রাম। এবারও সেই দত্তবংশে

অষ্টগ্রামে আমার মামাদের পরিবারের কেউ বাস করেন না। আমাকে মামাবাড়ি ভ্রমণের সুযোগ না দিয়েই দেশভাগের পরপর তারা জন্মগ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যান। তাই অষ্টগ্রামের মামাবাড়িতে আমরা কখনও যাওয়া হয়ে উঠেনি। হিন্দু-উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী ভাগনেদের জন্য মামাছাড়া মামাবাড়িই হচ্ছে অতি উত্তম স্থান। কেননা, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে মামাদের অবর্তমানে ভাগনেরাই মাতুলসম্পদের মালিক হয়। প্রবাদ আছে

'মামা দিলো দুধ-ভাত
দুয়ারে বইসা খাই
মামী আইলো লাঠি লইয়া
পালাই পালাই।'

আমার বেলায় মামীদের লাঠি নিয়ে আসার কোনো ভয় ছিল না। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মতো হিন্দু উত্তরাধিকার আইনও যদি তার নিজস্ব গতিতে

চলতো, যদি চলতে পারতো, তাহলে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' –অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বর পাটনীর এই অপত্যপ্রার্থনা আমার মতো পাকিস্তানে থেকে যাওয়া অনেক হিন্দুর জন্যই সত্য হতে পারতো। কিন্তু হয়নি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই জঘন্য সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকার এনিমি প্রপার্টি বা শত্রুসম্পত্তি আইন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মাজা ভেঙে দেয় মাতুল সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, স্ব স্ব পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষার জন্যই তাদের মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় তাই, মামার বাড়ির কলা খাওয়ার সহজ চিন্তাটাকে আমরা যে তখন মাথায় তুলিনি, তার পেছনে কার্যকর ছিল আমার পরিত্যক্ত মামাবাড়িতে অবস্থানগ্রহণকারী 'পুরুষ মামী'দের লাঠির ভয়।

আমার প্রথম মামাবাড়ি অষ্টগ্রামে না গেলেও, স্কুলের ছাত্রাবস্থায় আমার দ্বিতীয় মাতুলালয় নান্দাইলের নওহাটা গ্রামের মামাবাড়িতে আমি একাধিকবার গিয়েছি। নান্দাইল রোড রেল স্টেশনে নেমে জননিন্দিত মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন সাহেবের তৈরি করা নান্দাইল-তাড়াইল সড়ক ধরে নওহাটা যেতে হতো। বিরাট উঁচু ও চওড়া সড়ক। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে ঐ সড়কটি নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিল। তাই ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুজিব-প্লাবনে অন্য সবাই খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেও ভাষা-অন্দোলনের শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েও নুরুল আমীন ভেসে যাননি। তাঁর শাসনামলে তৈরি ঐ পথিকপাগলকরা সড়কটির জন্যই এলাকার কৃতজ্ঞ মানুষ নুরুল আমীনকে ভোট দিয়েছিল, যার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন পাকিস্তানের মৃত্যুশয্যায় কিছুদিনের জন্য পূর্ণ-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। যদিও পূর্ণ-পাকিস্তান বলতে তখন বাস্তব অর্থে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝাতো।

কলেজে উঠেও আমি নওহাটা গ্রামে গিয়েছি। সেখানে আমার একজন মামা ছিলেন, বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও ফেল করার কারণে কলেজ জীবনে আগনের সহপাঠী হয়েছিলেন। ছিলেন আমার অত্যন্ত সুরসিকা ও সুন্দরী বৃদ্ধা দিদিমা ও তাদের কিছু জ্ঞাতিপরিজন। ছিলেন আমার মামার আপন কাকা, হেডমাস্টার দাদু। তাঁর নাম ব্রজেন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন পুরুরা হাইস্কুলের হেডমাস্টার। আমার মামাবাড়ির পাশের বাড়িতে ছিলেন এক ডাক্তার দাদু। তাঁর নাম সমর কর। কলকাতা থেকে এলএমএফ পাশ করার পর গণ্ডগ্রামে ফিরে এসে এখানেই ডাক্তারি পেশা জমিয়ে বসেছেন। তিনি গ্রামের গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। সঙ্গত কারণেই এলাকায় তাঁর খুব নামডাক। তাঁর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। সাহিত্যপ্রাণা। শ্যামবর্ণা। সুন্দরী স্মার্ট স্বামীর ব্রতই তারও ব্রত তিনি প্রচুর বই পড়েন। বাড়িতে বাংলাভাষার নামীদামী

লেখকদের মূল্যবান পুস্তকসমৃদ্ধ ছিল তাঁর পাঠাগার। সেখানে গেলে আমি তাদের পাঠাগার থেকে ইচ্ছে মতো পছন্দের বই নিয়ে পড়তে পারতাম। সুদূর কলকাতা থেকে আমার ডাক্তার দিদিমার নামে দেশ ও নবকল্লোল পত্রিকার পুজো সংখ্যা ডাকে আসতো। আমি যে কবিতা লিখি, কবি হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তা আমার ডাক্তার দাদু ও দিদিমা জানতেন। ফলে তারা আমাকে যদু-মধুর মতো না দেখে, একটু আলাদা খাতির করতেন। নওহাটায় গেলে আমি ঐ বাড়িতেই বেশি সময় কাটাতাম। আমি অনেকবার ঐ নিঃসন্তান ব্রতচারী দম্পতিকে আমার সদ্যরচিত কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছি। বিশেষ করে আমার ডাক্তার দিদিমাটি আমার কবিতার একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন। অপ্রাপ্য প্রশংসা করে তিনি আমাকে কবিতা রচনায় নিরন্তর উৎসাহ দিতেন। বলতেন, 'কবি হবে কি? তুমি তো কবিই। নাও, আরেকটা শোনাও।'

আমিও বোকার মতো তখন আরেকটা কবিতা পড়তাম। আমাদের কাণ্ড দেখে ডাক্তার দাদু মুচকি হাসতেন। সেই হাসির ভিতরে, এখন বুঝি অবশ্যই কিছু রহস্য ছিল।

কিশোরগঞ্জের মাটিতে প্রবেশ করার পর আমার বৃদ্ধা স্নেহময়ী দিদিমা বা আমার মামার চেয়েও ঐ কাব্যানুরাগী দম্পতির কথাই আমার বেশি করে মনে পড়লো। কতদিন সেখানে যাওয়া হয়নি। কতদিন তাঁদের দেখি না। আজ আমি যখন সত্যি সত্যি কিছুটা কবিখ্যাতি লাভ করেছি বা করতে চলেছি, যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয়েছে, তখন ডাক্তার দাদু আর দিদিমার হাতে আমি যদি আমার কবিতার বইটি তুলে দিতে পারতাম! আহা, কী খুশিই না তাঁরা হতেন।

কিশোরগঞ্জের কোর্ট রোডে আমার এক মাসির বাড়ি। নন্দী বাড়ি। ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়ে কালই আমি নেত্রকোণার উদ্দেশে রওয়ানা দিবো। নান্দাইল হয়েই আমাকে নেত্রকোণায় যেতে হবে। নান্দাইল থেকে নওহাটা বড় জোর মাইল দুয়েকের পথ। পথিকপাগলকরা সেই সবুজ ঘাসবিছানো সড়কপথ ধরে একবার যাবো নাকি নওহাটায়? ভাবি, কিন্তু মন স্থির করতে পারি না। আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে অপেক্ষমাণ মা-বাবা-ভাই-বোনের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কথা ভেবেই আমার মনের ভিতরে কুঁড়িমেলা ভাবনাটাকে আমি সেদিন ফুলের মতো পাপড়ি মেলে ফুটতে দেইনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মাতুলালয়ে যাবার চেয়ে আপন আলয়ে ফিরে যাবার দিকেই আমার দেহ-মনের সায় মিলেছিল। কুলায় ফেরা পাখির মতো আমি নিজগৃহে ফেরার জন্যই তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার নিদ্রার মধ্যেও আমার দিদিমা হানা দিলেন। মনের ভিতরে গুনগুনিয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান:

এ পথে আমি যে গেছি বারবার ভুলিনি তো এক দিনও
আজি কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার উঠিল বনের তৃণ॥

একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সঙ্কেত আছে লীন ॥

সেদিন বুঝিনি, 'আত্মকথা ১৯৭১'-এর বর্তমান অধ্যায়টি লিখতে বসে আজ মনে হচ্ছে, আমার ঐ দিদিমাটি বোধহয় তাঁর অজান্তেই এই নবীন কবির প্রেমে পড়েছিলেন। অথবা এই নবীন কবিটিই পড়েছিল তাঁর প্রেমে। না হলে, এতো গান থাকতে, এই গানটিই আজ আমার মনে পড়বে কেন?

ছয়ত্রিশ বছর পর, আজ যখন আমার আত্মকথায় আমি তাঁদের কথা লিখছি, তাঁদের কথা ভাবছি ; তখন স্মৃতির মণিকোঠায় ঘুমিয়ে পড়া সেই ব্রতচারী দম্পতির কথা ভেবে আমার মন তীব্র অনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। অমিয় চক্রবর্তী আমার কর্ণকুহরে আবৃত্তি করে চলেছেন,... 'কেঁদেও পাবে না তারে, বর্ষার অজস্র জলধারে।'

ঠিকই বলেছেন কবি। আমি তাঁদের আর কোথাও কখনও খুঁজে পাবো না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলবদরের হাতে আমার দাদু, ডাক্তার সমর কর নিহত হন। প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে আমার হতভাগিনী দিদিমাটি তাঁর পালিতা কন্যাটিকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং সম্প্রতি তিনিও কলকাতার শহরতলী বেলঘরিয়ায় লোকান্তরিত হয়েছেন।

গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র মানুষদের ভালোবেসে আমার ডাক্তার দাদু সমর কর মহাশয় কলকাতায় বসবাস না করে নওহাটার মতো একটা গণ্ডগ্রামকেই তাঁর কর্মজীবনের আপন আবাস বলে গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর জন্য একটা জনহিতকর ব্রত। তিনি ভাবতেও পারেননি, তাঁর এলাকার কিছু মানুষের হাতে তাঁকে কোনোদিন এভাবে প্রাণ দিতে হতে পারে। তাই পঁচিশে মার্চের পরও তিনি জন্মগ্রাম ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাননি। হয়তো রবীন্দ্রবচনকেই সত্য জ্ঞান করে তিনি ভেবেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। হায়রে মুক্তিযুদ্ধ, হায়রে নিষ্ঠুর! কতো মহত্ত প্রাণকেই না অকাতরে হরণ করলি তুই রক্তপায়ী রাক্ষুসীর মতো কতো নির্দোষ-নিরপরাধ-নিষ্পাপ প্রেমাংশুর রক্তই না পান করলে তুমি

নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। কে জানে, আমি যদি পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নীল-নকশাটি সম্পর্কে আমার ডাক্তার দাদুকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম, যা আমি বিটিভির প্রযোজক

অগ্রজপ্রতিম বেলাল বেগের কাছ থেকে শুনেছিলাম; তাহলে তিনি হয়তো নওহাটার মাটি ও মানুষের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে তাঁর জীবন বাঁচাতেও পারতেন। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর ব্রতপালনকারী ডাক্তার সমর করকে পাকসেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা আলবদরদের হাতে হয়তো এভাবে প্রাণ দিতে হতো না। আবার ভাবি, কী জানি, এমনও তো হতে পারতো যে, পাকিস্তানের দোসর নুরুল আমীনের লোকজন আমার মতো মুজিবভক্ত কবিকে বাগে পেলে ডাক্তার সমর করের আগে আমাকেই বধ করতো।

বেঁচে আছি বলেই না আজ ডাক্তার সমর করের কথা আমি লিখতে পারছি, তিনি বেঁচে থাকলে তো আর আমার কথা লিখতে পারতেন না। লিখতে পারলেই বা তা ছাপতো কে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কত শহীদের মৃত্যুকথাই তো লেখা হয়নি। হবে না।

২

আমাকে ডাক্তার দাদুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য শহীদ সমর করের ছোটো ভাই যতীন্দ্র কর এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, দেবী মাসির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। দেবী মাসি একইসঙ্গে আমার মামীও হন। আমার মামা প্রদীপ দত্ত ভালোবেসে পাশের বাড়ির দেবী মাসিকে বিবাহ করেছিলেন। আমার মামার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে তাঁকে আমি দেবী মাসি বলেই সম্বোধন করতাম দেবী মাসির দেবী মামীতে পরিণত হওয়ার পূর্বের ঘটনা বর্ণনায় তাই তাঁর প্রসঙ্গে মাসি সম্বোধনটাই আমার বেশি মনে আসছে। অল্পবয়সে আমার মামা প্রদীপ দত্ত হার্ট-এট্যাকে মারা যান। ময়মনসিংহ শহরের আঠারোবাড়িতে তাদের একটি নিজের বাড়ি আছে। গ্রামের জমি বিক্রি করে আমার মামা ঐ বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন।

মাঝখানের দীর্ঘ বিরতির পর দেবী মাসির সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। তিনি আমাকে পেয়ে খুব খুশি হন। কিন্তু ডাক্তার সমর করের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি কাগজে লিখেছি, এই তথ্যটি শোনামাত্র তাঁর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর মুহূর্তের মধ্যে বেদনায় ভারী হয়ে আসে। যে দুঃসহ স্মৃতিকে তিনি মনের গভীরে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলেন, আমার লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুকের সেই ঘুমন্ত বেদনাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার জন্য আমার একটু খারাপও লাগলো। জীবনানন্দ বলেছেন, কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? আবার ভাবি, বাইরের জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ার বেলায় মানুষ ফাঁকি দিতে পারলেও, অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়ার বেলায় সেই ফাঁকি চলে না। দুঃখ যখন গোপনে

গোকুলে বাড়ে, তখনই মানুষ তার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। সত্য যত কঠিনই হোক, প্রকাশ্য স্বীকৃতির মধ্যেই তার স্বস্তি সত্যিকারের স্থায়ী হয়।

তাই দেবী মাসি যখন বললেন, 'এইসব লিখে কী লাভ? বাদ দেও ' তখন আমি বললাম, 'আমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বই লিখছি বলেই এই ঘটনাটি আমার কাছে এতো প্রাসঙ্গিক। আমি চাই আমাদের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা তাঁদের অমূল্য জীবন দিয়ে গেছেন, সেইসব মহান শহীদদের গৌরব-তালিকায় আমার দাদুর নামটিও যুক্ত হোক।'

একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে মুঠোফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে তিনি আমার যুক্তির যথার্থতা স্বীকার করলেন বললেন, 'ঠিক আছে, বলো কী জানতে চাও।'

আমার ধারণা ছিল, শহীদ সমর ডাক্তারের একমাত্র ছোটোভাই অর্থাৎ দেবী মাসির পিতা যতীন্দ্র করের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে দেবী মাসি জানালেন, ..'না, ঐ রাতে আমার বাবাকেই ওরা আগে হত্যা করেছিল। তারপর জ্যেঠামশাইকে। ওরা জানতো, আমার বাবাকে না মেরে জ্যেঠামশাইকে মারা যাবে না তুমি তো জানো তিনি কেমন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

১৯৭১ সালে রাজাকারদের হাতে আমার ডাক্তার দাদুর নিহত হওয়ার কথা জানলেও, দেবী মাসির বাবার নিহত হওয়ার বিষয়টি আমি ঠিক জানতাম না বলে আমার ভারী লজ্জা হল। কিছুটা অপরাধী বলেও মনে হল নিজেকে। সাহিত্যমনা ছিলেন না বলে উনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব গভীর ছিল না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। দেবী মাসির কাছে আমি জানতে চাইলাম, 'ঐ হত্যাকাণ্ডের তারিখটি আপনার মনে আছে?'

কান্নাজড়িত অভিমানী কণ্ঠে তিনি বললেন, 'কোনো সন্তান কখনও তাঁর পিতার মৃত্যুতারিখ ভুলে যেতে পারে? বিশেষ করে মৃত্যুটি যদি হয় এরকমের একটি অপঘাত-মৃত্যু?'

তাঁর কাছে আমি শুধু হত্যাকাণ্ডের তারিখটি জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তারিখের সঙ্গে মৃত্যুবারটিও আমাকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'তারিখটি ছিল ৮ জ্যৈষ্ঠ, বার ছিল শুক্রবার। ইংরেজী তারিখটি ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ২৩ মে, ১৯৭১।'

নির্মম হত্যাকাণ্ডটি কীভাবে ঘটেছিল, জানতে চাইলে তিনি জানান, 'রাত বারোটার দিকে প্রায় জনা পঞ্চাশেক রাজাকার এসে আমাদের বাড়িটিকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন অস্ত্রহাতে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে আমাদের শয়ন ঘরের দরোজা ভেঙে আমার বাবাকেই প্রথমে গুলি করে হত্যা করে। তিনি প্রাণ বাঁচাতে খাটের নিচে লুকাতে যাচ্ছিলেন।

খুনীরা সেখান থেকে তাঁকে টেনে বের করে এবং তাঁর বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে উপর্যুপরি গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে পালানোর পরিবর্তে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে খুনীদের নিবৃত্ত করার জন্য আমার জ্যেঠামশাই (সমর ডাক্তার) নিজের শয়নঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আর ঘরের বাইরে আসামাত্র তারা তাঁকে খুব কাছে থেকে গুলি করে হত্যা করে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বিশাল বিত্তবৈভব ও সুকৃতির অধিকারী দুই সহোদরের জীবনাবসান হয়। তারপর হত্যাকারীরা বাড়িঘর লুট করে সোনাদানাসহ যা পায়, সবই নিয়ে যায়। গ্রামের লোকজন সতর্ক দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করে যুগপৎ ঐ হত্যাকাণ্ড ও হত্যাপরবর্তী সম্পদ-লুণ্ঠনপর্বটি রাতভর প্রত্যক্ষ করে। সাহস করে তখন কেউ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।'

পবিত্র পাকিস্তান ও তার ততোধিক পবিত্র অখণ্ডতা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানের ধর্মপুত্ররা সেই রাতে কর-পরিবারের অভিভাবকহীন অসহায় মহিলা ও মেয়েদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিল, দেবী মাসিকে ঐ প্রশ্ন করার সাহস আমার হয়নি। পাঠক, আপনার সাহস হলে আপনি ঐ প্রশ্নটি তাঁকে করতে পারেন। আমাকে ক্ষমা করবেন

পরদিন শনিবার সকাল এগারোটার দিকে গরু-মরার সংবাদ পেয়ে উড়ে আসা শকুনের মতো কেন্দুয়া থানার পুলিশ অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে নওহাটা কর-বাড়িতে ঘটনার তদন্তে আসে এবং আমার দুই দাদুর নিথর মরদেহ হোগলার চাটাই দিয়ে বেঁধে পোস্টমর্টেমের কথা বলে দূরবর্তী কেন্দুয়া থানায় নিয়ে যায়

আমার ডাক্তার দাদু, সমরেন্দ্র কর, আগেই বলেছি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর ছোটো ভাই যতীন্দ্র করের (তাঁর ডাক নাম ধনা কর, নামী ফুটবলার) ছিল চার-কন্যা। তাঁরও কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। বিশাল বাড়িতে পুরুষ বলতে ছিল ঐ দু'জনই

রাতে তো নয়ই, পরদিনও গ্রামবাসী বা প্রতিবেশীরা ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছিল পোস্টমার্টেম শেষে তাদের মরদেহ ফেরত আনার জন্য পুলিশের সঙ্গে কেন্দুয়া থানায় যাবার মতো কাউকেই পাওয়া যায়নি

পাকসেনাদের হাতে কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোণার পতন ঘটায় কেন্দুয়া থানায় পাকসেনারা অবস্থান নিয়েছিল। তখন কেন্দুয়া যাওয়ার মানে হতো আগ বাড়িয়ে বাঘের খাঁচায় গলা ঢুকানো।

কেন্দুয়ায় ঐ হতভাগ্য ভ্রাতৃযুগলের মরদেহের পোস্টমার্টেম সত্যিই হয়েছিল কি না, তা তাদের পরিবারের কেউ তো নয়ই, এলাকার অন্যেরাও জানে না। কী করে জানবে? ১৯৭১ সালে কে কার খবর রাখে? ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি ফেরা

পথে আমি নিজেই তো কত মৃতদেহ ডিঙিয়ে এসেছি। ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি তাদের মুখ। আমার দুই দাদুর মরদেহের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী জুটেছিল? চিরপ্রণম্য অগ্নি নাকি বাংলাদেশের সর্বংসহা মাটি, তা আজ পর্যন্ত তাদের পরিবারের কেউ জানতেও পারেনি। আমার নিজের ধারণা— ভয়ার্ত কুকুর, ক্ষুধার্ত শকুন আর পাগলা শৃগালের খাদ্য হয়েছিল তাদের শব ও হৃদয়।

মুক্তিযুদ্ধের বলি, আমার দুই শহীদ-দাদুর ছোটোগল্পটি এখানেই শেষ ভগবান তাঁদের আত্মার সদগতি করুন।

সাইফুলদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করি। অনেকটা সময় আমরা একসঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি। অনেকটা দুর্গম পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি একসঙ্গে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সাইফুল আমাকে ওদের বাড়িতে যেতে বলেছিল। শহরের কাছেই ওদের বাড়ি। আমি যাইনি। আমার একজন মাসি (আমার মায়ের মাসতুতো বোন) আছেন এই শহরে। কিশোরগঞ্জ কোর্টের কাছে তাদের নিজেদের বাড়ি। নন্দী বাড়ি। শহরের মানুষজনের মধ্যে নন্দী বাড়ি বেশ পরিচিত। মেট্রিক পাস করার পর, ১৯৬২ সালে আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হই। কিশোরগঞ্জের প্রতি আমার বাবার দুর্বলতার সঙ্গত কারণ ছিল। তখন গুরুদয়াল কলেজটি কতটা গুরু আর কতটা দয়াল ও কিশোরগঞ্জ শহরটি কেমন—, তা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার জন্য আমি এই শহরে বেড়াতে এসেছিলাম। তখন গুরুদয়াল কলেজ বা কিশোরগঞ্জ শহরটি আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। আমার মনের ভিতরে ছিল আরও বড়-শহরের টান। তাই আরও বড় শহরের টানে আমি ভর্তি হই ময়মনসিংহের আনন্দমোহনে।

দশ বছর আগে, প্রথমবারের মতো কিশোরগঞ্জে এসে আমি উঠেছিলাম ঐ নন্দী বাড়িতে। সেখানে আমার সমবয়সী এক মাসতুতো ভাই আছে। তার নাম বাবু বাবু জানে আমি কবিতা লিখি। বাবু আমার কবিতার ভক্ত। অনেকটা বাবুর আকর্ষণেও সাইফুলদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নন্দী বাড়িতে যাই। অনেকদিন পর আমাকে কাছে পেয়ে বাসার সবাই খুব খুশি। বাবুর তো কথাই নেই ভর-সন্ধ্যায় মাসিমা ডাল ভাত রান্না করে আমাকে যত্ন করে খাওয়ান।

আমি ভাত খেতে খেতে গত কিছুদিন ধরে ঢাকা ও জিঞ্জিরায় যা ঘটেছে, তার যথাসম্ভব বর্ণনা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবুর মাধ্যমে আমার আগমন সংবাদ এলাকায় রটে যায়। ফলে আমাকে একনজর দেখার জন্য আশপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন এসে ভিড় করে। আমি যে কবি, ঐ মূল্যবান তথ্যটি প্রচার করতেও বাবু বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। সেখানকার কিছু তরুণ কবিও আমার সঙ্গে

পরিচিত হতে আসে আমাকে কিছুই বলতে হয় না, আমার সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইটি ঝোলা থেকে বের করে বাবু জনে জনে দেখাতে শুরু করলে এক পর্যায়ে আমার মুখচ্ছবি দিয়ে তৈরি করা প্রচ্ছদ-সম্বলিত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি কতিপয় কোমল কুমারী হাতের পরশও লাভ করে। তাতে আমার খুব আনন্দ হয়। একে তো আমি রক্তচোষা বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর পাকসেনাদের খাঁচা থেকে প্রাণে বেঁচে আসা, তারপর আবার উঠতি তরুণ কবি—, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বেশকিছু উৎসুক মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হই।

কোর্ট রোডের একটি চায়ের স্টলে আমাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটি ছোটোখাটো সাহিত্য ও রাজনীতির আড্ডা জমে ওঠে। সেই সন্ধ্যার আড্ডায় উপস্থিত কারও নাম আজ আর আমার মনে পড়ে না। কিন্তু ঐ সন্ধ্যার জম্পেশ আড্ডাটির স্মৃতি আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে, কখন পাকবাহিনীর হাতে কিশোরগঞ্জের পতন ঘটবে, এই নিয়ে চায়ের স্টলে বিস্তর জল্পনাকল্পনা চলছিল। ঐ চায়ের স্টলেই জানতে পাই, আমরা চলে আসার পরপরই (৪ এপ্রিল, সকাল দশটার দিকে) নরসিংদি বাজারে বিমান থেকে পাকসেনারা নাপাম বোমা ফেলেছে তাতে বেশকিছু মানুষ মারা গেছে। আগুনে পুড়ে গেছে বহু দোকান ও বাড়িঘর। নরসিংদিতে ভাগ্যিস আমরা থাকিনি। ঐরকমের বিমান আক্রমণের ভয়েই আমরা আগের দিন রাতে শিবপুর পেরিয়ে একেবারে কিশোরগঞ্জ সীমান্তবর্তী মনোহরদিতে চলে এসেছিলাম নরসিংদিতে থাকলে আজ সকালে (৪ এপ্রিল) নির্ঘাত পাকসেনাদের বিমান হামলার মুখে পড়তে হতো আমাদের। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

আমি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লিখছি জেনে সমপ্রতি নরসিংদির একজন গবেষক-লেখক, সরকার আবুল কালাম ঢাকার নিখিল প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী নিখিল শীলের সঙ্গে আমার বাসায় এসেছিলেন। তাঁর দু'টি বই আছে নরসিংদির মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে লেখা। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ৪ এপ্রিল ও ৫ এপ্রিল— পরপর দু'দিন পাকসেনারা বিমান থেকে নরসিংদি বাজার ও তার আশপাশের এলাকা লক্ষ্য করে নাপাম বোমা বর্ষণ করে এবং মেশিনগান থেকে স্ট্রাফিং করে। লেখকের বিশিষ্ট বন্ধু আবদুল খালেক সেদিন নরসিংদি বাজারে বোমার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। তিনি নিজে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। সেদিন নরসিংদি বাজারের বেশ কিছু জেলে বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিমান আক্রমণের কভারে পাকসেনারা দ্রুত নরসিংদি বাজারে প্রবেশ করে এবং হিন্দু ও আওয়ামী লীগারদের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট চিহ্নিত করে সেগুলি লুট করার জন্য স্থানীয় লোকজনকে প্ররোচিত করে পাকসেনাদের প্রত্যক্ষ মদদে তখন নরসিংদিতে শুরু হয় লুটপাটের মহোৎসব।

কিশোরগঞ্জ তখনও পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল। আমি অনেকের মুখেই কিশোরগঞ্জের জনপ্রিয় এসডিও (মহকুমা প্রশাসক) জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর সুনাম শুনতে পাই। কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোণা পর্যন্ত কীভাবে যাবো তাই নিয়ে যখন ভাবছি, তখন বাবুর এক বন্ধু আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আমার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোটো হলেও তরুণটি দারুণ সাহসী। একনিষ্ঠ মুজিব সৈনিক নাম ভুলে গেছি। সত্যি বলতে কি ওর চেহারাটাও ঠিক মনে করতে পারছি না। আমার হুলিয়া কবিতাটি সে পড়েছে এবং কবিতাটি নাকি তার খুব ভালো লেগেছে সেকারণে সে আমাকে মোটর সাইকেলে করে নেত্রকোণা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি। তার একটাই শর্ত, কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোণা আসা যাওয়ার জন্য পেট্রোল জোগাড় করার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। তখন খোলা বাজারে পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছিল না। কিশোরগঞ্জের এসডিও সব পেট্রোল অধিগ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত কাজেই শুধু ঐ পেট্রোল ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থির হল, আমি কাল সকালে আমার কবিতার বই প্রেমাংশুর রক্ত চাই হাতে নিয়ে মাননীয় মহকুমা প্রশাসকের কাছে গিয়ে তাঁকে বলবো, আমার ভ্রমণকষ্ট লাঘব করার জন্য কিছু পেট্রোল চাই বাবু বললো, ভদ্রলোক খুব সাহিত্যামোদী, সংস্কৃতিমন মানুষ। তাঁর স্ত্রীও লেখেন উপস্থিত সবারই ধারণা, প্রয়োজনীয় তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে খালি হাতে বিদায় করবেন না। আমাকে নিশ্চয়ই পেট্রোল দেবেন।

৩

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, কলকাতার আকাশবাণী ও বিবিসি-র সংবাদ শুনে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার সমর্থক রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং ঐ তালিকায় প্রতিদিনই নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। তাতে মুক্তিযুদ্ধে গতির সঞ্চার হচ্ছে ভারত সরকার গণহত্যা চালানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় নিন্দা-প্রস্তাব এনেই ক্ষান্ত হয়নি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় অনুমতিও দিয়েছেন। পাকিস্তানী বিমান আমাদের মুক্তাঞ্চলগুলো নিজেদের দখলে নেবার জন্য তাদের পদাতিক বাহিনীকে যত সাহায্যই করুক না কেন, তাতে তাদের যতই আপাতসাফল্য আসুক না কেন, অত্যাচারী পাকিস্তানী কংশরাজকে বধিবে যে, ভারতে গোপনে বাড়িছে সে আপাতত কিছুটা গোপনীয়তা রক্ষা করে চললেও, ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান

সমর্থন ও কংগ্রেস শাসিত ভারত সরকারের ভূমিকা দৃষ্টে বোঝা যাচ্ছিল যে, অচিরেই সেই গোপন আঁচলখানি খসে যাবে, উড়ে যাবে এবং একসময় পুরোপুরি খসে পড়বে।

গভীর রাত পর্যন্ত নন্দীবাড়ীতে আগত মানুষজনকে আমার নরক থেকে ফেরার অভিজ্ঞতার কথা বলতে হল। বলতে পেরে আমারও ভালো লাগলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সম্পর্কে যাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল, তারা তাদের মনের সকল সন্দেহবিন্দু পুবাতন ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জন দিয়ে মহানন্দে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। আমার মনে হল, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও তার সাফল্যের সম্ভাবনার দীপশিখাটিকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রাখাটাই কবির কাজ। আমার পক্ষে মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ বা মেজর শফিউল্লাহর মতো প্রত্যক্ষসমরে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। খসরু-মন্টুদের মতোও না। আমার সেরকম প্রশিক্ষণও নেই, সেই মানসিকতাও আমার নয়। তারপরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ময়দানে আমি অস্ত্র হাতে লড়াই করছি, আমার গোলাগুলিতে মুছুয়া-পাকসেনারা (চরমপত্রে এম আর আখতার মুকুল পাকসেনাদের এভাবেই বর্ণনা করেছেন) কাতারে-কাতারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে; তাদের দেহচ্ছিন্ন মুছুয়ামস্তকগুলি গড়াগড়ি খাচ্ছে আমার ধাবমান রথের তলায়— এরকম ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে আমার নিদ্রা ভেঙেছে। কিশোরগঞ্জে ঐ রাতে আমি ঠিক কী স্বপ্ন দেখেছিলাম, মনে পড়ে না। বাস্তবে ঘটে যাওয়া কতো ঘটনার কথাই ভুলে গেছি, স্বপ্নের ওপর আর ভরসা কী?

পরদিন ৫ এপ্রিল, সোমবার, সকাল দশটার দিকে আমি কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর কাছে যাই। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি জানান যে, আমার কিশোরগঞ্জে আগমনের খবর তিনি তাঁর গোয়েন্দাবাহিনীর মাধ্যমে কালই পেয়েছেন। আমি যে কবি, আমার কবিতার বই দেখিয়ে তা প্রমাণ করতে হল না তিনি বললেন আমার কবিতা তিনি পড়েছেন। বললেন, তাঁর স্ত্রী তাহমিনা জামানও লেখেন। আলাপকালে আমাদের মাঝে উপস্থিত খসরুজ্জামান চৌধুরী সাহেবের শ্যালক গালিবও (প্রাক্তন সচিব, লেখক মহিউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়) আমাকে মুখোমুখি পেয়ে মহা খুশি। গালিব বললো, আমিও আপনার কবিতার ভক্ত। আমার যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় পেট্রোল পেতে মোটেও অসুবিধা হল না

ঐ দিনের কথা জানবার জন্য আমি বর্তমানে আমেরিকার লুসিয়ানায় বসবাসরত প্রফেসর ডক্টর খসরুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে আন্তর্জালে (ইন্টারনেটে) যোগাযোগ করি। তাঁর আন্তর্জাল-ঠিকানা পেতে আমাকে সাহায্য করেন নিউইয়র্ক

প্রবাসী কবি-সাংবাদিক ফকির ইলিয়াস ও ড. বিমলচন্দ্র পাল আমার একটি ছোট্ট পত্রের উত্তরে প্রফেসর চৌধুরী আমাকে যে দীর্ঘ পত্রটি লিখেছেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর অনুমতিক্রমে আমি পুরো পত্রটিই এখানে পত্রস্থ করছি।

Goon Babu

Here are some of the answers to your questions. My wife recollects her meeting with you at Bangla Academy, when you gave her a copy of one of your books "Dukkho Korona- Bacho" on 22 February 1989!! She sends her best wishes. Same from me. Please acknowledge the reciept of this email, so that I know you recieved my answers and related observations.
First about myself. During 1971-1972 I acted as Deputy Commissioner of Greater Mymensingh. Then I worked as Deputy Secretary first in Relief and Rehabilitation (1972-1974) then in Education (1974-1977). I was the first Secretary of the reconstituted Bangladesh National Commission for UNESCO. I graduated from Harvard University, USA with a Master in Public Administration (MPA) degree in 1978 (1977-1978) and from Syracuse University, USA with a Ph.D degree in Economics in 1987 (1983-1987). I resigned from Govt. Service in 1980.

Here are answers to your questions. I do recollect you met me in my residential office on April 5, 1971. Because petrol was in shortage, I had to control it. I remember to have given you some petrol. I do recollect the boy but I do not certainly recollect his name. I believe his name was Babul. Yes, my brother-in-law Galib was with me. He stayed with me throughout the Liberation war. Earlier, in late March, I had sent off my wife Tahmina Zaman from Kuliarchar in a passenger launch-off to a safer destination with my 8 month old Son, Faisal (who is now a young man and works as a Marketing Director in a USA company in San Diego, California!!) I thought their presence with me restricted my ability to work harder, and free of extra worries, for the war activities. To stop the advancement of the Pakistan Army, I destroyed some important bridges in and around Kishoreganj,

What happened next was that Bhairab, under my jurisdiction, fell to Pak Army although we had destroyed part of the bridge. Captain Nasim (now retired Chief of Staff) and others fought so hard at Bhairab but could not save it! I was constantly in touch with Bhairab when the battles were going on there. Bhairab fell to Pak Army probably on April 10, 1971. I got news that Pak Army was advancing towards Kishoreganj they had come upto Sararchar, only about 20 miles from Kishoreganj!!

That was the big decision moment! I had to decide what to do. I had assured the people of Kishoreganj that if I left, I would let them know in advance. I must keep my promise. Kishoreganj was not safe any more, and I could not protect anyone any more!

I took decisions which my conscience dictated. I paid three months advance salaries to all SDO's office employees, violating all Govt rules!! I asked them to leave town and go to safer places. Under my instruction, microphone announcement was made all over the town that the SDO (that is, me!) could no longer provide protection to anyone and everyone should seek proper safer shelters! It was also announced that I would also leave at the appropriate time.

The time finally arrived. Someone rushed from Sararchar to warn me. I then left in the night of April 17. I left in my official jeep, the SDO's jeep.

My companions were my brother-in-law Galib, my driver Subodh and his family (wife and 2 children). I took them with me because I feared for their lives!! We went to Netrokona with great hardships. I was stopped several times!! At one point, villagers were almost attacking us, thinking that we were Pakistanis!!

I reached Netrokona the next day. My CSP batchmate Abdul Hamid Chowdhry (Retired Secretary, Govt. of Bangladesh) was then SDO, Netrokona. I urged him to come with me to Meghalaya. Finally my companion and I reached Baghmara on Indian side after crossing the treacherous Kongsho river. We left our jeep behind and walked into India. I was recieved by BSF who provided me with a shelter! I heard later that Kishoreganj fell to the Pak Army probably on April 22, 1971.

This is part of my story and part of history!! My wife and I have written in Bangali (and some English) many episodes

on the Liberation war days and events. Next time we are in Dhaka, we will contact you and share those moments. Poet Shelley so rightly wrote
"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"!!

Many people want to publish my book on the war Maybe I should write soon! (I have my diaries).
I am very very busy Yet I thought I must honor your request. Waht I am sending you is in a rush- probably somewhat disorganized.
I am in tears as I am writing you these lines You threw me into the past, a past which still haunts, and pleases me even in my dreams. I love Kishoreganj and I love Bangladesh. Bangladesh is in my blood- oi desher shonge amar narir shomporko!! I can never forget. I only pray for the country and its real people!
Once again, I am grateful that I was lucky enough to be in your thoughts. To me, this is a great pleasure; and also a great treasure
I am a professor now I must thank my Ph.D Student who is kindly sending this email for me. (I cannot type long emails!!)

Wishing you all the best.
Yours Sincerely,
Khashruzzaman Choudhury

৪

ধন্যবাদ প্রফেসর খসরুজ্জামান চৌধুরী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অকারণে বা আপাততুচ্ছ কারণে চঞ্চল বোধ করার মানসিকতা, কবিত্ব দোষে দুষ্ট বলে আমি অদ্যপি অতিক্রম করতে পারিনি; কিন্তু প্রথমজীবনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন ও পরে সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ার কারণে, বিশ্বাস করি আপনি অনেক আগেই তা অতিক্রম করেছেন। আপনি স্থিরচিত্ত, স্থিতধী। তারপরও, সঙ্গতকারণে ব্যস্ত থাকার পরও আমার একটি সামান্য ছোট্ট পত্রের উত্তরে আপনি দ্রুততার সঙ্গে যে দীর্ঘ এবং অসামান্য সুন্দর পত্রটি আমাকে লিখেছেন, তা শুধু সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করার দায় থেকেই আমাকে অব্যাহতি দেয়নি, আমার চলমান রচনাটিকেও যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে এটা শুধু আমার কথাই নয়, কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

পিএইচডি অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর গোবিন্দ চক্রবর্তীও তাই মনে করেন আপনার পত্রে বর্ণিত একাত্তরের যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি একটি জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিলপাঠের আনন্দই শুধু পাননি--, আপনার ব্যক্তিজীবনের কথকথা জানতে পেরে পত্রপাঠান্তে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

Gurujaneshu
Goon babu,

Namaskar
In fact, I am in tears as well after reading your Kishoregonj part-3, especially the email from Prof Khashruzzaman that you have put in it. So many thanks for giving me a chance to get in a wonderful historical document You take the best care of yourself

Shraddhabanata,

Gobinda Chakraborty
Assistant Professor of Political Science
University of Dhaka
Now doing PhD at Concordia University, Montreal

সত্যি বলতে কি, মুক্তিযুদ্ধের কাজে অধিকতর মনোযোগ এবং সময় দেবার উদ্দেশ্যে আপনি আট মাসের পুত্রসহ আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে দূরগামী লঞ্চে তুলে দিয়ে আপন কর্মস্থলে ফিরে আসার ঘটনাটি মনের আবেগ লুকিয়ে আপনি এমন নির্লিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয়েছে, দেশকে পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করাটা আপনার কাছে স্ত্রী ও সন্তানের চেয়ে তখন কম প্রিয় বলে মনে হয়নি

'চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখসব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।'

আপনার পত্রপাঠের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের এই কথাটা আমার মনে বারবার গুনগুনিয়ে উঠেছে। মহামতি লেনিন বলেছিলেন, বড় প্রয়োজন সামনে এসেছে, ছোটো প্রয়োজন ছাড়তে হবে। বঙ্গবন্ধুর মতো আত্মস্বার্থবিসর্জনকারী নেতার একজন যথার্থ যোগ্য অনুসারীর মতোই ১৯৭১ সালে আপনি তা করতে পেরেছিলেন। তাই পাকসেনাদের আগমনী সংবাদ পেয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে সরে যাবার আগে শহরবাসীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মাইকযোগে সতর্ক করতে আপনি যেমন ভুল করেননি, তেমনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে

কিশোরগঞ্জ ত্যাগের সময় আপনার গাড়ির চালক সুবোধের স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তানকেও আপনার জিপে তুলে নিতে আপনি ভুল করেননি। পাকসেনাদের নির্বিচার হিন্দু-নিধনের পরবর্তী নীল নকশা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যে মতবিনিময় করেছিলাম, আপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত দৃষ্টে মনে হয়েছে, আপনিও তার সত্যতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাদের বাঁচানোর তাগিদ বোধ করেছিলেন। অন্যথায় আপনার ছোট্ট জিপে সুবোধের পরিবারের সদস্যদের স্থান সংকুলান হতো না।

আপনার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে আপনার মিলনপর্বটি কবে, কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, অনেক পাঠকের মতো আমার নিজেরও তা জানবার খুব আগ্রহ রয়েছে আপনার শ্যালক গালিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো সময় জুড়ে আপনার সঙ্গে ছিল, আপনি তা আমাদের জানিয়েছেন। তবে কি, আপনার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনার আর দেখাই হয়নি?

আমার চলমান রচনাটির সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করার চিন্তাটি এরকম সুফলদায়ক হবে, ভাবিনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কী জানি, অন্তরাল থেকে কোনো অদৃশ্য শক্তি বোধহয় আমাকে বুদ্ধি জোগাচ্ছে তা না হলে, আমার তো এতো বুদ্ধি, এতো ধৈর্য পূর্বে কখনও ছিল না। আমি যেন আমার ভিতরে একটি নতুন আমি'র অস্তিত্ব অনুভব করছি।

'অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।'

(আত্মপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ)

কবিতা একা লেখা যায়, কিন্তু ইতিহাস বোধ করি এভাবেই, অনেকে মিলেই লিখতে হয় অনেকের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়েই ইতিহাস সত্য হয়ে ওঠে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আত্মকথা-১৯৭১' লিখতে বসে এই শিক্ষাটাই আমার জানা হল

তথ্যপ্রবাহের এই স্বর্ণযুগে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনার কাছে আমাকে পৌঁছতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা আমি আগেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি, আবারও করছি।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে পাঠককে কিছু তথ্য জানানো প্রয়োজন বোধ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াকালে জনাব খসরুজ্জামান

চৌধুরী জনাব মহিউদ্দিন আহমদের চেয়ে এক বছরের জুনিয়র ছিলেন, কিন্তু কর্মজীবনে তাঁরা দু'জন ছিলেন একই সিভিল সার্ভিস ব্যাচের (১৯৬৭)। জনাব মহিউদ্দিন আহমদ পাক-সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে আয়োজিত একটি জনসভায় উপস্থিত (১ আগস্ট ১৯৭১) হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমের নতুন আবেগ যুক্ত করেছিলেন। ইউরোপের পাকদূতাবাসগুলিতে দায়িত্ব পালনরত বাঙালি-কূটনীতিকদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন তিনিই প্রথম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনিও ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই তাঁর পাকপক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণাটি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রবাসী সরকারের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপ ভ্রমণরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিবৃত্ত করায় তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

৭ মার্চের দিকনির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়া শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...।' এই 'যার যা আছে' কথাটা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। পাক-সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বাঙালিদের বেলায় বঙ্গবন্ধুর ঐ কথাটার তখন একটাই মাত্র অর্থ ছিল, তা হল, পূর্ববাঙলা-শোষণকারী ও শাসনকারী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা।

জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী বা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদে আসীন অকুতোভয় বাঙালি, যাঁরা পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা পূর্ব বাংলার গভর্নর জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের ভয়ে বা নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপনের লোভে বা পিছারে পাকিস্তানের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকার কারণে তাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে পাক-সেনাদের বুটের তলায় লুটিয়ে দেননি। তাঁরা পূর্ব বাঙলার বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশকে শিরোধার্য করে তাঁদের নর্মজীবন, মর্মজীবন ও কর্মজীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন

আমার 'আত্মকথা ১৯৭১'-এ প্রফেসর চৌধুরীর মতো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমি আমার অন্তরে গভীর আনন্দ বোধ করেছি। মনে করছি, জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী বা জনাব মহিউদ্দিন আহমদের মতো আরও যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন, এই দু'জনের মধ্য দিয়ে তাঁরাও আমার রচনায় সগৌরবে অন্তর্ভুক্ত হলেন। বাঙালি চিরদিন তাঁদের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আঠারবাড়ি হয়ে কেন্দুয়া যাবার পথে আমার আরেক মামাবাড়ি আছে আমতলা গ্রামে। আমার দাদুর নাম অতুল রাহা। তিনি ব্রিটিশ আমলের দারোগা ছিলেন বলে বাড়িটি দারোগা বাড়ি হিসেবেও এলাকায় পরিচিত। ১৯৬৬ সালে আমি যখন হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন কিছুদিন ঐ দারোগা দাদুর বাড়িতে পালিয়ে ছিলাম। গ্রামোফোনে হেমন্তর গান আর শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটক শুনে আমার দিন ভালোই কাটছিল। সান্দিকোনা হাই স্কুলের শিক্ষক আমার অরুণ মামা একদিন রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে বললেন, কেন্দুয়া থানার একজন পরিচিত পুলিশ তাঁকে বলেছে যে আমার অবস্থান সম্পর্কে তাদের কাছে খবর আছে যেকোনো সময় কেন্দুয়া থানার পুলিশ আমার সন্ধানে আসবে। তার আগেই আমি যেন অন্য কোথাও সটকে পড়ি।

পরদিন রাত পোহানোর আগেই আমি দারোগা-দাদুর বাড়ি ছেড়ে পালাই। ঐ পুলিশের কারণেই আমি সেবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার দারোগা-দিদিমা অবশ্য আমাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার পক্ষেই ছিলেন, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তিনি আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন তাঁর চোখের জলে

আমার 'হুলিয়া' কবিতায় আমতলা গ্রামের কথা আছে। 'আমতলা থেকে আসবে আব্বাস'

পাঁচ বছর পর আমি ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে নেত্রকোণায় ফিরছি। একবার ভাবলাম আমতলায় একটু থেমে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্তই। নান্দাইলের পাশ দিয়ে আমার সময় নওহাটায় যখন থামিনি, তখন আর আমতলাতেই বা থামবো কেন? যে তরুণটি আমাকে তার মোটর সাইকেলে বহন করে নিয়ে চলেছে, নেত্রকোণায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে তাকে আবার দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইল পথ ফিরতে হবে। চরৈ বেতি, চরৈ বেতি। মাইলস টু গো বিফোর আই স্টপ।

এখন আমার ঐ দারোগা দাদুও নেই, আমার প্রিয় ঐ দজ্জাল দিদিমাটিও নেই। আজ সেদিনের কথা লিখতে বসে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যে ছেলেটি আমাকে কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোণায় পৌঁছে দিয়েছিল, জনাব খসরুজ্জামান সাহেবকে ধন্যবাদ যে তিনি অন্তত অনুমান করে হলেও বলেছেন, ছেলেটির নাম-- খুব সম্ভবত, বাবুল বাবুল? বা-বু-ল...? আহা' তাই যেন সত্য হয়। ওর নাম বাবুল হলেই ভালো। আমার তো তাও মনে নেই। তবে, নিশ্চিত করে ঐ ছেলেটির নাম জানতো আমার মাসতুতো ভাই বাবু। বাবু নন্দী। কিশোরগঞ্জে যাদের বাড়িতে ৪ এপ্রিল আমি রাত কাটিয়েছিলাম। বাবুর মাধ্যমেই ঐ তুর্কী-তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয়

হয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমার, অনেকদিন পর বাবুর সন্ধান করতে গিয়ে জানলাম, কিছুদিন আগে আমার প্রিয় বাবুও লোকান্তরিত হয়েছে।

এখন আমার এই লেখাটি যদি কিশোরগঞ্জের এমন কারও চোখে পড়ে, যিনি অনুসন্ধান চালিয়ে ঐ তরুণকে আবিষ্কার করতে পারেন, বা যার কথা আমি আমার আত্মকথায় লিপিবদ্ধ করছি, লেখাটি যদি তাঁর চোখে পড়ে, তবে তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তবেই আমি কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারি।

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার এর আত্মজীবনী 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থে ঐ সময়টার একটা চমৎকার বর্ণনা পাচ্ছি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি– আমরা দু'জন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে প্রায় একই সময়ে একটি অভিন্ন গন্তব্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি। তিনি লিখছেন .

> 'দু'একদিন পর (ময়মনসিংহ থেকে) আমি পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ট্রাকে, কিছুদূর রিকশায় এবং কিছুটা গরুর গাড়িতে করে নেত্রকোণা শহর হয়ে বারহাট্টায় গিয়ে পৌঁছলাম। বারহাট্টায় আমি দু'বছর মাস্টারি করেছি, এ এলাকায় অনেকেই আমার পরিচিত, আমার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যাও এখানে অনেক। তা ছাড়া ছোট ভাই মতীন্দ্র এই বারহাট্টা স্কুল থেকেই মেট্রিক পাস করেছে। তারও বন্ধুবান্ধব এখানে কম নেই। তাই বারহাট্টাতেই আপাতত আশ্রয় নেয়া সমীচীন মনে করলাম।
> বারহাট্টার পাশেই কলমাকান্দা থানা। কলমাকান্দার পরেই সীমান্ত। এর পরেই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। কাজেই বারহাট্টায় থাকলেই সীমান্ত পাড়ি দেয়াটাও অনেক সহজ হবে এ বিবেচনাটাও মাথায় ছিল। তাই মা-বোন ভাগনির সঙ্গে মতীন্দ্রকে বারহাট্টায় রেখে আমি গ্রামের বাড়িতে বাবা ও ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বারহাট্টায় আর আমার ফিরে যাওয়া হল না। ফুলবাড়িয়ায় স্ত্রী পুত্রের খবর নেয়াও অসম্ভব হয়ে উঠলো। পাকসেনারা কিছুদিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোণা শহরগুলো দখল করে নিলো। পথ-ঘাট আর আমাদের জন্য নিরাপদ রইলো না।
> এপ্রিলের চার কি পাঁচ তারিখে আমি গ্রামের বাড়িতে যাই .'
>
> (পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন : পৃঃ ৩৬৮)

নেত্রকোণা শহর বেষ্টনকারী দুর্বোধ্য মগরা নদ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন শহরের ভিতরে পৌঁছলাম, তখন দুপুর চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর , শোঁ শোঁ করছে হাওয়া শহরের বিভিন্ন ভবনশীর্ষে চৈত্রের উত্তপ্ত বাতাসে পতপত করে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা

অবশেষে নেত্রকোণায়

নেত্রকোণা শহর বেষ্টনকারী দুর্বিনীত মগরা নদ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন শহরের ভিতরে পৌছলাম, তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর--, শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। শহরের সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ভবনশীর্ষে চৈত্রের উত্তপ্ত বাতাসে পতপত করে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

নেত্রকোণা শহরের কোর্টরোডে অবস্থিত 'সিদ্দিক প্রেস'টি অন্য সকলের কাছে সিদ্দিক প্রেস হিসেবে পরিচিত হলেও আমার ও আমার মতো নেত্রকোণার ষাট দশকের নবীন লিখিয়েদের কাছে অধিক পরিচিত হয়ে উঠেছিলো 'উত্তর আকাশ' পত্রিকার কার্যালয় হিসেবে। সেখানে 'উত্তর আকাশ'-এর সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য বসতেন। নেত্রকোণায় থাকাকালে তাঁকে ঘিরে আমরা প্রায়ই আড্ডা দিতাম। ঐ আড্ডায় নেত্রকোণা কলেজের বাংলার অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ, ইংরেজির জলিল স্যার, অধ্যাপক প্রাণেশ চৌধুরী, অধ্যাপক শাজাহান কবির, কবি সাংবাদিক আল আজাদ, সাংবাদিক-সাহিত্যিক জীবন চৌধুরী, সাংবাদিক কালীপদ চক্রবর্তী, কবি শান্তিময় বিশ্বাস, ছড়াকার প্রণব চৌধুরী, কবি খালেদ বিন আক্কার(খালেদ মতিন), শাহনেওয়াজ ফকির, শ্যামলেন্দু পাল, দীলিপ দত্তসহ অনেকেই আসতেন।
রফিক আজাদ নেত্রকোণা কলেজ থেকে আই এ পাশ করার পর ১৯৬১ সালেই নেত্রকোণা ছেড়ে ঢাকার পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি উত্তর আকাশ পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন, কিন্তু তাঁকে আমি কখনও ঐ আড্ডায় পাইনি। কবি রফিক আজাদের সঙ্গে নেত্রকোণায় আমার কখনও দেখাই হয়নি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলে। 'আমার কণ্ঠস্বর' গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে।

প্রেস ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটলেও, আমার পিতৃবান্ধব প্রেস-মালিক আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেব আমাদের মতো নবীন লিখিয়েদের যাবতীয় অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করতেন আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম ডেমুরায় ছিলো তাঁর বাড়ি। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর খুব সুসম্পর্ক ছিলো। সম্ভবত স্কুল জীবনে তাঁরা পরস্পরের সহপাঠী ছিলেন। ১৯৬১ সালের শুরুতেই 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় আমার জীবনের প্রথম কবিতা (নতুন কাণ্ডারী) ছাপা হয়। আমার ঐ কবিতাটি উত্তর আকাশ পত্রিকায় প্রকাশের পেছনে সম্পাদক খালেকদাদ চৌধুরী সাহেবের চেয়েও পত্রিকার প্রকাশক-মুদ্রক আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবের মুখ্য ভূমিকা ছিলো। সিদ্দিক চাচার (পিতৃবান্ধব হিসেবে আমি তাঁকে চাচা বলেই ডাকতাম) আনুকূল্য

না পেলে উত্তর আকাশ পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা প্রকাশের ঘটনাটি আরও কিছুকাল বিলম্বিত হতো বলেই আমার ধারণা।

তারপর দেখতে দেখতে কংশ-মগরা-সোমেশ্বরী আর পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ওপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরে। শুধু কি জল গড়িয়েছে? না, শুধু জল নয়, মুক্তিকামী লাখো বাঙালির বুকের তাজা রক্তও মিশেছে সেই নদীজলে। আমাদের জলের নদনদী পরিণত হয়েছে রক্তের নদনদীতে। সেই রক্তনদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে, আজ ঠিক এক দশক পর, বহু ভাগ্যবলে যমদূতরূপী পাকসেনাদের থাবা থেকে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি আমার মহুয়ার কাছে, নেত্রকোণায়। আমি ফিরে এসেছি আমাকে কবি স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম পত্রিকা 'উত্তর আকাশ'-এর মাতৃক্রোড়ে। আমার খুব আনন্দ হলো।

'পেছনে রহিল কংশের বুক ভরি
অশ্রু আমার মগরা, সোমেশ্বরী।'

(আনন্দকুসুম : নির্মলেন্দু গুণ)

ঢাকার বধ্যভূমি থেকে মুক্ত-নেত্রকোণায় আমার ফিরে আসার সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বন্ধুরা সিদ্দিক প্রেসে ছুটে আসে। আমি বেঁচে আছি দেখে তারা সবাই খুব খুশি। আমি হেলাল হাফিজের কুশল সংবাদ ওর পিতা কবি খোরশেদ তালুকদার সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলাম বন্ধুদের। অনেকেই ভেবেছিলো, হেলাল হয়তো ইকবাল হলেই ছিলো এবং মিলিটারি অপারেশনে মারা পড়েছে। হেলাল সেই রাতে ইকবাল হলের পরিবর্তিত নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ছিলো না এবং ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের দুপুর পর্যন্ত সে আমার সঙ্গেই ছিলো জেনে হেলালের প্রিয়জনরা সবাই স্বস্তি পেলেন।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' ততদিনে নেত্রকোণার বইয়ের লাইব্রেরীগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিলো। অনেকেই জানালো, তারা আমার কবিতার বইটি কিনেছে। তখন বইটির মূল্য ছিলো তিন টাকা। ঝোলার ভিতর থেকে আমার কবিতার বইটি বের করে আমি আমার প্রিয় বন্ধুদের দেখতে দিলাম। বইটির অতিরিক্ত কপি আমার ব্যাগে ছিলো না, তাই কাউকে উপহার দিতে পারলাম না। আমার বইটি বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো। সবাই বললো, বইটি খুব ভালো হয়েছে। শুধু মুদ্রণমান বিচারে নয়, কবিতামান বিচারেও। 'হুলিয়া' কবিতাটির প্রশংসায় দেখলাম সবাই পঞ্চমুখ।

আমাকে মোটর সাইকেলে করে কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোণায় পৌঁছে দিয়েছিলো যে ছেলেটি, সেই বাবুল (মুক্তিযুদ্ধচলাকালে কিশোরগঞ্জের এসডিও

জনাব খসরুজ্জামানের মতে)-কে পাশের একটি হোটেলে অন্নব্যঞ্জনে যতটা সম্ভব তুষ্ট করে দ্রুত বিদায় দিলাম। বেচারিকে এখন কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত সারাটা পথ একা ফিরতে হবে। ওকে বিদায় দিতে গিয়ে ভাবলাম, কবিতাপ্রেমিক এমন মুজিবভক্ত ছেলে যে দেশে আছে, সেই দেশ কখনও স্বাধীন না হয়ে পারে না।

নেত্রকোণার মহকুমা প্রশাসক ছিলেন আবদুল হামিদ চৌধুরী। কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর পত্রে ঐ নামটির উল্লেখ আছে। বন্ধুদের নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। উদ্দেশ্য আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা যতটা সম্ভব তাঁকে জানানো, যেন আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি তখন কোর্টে ছিলেন। সেখানে আমার আগমন সংবাদ শুনে কোর্টের ভিতর ও আশপাশ থেকে অনেক মানুষ এসে ভিড় করলেন। কবি-সাংবাদিক আল আজাদ, শ্যামলেন্দু পাল, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, হায়দার জাহান চৌধুরীসহ ছাত্র লীগের কিছু নেতা কর্মীও আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা আমার সব কথাই খুব গুরুত্বসহকারে শুনলেন।

মনে পড়ে, পাকসেনাদের গোপন নীল নকশা অনুযায়ী নির্বিচার বাঙালি নিধনের পর, এবার যে নির্বিচার হিন্দু-নিধনের পালা শুরু হবে–, দেশজুড়ে যে একটা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা হবে– ঐ বিষয়টির ওপরই আমি বেশি জোর দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুও তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দেশবাসীকে এব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

'শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসকের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা নেত্রকোণার মহকুমা প্রশাসককে জানালাম। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, ঢাকার ২৫ মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে অনেককিছু জানলেও, তারা বুড়িগঙ্গার ওপারের ২ এপ্রিলের 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড' সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। মনে হলো ঘটনাটির কথা আমার কাছ থেকেই তারা প্রথম জানলেন।

বঙ্গবন্ধুর খবর তখনও পর্যন্ত আমাদের কারও জানা ছিলো না। করাচী বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবিটি ৫ এপ্রিল বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ তথ্যটি আমাদের তখন জানার কোনো উপায় ছিলো না পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ২৫ মার্চের মিলিটারি অ্যাকশনের অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা দেখার পর, এমন আশার কথা জোর দিয়ে তখন কেউ বিশ্বাস করতেও পারছিলেন না। আমি একটু আগ বাড়িয়েই বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললাম, হ্যাঁ,

তিনি বেঁচে আছেন। একটু মিথ্যে করেই বললাম, শেখ মণি ও মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছে আমি শুনেছি, তিনি ঢাকার কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছেন পাকসেনারা তাঁকে ধরতে পারেনি। পারবেও না কখনও। আমার কথা অনেকেই বিশ্বাস করলো। বিশ্বাস করলো, হয়তো আমি কবি বলেই।

ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে আওয়ামী লীগের নেতা খালেক ভাই, ফজলুর রহমান খান বা তারা ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হলো না। তবে তাঁরা যে নেত্রকোণার নিকটবর্তী মেঘালয় সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, সে বিষয়টি জানতে পারলাম।

'সুতরাং' নামে ষাটদশকে খুব ভালো একটি ছবি হয়েছিলো। ছবির নায়ক ছিলেন সুভাষ দত্ত, নায়িকা কবরী। দীর্ঘদিন পর ছবির নায়ক ছুটি পেয়ে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন বাড়ির একেবারে কাছে পৌঁছার পর তিনি একটা ভো দৌড় দেন ঐ দৌড়ের দৃশ্যটি ছিলো খুব অন্তরস্পর্শী। দূরের পথটা শান্ত-ভদ্র পায়ে হেঁটে এলেও, বাড়ির কাছে আসার পর মনের ভিতরের চঞ্চলতাটাকে তিনি আর লুকাতে পারেননি আমার হয়েছিলো সেই সুভাষ দত্তের দশা। আমি যতই আমার বাড়ির কাছে যাচ্ছিলাম, বাড়ির জন্য আমার নাড়ীর টান যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছিলো। তাই বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি নেত্রকোণায় যাত্রাবিরতি করতে কিছুতেই রাজি হলাম না।

বারহাট্টার পথে : গৃহগত প্রাণ

খবর নিয়ে জানলাম, রেলগাড়ি চলছে না। ২৫ মার্চের পর থেকে ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ লাইনে একটি ট্রেনও যাওয়া আসা করেনি। এই এলাকার মানুষজন বিশেষ প্রয়োজনে কখনও রিকশায়, কখনও গরুর গাড়িতে করে সড়কপথে যাতায়াত করছে। নদীপথে চলছে নৌকা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই তখন শ্রীচরণ ভরসা। নিকট অতীতে না থাকলেও, এই সড়কপথে পায়ে হেঁটে বা কবি রফিক আজাদের ভাষায় 'পদব্রজে' যাতায়াত করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার আছে। রেলপথে নেত্রকোণা থেকে বারহাট্টার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। সড়কপথে দূরত্ব কিছুটা কম হবে, যদিও রেলপথের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে মায়ের সঙ্গে রাগ করে পথ-চলা অভিমানী শিশুর মতো পাশাপাশিই ছুটে চলেছে সেও।

নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ রেলপথের সবগুলি স্টেশনের নামই খুব সুন্দর। বেশ কাব্যিক। নেত্রকোণার পরের স্টেশনটির নাম 'বাংলা'। সেটেলমেন্ট রেকর্ড-অনুযায়ী এলাকাটার নাম হচ্ছে 'সিংহের বাংলা', কিন্তু রেল-স্টেশনটির নামফলকে বড় কালো হরফে লেখা আছে শুধুই বাংলা আমার সোনার বাংলা। ছোট্ট স্টেশন এতো ছোটো যে, এর চেয়ে ছোটো কোনো রেলস্টেশন আর হয় না। কিন্তু তার ছোট্ট অবয়বের মধ্যেই সে ধারণ করে আছে আমাদের স্বপ্নের বিশাল দেশটিকে। স্টেশনটির নামের সঙ্গে 'দেশ' শব্দটিকে যুক্ত করলেই বাংলাদেশটিকে পাওয়া যায় এমন দেশাত্মবোধক, অর্থবহ একটি নাম বাংলাদেশে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রেলস্টেশনেরও আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলার পরের স্টেশন হচ্ছে ঠাকুরাকোণা, তারপর বারহাট্টা, বারহাট্টার পরের স্টেশন হচ্ছে অতিথপুর ও সবশেষে মোহনগঞ্জ। তার আর পর নেই। ওখানেই রেলপথের শেষ, আর সিলেটগামী জলপথের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ জনমভর জানতে চেয়েছিলেন পথের শেষ কোথায়? ঐ প্রশ্নের উত্তর যে মোহনগঞ্জ, তাঁর স্নেহভাজন সঙ্গীতজ্ঞ শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কর্তব্য ছিলো কবিগুরুকে সেই কথাটা বলা। মোহনগঞ্জের মানুষ হয়েও শৈলজাবাবু যে কেন তা বিশ্বকবিকে বলেননি, সে এক রহস্য

তবে আমরা খুব খুশি যে, তিনি 'নেত্রকোণা' জায়গাটাকে রবীন্দ্রকাব্যে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৈলজারঞ্জন ১৯৩০ সালে বিশ্বকবির সত্তর বছর পূর্তিতে নেত্রকোণা শহরের দত্ত হাই স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেন শান্তিনিকেতনের বাইরে, ওটাই ছিলো প্রথম রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান নেত্রকোণা ছাড়া ভারতের আর কোথায়ও তা পালিত হয়নি। রমাঁ রোঁলার উদ্যোগে সেবার ইউরোপেও রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছিলো বলে শুনেছি নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের

বিষয়টি শৈলজারঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রপত্রধারা সমর্থিত। ফলে এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, রবীন্দ্রকাব্যে 'নেত্রকোণা' এসেছে এভাবে–

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুরের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৌসুমে ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি নেত্রকোণা।

(শ্যামলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ্রন্থের পরিশিষ্টে শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে লেখা সেই ঐতিহাসিক রবীন্দ্রপত্র ও নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের স্মৃতিকথা উদ্ধৃত হলো। স্মৃতিচারণ করেছেন একসময়ের নেত্রকোণার প্রখ্যাত বাম-রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও জনপ্রিয় শিক্ষক, বর্তমানে কলকাতা নিবাসী শ্রীসত্যকিরণ আদিত্য।

ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোণা পর্যন্ত রেল-লাইনটি চালু হয়েছিলো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। আমার ঠাকুরদাদা রামসুন্দর গুণ মহাশয় ময়মনসিংহ শহরে জজ-কোর্টে চাকরি করতেন। তিনি পালকিতে চড়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে নেত্রকোণায় গিয়ে রেলগাড়িতে চড়তেন। আমার জন্মের এক যুগ আগে ও আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর এক যুগ পর ১৯৩৩ সালে নেত্রকোণা থেকে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনটি সম্প্রসারিত হয়। কমবেশি আঠার মাইল দীর্ঘ ঐ সম্প্রসারিত রেলপথ তৈরিতে সময় লেগেছিলো প্রায় দুই বছর। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এজন্য যে, আমাদের নিত্যপতনমুখী রেলের উন্নয়ন নিয়ে যারা ভাবনা-চিন্তা করেন তাদের পরিকল্পনা প্রণয়নে হয়তো সহায়ক হতে পারে।

ময়মনসিংহ থেকে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তাটি অবশ্য রেলপথের আগেই চালু হয়েছিলো। শুরুতে এই সড়ক-পথে বাহন বলতে ছিলো পালকি ও গরুর গাড়ি। ১৯৭১ সালেও ঐ পথে রিকশা বা বাস চালু হয়নি। ভাঙ্গা রাস্তা। পুরোটাই তখন ছিলো কাঁচা বুঝলাম পুরো পথটা পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে আমাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালাম বারহাট্টার উদ্দেশ্যে। আপাতত পেছনে পাকসেনাদের আক্রমণের ভয় নেই। সামনে আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারার আনন্দ-হাতছানি। আহা! কতদিন পর আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরছি। আমার নিজের লেখা 'হুলিয়া' কবিতাটির কথা মনে পড়লো। মনে হলো আমার ওপর থেকে হুলিয়া আজও উঠে যায়নি হুলিয়া মাথায় আমি আজও পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ এখানে তো কাল সেখানে এপ্রিল মাসের প্রথম রাতটি

আমি কাটিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গার ওপারে, শুভাড্যায়। ২ এপ্রিল জিঞ্জিরায় গণহত্যার পর ঢাকায় ফিরে রাত কাটিয়েছি আজিমপুর কবরের পাশে, আমার প্রতিবেশী, বন্ধু শাহজাদাদের পরিত্যক্ত বাড়ির রান্নাঘরের মেঝেতে। ৩ এপ্রিলের রাত কাটিয়েছি নরসিংদির মনোহরদিতে। ৪ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ শহরের নন্দী বাড়িতে। আজ এপ্রিলের ৫। অনেকদিন পর আমি আজ আমার জন্মগ্রামে, নিজের বাড়িতে ঘুমাতে পারবো। হয়তো বা সেখানে থিতু হবো কিছুদিনের জন্য।

আমি যখন বারহাট্টায় পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অস্তগামী চৈত্র-সূর্যের শেষ-অস্তরাগে চারপাশের প্রকৃতি রাঙানো। উত্তরের দিকে তাকালেই বারবার চোখে পড়ছে মেঘমুক্ত গারো পাহাড়। পাহাড় তো নয়, আকাশে হেলান দেয়া সাদা ক্যানভাসের মধ্যে আঁকা একটা ঢেউ খেলানো নীলচে-সবুজ রঙের পোচ আমি পদব্রজে বাড়ি ফিরছি জেনে নেত্রকোণা থেকেই সে আমার সঙ্গ নিয়েছিলো। সেই থেকে সারাটা পথ সে আমার পাশে পাশেই আসছে। 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ'– গানটা তো মনে পড়লোই, মনের মধ্যে একটা নতুন চিত্রকল্পেরও জন্ম হলো। মনে হলো আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়ে চলেছে পাহাড়। বলছে, আমার কাছে কখন আসবে তুমি? ঢাকায় থাকতেই কল্পনায় ভারত-সীমান্তবর্তী ঐ পাহাড়ের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। আজ মনে হলো, তার সঙ্গে মিলনের দিন খুব দূরে নয়।

গৌরীপুর বাজারের একটি চায়ের স্টলে বসে চা খেলাম। অনেক প্রিয়-পরিচিত জনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করলেন। বললেন, ২৫ মার্চের পর আমার কোনো খবর না পেয়ে তারা ধরেই নিয়েছিলাম, আমি আর বেঁচে নেই। ভারতের আকাশবাণী আর লন্ডনের বিবিসির সংবাদে এলাকার সবাই জেনেছে, আমার কর্মস্থল 'দি পিপল' পত্রিকার অফিসটি পাকসেনারা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ঐরকম সংবাদ পাওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবারের সবাই ছিলো আমার জীবনাশংকায় উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করে আমার বাবা। ভাইবোনদের কাছে শুনেছি, তিনি দিনরাত আমার কবিতার বইটি হাতে নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কবিতাগুলি বারবার পড়তেন। বইটির প্রচ্ছদে কবির মুখচ্ছবি ব্যবহার করার বিষয়টি অনভ্যস্ততার কারণে বন্ধুদের কারও কারও কাছে কিছুটা অশোভন বলে মনে হলেও, আমার বাবার জন্য তা ছিলো কিছুটা উপরি পাওয়ার মতোই। কষ্ট করে আমার মুখটি তাঁকে কল্পনা করতে হতো না।

'আমার বাবার মতো সবাই যদি আমাকে স্বাধীনতা দিতো!' এই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যটি লিখে আমি আমার কাব্যগ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গে বর্ণিত কথাটা দুঃসময়ে তাঁকে আনন্দের চেয়ে কষ্টই দিতো বেশি একসময় তাঁর চোখ

থেকে জল গড়িয়ে পড়তো কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে। আমার কাব্যগ্রন্থটি তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভগবদগীতার মতোই নিত্যপাঠ ও পবিত্র হয়ে উঠেছিলো।

বাবাকে নিয়ে আমার অনুভূতি ছিলো কিছুটা একদেশদর্শী। আমার জন্মপ্রিয় গ্রাম, ভাইবোন, আমার আদুল গায়ের সাথী বন্ধুরা আমার কাছে কম প্রিয় ছিলো, এমন নয়। ছিলো। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার বাবার কাছেই ফিরছি আরও অনেকের কাছেই ফিরছি বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফিরছি তাঁর কাছে। আজ বুঝি, তার কারণ ছিলো আমাদের দু'জনের শিল্পীসত্তার অভিন্ন অন্বেষা। আমার কাছে তিনি শুধু আমার পিতাই ছিলেন না, ছিলেন শিল্পীও। অন্যদিকে আমিও তাঁর কাছে শুধু তাঁর সন্তানমাত্র ছিলাম না, ছিলাম মুক্তিকামী বাঙালির জন্য এক উদীয়মান কবিকণ্ঠ ফলে তাঁর কাছে আমার অস্তিত্বের একটা পৃথক অর্থ ছিলো

আমার প্রিয়-পরিজনদের সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আমি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার বাড়ি-পৌঁছানোর আগেই আমার আগমন সংবাদ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলো বাকি ছিলো চোখের জলে ভিজিয়ে প্রত্যাগতকে বুকে জড়িয়ে ধরার পালা ঘরের ভিতরে প্রবেশের আগে সেই পর্বটিও যথারীতি সম্পন্ন হলো

আপনজনের উদগত অশ্রুর ভিতরে আমি নিজেকে সঁপে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে উঠানে বসে পড়লাম। 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের কথা মনে পড়লো–

'ভাবিলাম মনে বুঝি এতখণে আমারে চিনিল মাতা
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।'

আমার ছোট বোন ঝিন্টু টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে পড়ে। ঢাকায় যাওয়া আসার পথে আমি ওকে আনা-নেওয়া করতাম। এবার আর আমার পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। কলেজ বন্ধ ঘোষিত হলে সে একাই বাড়িতে চলে এসেছে। আমার প্রতি ওর অসীম দরদ। আমার জলতৃষ্ণার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার বোনটি বুঝতে পারলো। সে এক গ্লাস ঠান্ডা জল এনে আমার মুখের কাছে তুলে ধরলো। ওর ডান হাতে ধরা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে চোখ পড়তেই আমার মনে পড়ে গেলো শুভার কথা। আহা! এখন কী করছে শুভা? অপস্রিয়মাণ শুভার মুখশ্রীকে আমি স্মরণে আনার চেষ্টা করলাম। বসন্তের মাতাল হাওয়া এসে লুটিয়ে পড়লো আমার অবসন্ন দেহের ওপর।

মনে হলো কোনো দূর-দেবতার আশীর্বাদে এই ভরসন্ধ্যায় আমার পুনর্জন্ম সাধিত হয়েছে। মৃত্যুর ইটবিছানো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমি আমার জন্মগ্রামে ফিরে এসেছি, যেখানে আমার জন্ম, আমার আঁতুড় ঘরের ভেজা-মাটি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বিকেল ৫টার দিকে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পান। তিনি তাঁর নেতৃস্থানীয় সহকর্মীদের গোপন আশ্রয়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকেও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেও তিনি তা করেননি। সন্ধ্যার পর পর ঢাকায় সামরিক অপারেশন শুরু হতে পারে, এ মর্মে একটি খবর ঢাকা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজিত জনগণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধক তৈরি করতে শুরু করে। রাত সাড়ে ১০টা থেকে সেনাবাহিনী শহরে ঢুকতে আরম্ভ করে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে শুরু হয় তাদের পূর্ব পরিকল্পিত 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযান। কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হন এর কিছুক্ষণ পরই ফোন অচল হয়ে যায়। রাত দেড়টায় পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে সেনা-অভিযান শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারের জন্যে একটি বার্তা পাঠান। স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত বার্তাটি নিচে হুবহু উদ্ধৃত হলো

স্বাধীনতার ঘোষণা

'এটাই হয়তো আমার শেষ-বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে '

(সূত্র : বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা-বঙ্গবন্ধু স্পিকস, ১৯৭২ এবং তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ)

পরিশিষ্ট ২

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এক সভায় মিলিত হয়ে গণপরিষদ গঠন করেন এবং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সমর্থন ও অনুমোদন করে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করেন. এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই হচ্ছে ১৯৭২ সালে গণপরিষদে প্রণীত সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

(মুজিবনগর, বাংলাদেশ, ১০ই এপ্রিল ১৯৭১)

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে

স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণ-পরিষদ গঠন করে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক-মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন, রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমতা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন, রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম

হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

পরিশিষ্ট ৩

ইতিহাস-বিকৃতি : প্রফেসর সেলিনা পারভীনের কথা

'আমার শুভেচ্ছা নিবেন। পৌষের সকালে মিষ্টি রোদ উষ্ণ আমেজ আপনাকে পাঠালাম। আপনার সাথে আলোচনা মোতাবেক নিচে কিছু তথ্য দিলাম।
যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলো (৯৬-০১) তখন অনেকটা আশা নিয়ে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে অজানা তথ্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপিত করেছিলাম। কেননা যখন ৯১-৯৫ সংসদে ইতিহাস বিকৃতি চর্চা চলছে আওয়ামী সাংসদদের প্রতিবাদ যথেষ্ট থাকলেও তথ্য বিচ্যুতি থেকে যাচ্ছিল। বস্তুত পক্ষে জিয়া কর্তৃক গঠিত নয় সদস্য বিশিষ্ট স্বাধীনতার ইতিহাস ও দলিল সংকলন কমিটির কাজ, যা জিয়ার আমলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত (যদিও কয়েক খণ্ড), সেটাই প্রমাণ করে যে, ইপিআর ওয়ারলেস থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ২৫শে মার্চ গভীর রাতে প্রচার করা হয়। কিন্তু কারা কিভাবে প্রচার করেছিল, সেই তথ্যটুকুর অভাব ছিল। আমাদের প্রয়াস ছিল সেই বিচ্যুতিটুকু পূরণ করার। এই লক্ষে আমার বন্ধু হিফজুর রহমান বাবুলকে বলেছিলাম ঢাকার কোনো খবরের কাগজে ইতিহাসের এই অংশটুকু তুলে ধরতে। সে জনকণ্ঠ ও সংবাদে এবং দেশের বাহিরে জাপান ও জার্মানীতে এই তথ্যগুলি প্রকাশ করেছিল বস্তুত পক্ষে এই প্রকাশনা তৎকালীন বিডিআর প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হিফজুরের লেখা ছাপা হবার পর রাজশাহী বিডিআর থেকে এক ক্যাপ্টেন ৬/৭ জন বিডিআর সদস্য সহ অফিসিয়ালি আমাদের বাড়ী খুঁজে বের করে দেখা করেন এবং জানান যে, তদন্ত শুরু হয়েছে। তারপর নিয়মিত বিরতিতে রাজশাহী বিডিআর সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল জাবেদ, সেকেন্ড ইন কমান্ড লে. কর্ণেল ইকবাল আমার মায়ের সাথে আমাদের বাসায় দেখা করেন। সরাসরি এবং টেলিফোনে ইঁনারা বিভিন্ন তথ্য চান। আমাদের জানা যা কিছু সবই তাঁদের জানানো হয়। ইঁনাদের সাথে দু'বার আসেন আমার বাবার সাথে কাজ করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তিনি জানান, এতদিন ইপিআর মেসেজকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এখন অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসছে এবং তথ্যের ফাঁক ফোকরগুলো ভরাট হচ্ছে এখন এটা প্রমাণিত খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ তথ্য বেরিয়ে আসবে। এখন সবাই বুঝতে পারছেন স্যার (আমার বাবা) এই মহান কাজটি করেছেন
এ সময়ে '৯৮ এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে (সম্ভবত) বিডিআর দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে আমার মাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এমনিতেই '৭২ থেকে '৮৮ পর্যন্ত শহীদ ইপিআর পরিবারকে যেভাবে দাওয়াত দেয়া হত, তা মায়ের

নামেও আসতো। '৭১' থেকে '৯৭ পর্যন্ত কোনো নিমন্ত্রণ মা পাননি, যদিও শহীদ পেনশন নিয়মিত পান। '৯৮-এর নিমন্ত্রণ এল আন্তরিকভাবে সুন্দর কার্ডে যা সাধারণত মন্ত্রী/হাই অফিসিয়াল এবং ঐ পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার হয়। মা চলাফেরায় অক্ষম, সেক্ষেত্রে কর্ণেল জাবেদ ঢাকায় কথা বলে মায়ের বদলে আমার ও আমার স্বামীর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অনুমতি দেন। কর্ণেল জাবেদ ঐকান্তিকভাবে চেয়েছিলেন আমাদেরকে উনার সাথে নিয়ে যেতে; কারণ আমার মায়ের সাথে নাকি প্রধানমন্ত্রী (মাননীয়া শেখ হাসিনা) ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করতে চান। আমরা জানাই যে, আমরা পরে যাব। তখন কর্ণেল সাহেব বলেন, ঢাকা পৌঁছেই যেন পীলখানায় যোগাযোগ করি। সে মোতাবেক আমরা যোগাযোগ করলে পীলখানায় এক নম্বর থেকে অন্য নম্বরে যোগাযোগ করতে বলে

একটা কথা এখানে বলে রাখি যে, যখন রাজশাহী বিডিআর আমাদের সাথে আলোচনা চালাচ্ছে, তখন টেলিফোনে পীলখানায় কর্মরত কর্ণেল লেনিন কামাল বলে এক ব্যক্তি (উনি নাকি ইপিআর মেসেজ এর অফিসিয়াল তদন্তে ছিলেন সেসময়) আমার এবং মায়ের সাথে ৫/৬ বার একই তথ্য বার বার জানতে চান। প্রশ্ন সব উনিই করতেন। প্রশ্নের ধরন বদলালেও উত্তর কিন্তু একটাই হতো। ঢাকায় আমরা তাঁকেও যোগাযোগ করি, টেলিফোনে তিনি জানান "আপনাদের প্যারেডে যাবার প্রয়োজন নেই" এবং এখানেই ইতি।

আমরা ক্ষোভে বেদনায় রাজশাহী ফিরে আসি। কাউকে জানাইনি, শুধু প্রফেসর মুনতাসীর মামুন-কে আমি এসব জানাই দু'টি কারণে (১) সঠিক ইতিহাসের স্বীকৃতির জন্য (২) মা কোন দিন বাবার জন্য কিছু না বললেও বিডিআর কর্তৃক এই আয়োজনে একটু আশা করেছিলেন বাবার নামটা পীলখানায় শহীদ মিনারের ২নং স্থানে এবং সাভার স্মৃতিসৌধে ২৮০ তম স্থানে থাকলেও এবার হয়তো আরো একটু প্রচার পাবে

আমরা মনে করি, ইপিআর ওয়ারলেস থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রচার সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যাদি যদি সঠিকভাবে সে সময় স্বীকৃত হতো, তাহলে আমাদের ইতিহাস নিশ্চিত তথ্যসমৃদ্ধ হতো। পরবর্তীতে বিএনপি ও অন্যান্য সমমনা দলগুলো বলার সুযোগ পেতনা যে, ইপিআর মেসেজ-এর অস্তিত্ব নেই।

আমরা মনে করি, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় (৯৬-২০০১) বিএনপি সমর্থিত বা জামায়াত সমর্থিত বিডিআর অফিসাররা সচেষ্ট ছিল এই তথ্য নষ্ট করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কর্ণেল লেনিন কামালকে এজন্যে দায়ী মনে করি। আমাদের তথ্য ছিল অসমন্বিত, টুকরো টুকরো আর ঐ সুযোগে ভদ্রলোক এই পর্যায়টিকে অসম্পূর্ণ রাখেন। এখানে আরও একটু জানাই--, স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু বিডিআরকে ভারতের বিএসএফ এর মত স্বতন্ত্র বাহিনী করতে চেয়েছিলেন, যারা আর্মির নিয়ন্ত্রণে থাকবেনা (পাকিস্তান আমল থেকে এখন পর্যন্ত বিডিআর প্রেষণে প্রেরিত আর্মি অফিসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত),

বরঞ্চ তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো থাকবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সামরিক পরামর্শদাতারা পূর্বানুভূতি থেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সে মোতাবেকই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটা নিয়ে তদানীন্তন ইপিআর এবং বর্তমান বিডিআর বাহিনীর একটা ক্ষোভ রয়েছে। তবে বিডিআরদের ভেতর থেকে কিছুটা প্রমোশন দিয়ে এই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা হয়েছে। আমরা মনে করি আর্মি স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিজ ক্রেডিটে নেয়ার জন্য ইপিআর ওয়্যারলেস যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিল, বিডিআর-এ কর্মরত আর্মি অফিসাররা এটা চায়নি বস্তুতপক্ষে '৭৫-পরবর্তী সরকারদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিকৃতি এরই ধারাবাহিকতা ।
যেদিন পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাসদস্যদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেইদিন থেকে সেনাবাহিনীর চিন্তা-চেতনায় পাকিস্তানী ভাবধারার সঞ্চার ঘটতে থাকে। তখন থেকেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা একটি বিশেষ দিকে চালিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়
উল্লেখযোগ্য যে, অতঃপর '৯৮ এর স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিকে বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ না করে জোড়াতালি দিয়ে পরিবেশন করা হয়। যেমন ওয়্যারলেসে পাঠানো মেসেজ রিসিভ করেছে দিনাজপুর বিওপি, তার সচিত্র সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে; কিন্তু কে কোথা থেকে পাঠাচ্ছে সেটা পরিষ্কার করা হয়নি এছাড়াও স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজের বাহিরেও আরও কিছু তথ্য সুবেদার মেজর শওকত আলী বিডিআর সদস্যদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ঘোষণা সহ এই মেসেজগুলিও ইপিআর এর বিভিন্ন সেন্টার ও বিওপি রিসিভ করেছিল। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এগুলি তুলে ধরা হয়নি। বিডিআর-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর পক্ষে তাদের রেকর্ড রুমের তথ্য ভাণ্ডারের সাহায্যে সমগ্র ঘটনার একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন করা খুবই সহজ ছিল; আর ঐ তদন্ত রিপোর্ট প্রচার পেলে জোট সরকার পারতো না তথ্য সন্ত্রাসকে অবাধ ও নির্লজ্জভাবে আলগা করতে, ইতিহাস বিকৃত করতে ।
আপনাকে মূলত যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তা হল ইতিহাস বিকৃতি তথা গতিধারা পাল্টে দেয়ার প্রচেষ্টা বিভিন্নভাবেই চলছে। আজকাল দেখা যায় সব কিছুকেই সরলিকরণ করতে গিয়ে ন্যায় অন্যায়কে একই পাল্লায় তোলার চেষ্টা চলছে। আর তা চলছে নিরপেক্ষতার নামে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকা মানে অন্যায়কেই সমর্থন করা। যেমন ঢালাওভাবে বলা হয় দুই নেত্রী কেউ কারো সাথে কথা বলেন না। কিন্তু একই সাথে এই কথাটি কেউ যেন মনেও রাখতে চান না যে, এক নেত্রীর প্রায় সমগ্র পরিবার নির্মমভাবে নিহত হওয়ার দিনটিকে পরিহাস করে আরেক নেত্রী কল্পিত জন্ম উৎসব পালন করেন যতক্ষণ ঐ নেত্রীর এই লজ্জাবর্জনক মনোভাব পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ তার সাথে কি সৌজন্য আলাপও করা যায়? এই ধরনের মন

মানসিকতা সম্পন্ন লোক দলের ভেতরে ও বাহিরে বিভিন্ন পর্যায়ে থাকার কারণে ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটাই নির্মম সত্য। কেননা সত্য বলার লোকদের চাইতে মিথ্যাচারীদের তাদের বক্তব্যের পেছনে লেগে থাকার প্রয়াস অনেক বেশি। হয়তো এতে কিছু প্রাপ্তিযোগ জড়িত।

দাদা, সত্য বলতে কি মনের ক্ষোভে কথাগুলি আপনাকে লিখে জানালাম। হয়তো আপনার মনোবেদনা এতে বাড়বে, আপনার কষ্ট হবে। তবুও আপনার সাথে আমাদের বেদনার শেয়ার করলাম কেননা, টিভিতে সমাজের কোনো একটি বিশেষ অংশকে 'বিশেষ বিশেষণ' দেয়ার বিপক্ষে আপনাকে সোচ্চার হতে দেখেছি। আপনাকে সেজন্য ধন্যবাদ।

সবিনয় ইতি,
সেলিনা পারভীন

পরিশিষ্ট ৫

শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রপত্র

জন্মোৎসবের বাণী

'অস্তাচলের প্রান্ত থেকে তরুণ দলকে গেলেম ডেকে
উদয় পথের পানে,
ক্লান্তপ্রাণের প্রদীপশিখা পরিয়ে দেবে জয়ের টীকা
নতুন জাগা প্রাণে।'

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের নেত্রকোণায় আমার জন্মদিনের উৎসব যেমন পরিপূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। পুরীতে আমাকে প্রত্যক্ষে সামনে নিয়ে সম্মান করা হয়েছিলে। কিন্তু নেত্রকোণায় আমার সৃষ্টির অপ্রত্যক্ষ আমাকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কবির পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশি সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করত কে? এই উপলক্ষে বৎসরে বৎসরে তুমি আমার গানের অর্ঘ্য পৌঁছিয়ে দিচ্ছ তোমাদের পল্লীমন্দিরে ভোগমণ্ডপে এও কম কাজ হচ্ছে না। আমার জন্মদিন প্রতিবৎসর তোমাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে উৎসব, আমাকে এনে দিচ্ছে ক্লান্তির ডালিতে নূতন বোঝা এবার পাহাড়ে এখনো দেহমনে অবসাদ আসক্ত হয়ে আছে। পৃথিবীজুড়ে যে শনির সম্মার্জনী চলছে— বোধ হচ্ছে তার আঘাত এসে পড়চে আমার ভাগ্যে

দেখা হলে নৃত্যকলা সম্বন্ধে মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে আলাপ করব

ইতি ২৫/৫/৩৯
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ৬

শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে মোহনগঞ্জ থানার বাহাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রমণীকিশোর মজুমদার ছিলেন আইনজীবী। নেত্রকোণার সাতপাইয়ে থাকতেন। কলকাতায় পড়াশোনার করার সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী হয়ে পড়েন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএসসি পাস করার পর পিতার ইচ্ছায় আইন পড়াশোনা করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথের কাছে সংগীত শিখতে থাকেন এরপর তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ রূপে নিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বিজ্ঞানের রসায়ন থেকে রাগ-রাগিনীর রসায়নে।'

নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন সম্পর্কে শৈলজারঞ্জনের ভাষ্য

'১৯২১ সাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে নেত্রকোণায় গিয়ে ইচ্ছুক ছেলে মেয়েদের গান শিখাতাম। ১৯৩০ সালে প্রথম দত্ত হাই স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করি। সমগ্র বাংলাদেশে এর আগে কোথাও রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্র জয়ন্তী করেছি। পরে আর পারিনি।'

তাঁর কাছে থেকে এবং সেই সময় যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন, যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় শৈলজারঞ্জনের পরিচালনায় বিগত ত্রিশের দশকে নেত্রকোণায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য সহ রবীন্দ্রনাথের নানা রসের গান, নাচ ও আবৃত্তির মাধ্যমে দৃষ্টান্তযোগ্য মনোরম অনুষ্ঠান হতো। তৎকালীন সময়ের রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে শিক্ষিতা মেয়েরাও এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিত নানা সমালোচনা, শাসানি ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে প্রমীলা চৌধুরী গেয়েছিলেন, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে'।
আর এতে কঠোর সমালোচনা করে শৈলজারঞ্জনকে তিরস্কৃত করা হয়েছিলো। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে ফিরোজা 'মম মন-উপবনে চলে অভিসারে'* সঙ্গীতটি পরিবেশন করায় গোঁড়া মুসলিম সমাজ তাকে একঘরে করতে চাইলো।

**(রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের এই গানটি আমি আজঅব্দি কারও কণ্ঠে কখনও শুনিনি। –নির্মলেন্দু গুণ)।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসব শুনে শৈলজারঞ্জনকে বলেছিলেন, 'এ তুমি করেছ কী? তোমার যে গলা কাটেনি '

এতো গেলো প্রতিকূলতার কথা, কিন্তু অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তৎকালীন শিক্ষিত যুবক-যুবতী ও ছেলে-মেয়েরা শৈলজারঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য-আলেখ্য প্রভৃতিতে অংশও নিয়েছিলো। স্বয়ং শৈলজাদা, প্রয়াত তুষার রঞ্জন পত্রনবিশ, প্রয়াত সলিল বর্ধন, ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার প্রমুখের কাছ থেকে জানা গিয়েছে- সর্বশ্রী সুরেশ মজুমদার, সুধীরচন্দ্র সেন, নিখিল বর্ধন, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধীর ঘোষ, বিমল চৌধুরী, সলিল বর্ধন, ডা. শশীধর, সৌরীন হোম রায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, যতীন্দ্র ঘোষ, কামুমণি, সিন্ধুবালা, রাবু চৌধুরী, মায়া চৌধুরী, শৈলবালা দেবী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ— যথা ১৯৩০ সালে মহকুমা শাসক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে হরিয়ানার রাজ্যপাল), মুনসেফ অচিন্ত্যকুমার সেন, করুণাকেতন সেন, তাঁর স্ত্রী সুধা সেন, চন্দ্রনাথ স্কুলের রেক্টর সুখরঞ্জন রায়, দত্ত হাই স্কুলের রেক্টর জ্ঞানেশ চন্দ্র রায় প্রমুখ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানটি হতো দত্ত হাই স্কুলের পূর্ব দিকের লম্বা ঘরটিতে পার্টিশন সরিয়ে দক্ষিণপ্রান্তে তক্তপোষ (চৌকি) জোড়া দিয়ে মঞ্চ তৈরি হতো। দেবদারু পাতা দিয়ে মঞ্চের সামনের দিকটা সাজানো হত। মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়া ও অন্যান্য ফুলের গুচ্ছ মঞ্চের পশ্চাতে একটা সাদা পর্দার সামনে সজ্জিত বেদীতে রাখা হতো কবি-প্রতিকৃতি। মঞ্চের সামনের দিকে থাকত একটা কালো পর্দা। বিদ্যুত তখন ছিলো না। কয়েকটি হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হত। মঞ্চসজ্জা এবং সাজ-সজ্জায় থাকতেন ডা শশী ধর, সৌরীন হোম রায় প্রমুখ যন্ত্রসংগীত বেশি থাকতো না এসরাজ, হারমোনিয়াম, বেহালা, তবলা ও মৃদঙ্গ

শৈলজাদা পরবর্তী সময়ে ১৯৪১ সালের পর তাঁর সুযোগ্য অনুসারীগণ এবং রিক্রিয়েশন ক্লাবসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ডা. অমিয় চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন বিশ্বাস, দুর্গেশ পত্রনবিশ, মিহির মজুমদারসহ অনেকে যোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান করেছেন। নেত্রকোণার মেয়েরা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে উকিলপাড়ার বাণীদির (ডা. অমিয়কৃষ্ণ চৌধুরীর বোন) উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং পরিচালনায় তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে নাচে গানে আবৃত্তিতে দর্শনীয় অনুষ্ঠান হয়েছে।

উকিলপাড়ার কল্যাণী সহ অংশগ্রহণকারী কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন ঐ সব অনুষ্ঠানে আমি নিজেও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার মনে আছে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে আমার প্রথম আবৃত্তি 'প্রশ্ন' কবিতা। তারপর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'আফ্রিকা', 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি কবিতা অতীন হোম রায় ও চিনুদা তখনকার নেত্রকোণার সফল আবৃত্তিকার ছিলেন

— সত্যকিরণ আদিত্য

পরিশিষ্ট ৬

রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের জন্মদিনও নেত্রকোণাতেই প্রথম পালিত হয়েছিলো কি না– এই প্রশ্নের উত্তরে নেত্রকোণার সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী অশিতিপর শ্রীদুর্গেশ পত্রনবীশ আমাকে জানিয়েছেন, 'খুব সম্ভবত তাই হবে'। তিনি আমাকে যে তথ্য দেন, তা হচ্ছে এরকম :

১৯৪২ সালে নেত্রকোণায় প্রথমবারের মতো নজরুলজয়ন্তী পালিত হয়। তিনি নিজেই সেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন। রিক্রিয়েশন ক্লাব নামে নেত্রকোণায় তখন একটি সাংস্কৃতিক ক্লাব ছিলো। ঐ ক্লাবটি ছিলো তেরী বাজারের মোড়ে লক্ষ্মণদাস নামে একজন উকিলের দ্বিতল বাড়িতে। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। গৌরী দত্ত নামে একজন মেয়ে সেই অনুষ্ঠানে নজরুলের রাগ-প্রধান গান গেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন সত্যকিরণ আদিত্য, কুমুদ বিশ্বাস (সম্প্রতি কলিকাতায় লোকান্তরিত) ও খান বাহাদুর কবিরুউদ্দিন সাহেব।

পরের বছরও ১৯৪৩ সালে নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয়েছিলো নেত্রকোণা অফিসার্স ক্লাবে। তারপর পত্রনবীশ বাবু কলকাতায় গিয়ে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য কারাগারে চলে গেলে নেত্রকোণায় নজরুলজয়ন্তী পালন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট ৭

কয়েকটি চিঠি

রিভিজিটিং দ্য হিস্ট্রি উইথ গুণ

গুণ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ধারাবাহিক যে স্মৃতিতর্পণ করেছেন, সে বিষয়ে পাঠকের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। প্রতিটি এপিসোড/কিস্তি পড়ার পর আমারও অনেকবার মনে হয়েছে গুণকে ধন্যবাদ জানাতে। কিন্তু কখনোই হয়ে ওঠেনি। এবার আর কলম না ধরে পারলাম না– সত্যিই তিনি এক মহত্তর কাজ করে চলেছেন।

গুণ তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা অনেক লিখেছেন। এর বেশির ভাগই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এমন গুরুত্বপূর্ণ ও জাজ্বল্যমান অধ্যায়ের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ছিলেন, টের পাইনি। বিশেষ করে "জিঞ্জিরা জেনোসাইড" বিষয়ে যে বিস্ফোরক তথ্য তাঁর লেখায় পেলাম, তা অতুলনীয়।

২৫ মার্চ রাতের ঢাকার গণহত্যার কথা যেভাবে আলোচিত ও চর্চিত হয়েছে, সেভাবে ঢাকার অদূরে সংঘটিত জিঞ্জিরা গণহত্যা আলোচিত হয়নি। পরিহাসের মতো শোনালেও সত্য যে কালচক্রে নির্মলেন্দু গুণ এই গণহত্যার প্লটের মধ্যে ছিলেন। তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং দক্ষ ইতিহাসবিদের মতো প্রায় হারাতে বসা সংগ্রামোজ্জ্বল ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য, সাহসিকতা ও বীরত্বে রচিত সেদিনের কাহিনী আমাদের অবিরাম জানিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। যে দেশের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, সে দেশে ব্যক্তি গুণদের আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা জরুরি।

হতে পারে আমার জন্ম এই জিঞ্জিরা এলাকায় বলে এখন কলম ধরলাম। কিন্তু গুণ যা লিখে চলেছেন, তা তো আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বয়ান। গত সপ্তাহে মেইল খুলে দেখলাম, আমার ইতালিয়ান বন্ধু স্টিফানো জানাতে চেয়েছে, আমি ইদানিং কি করছি? এক কথায় তাকে উত্তরে বললাম, 'রিভিজিটিং দ্য হিস্ট্রি উইথ গুণ'।

রণজিত পাল

কলাতিয়া, কেরানীগঞ্জ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত।

প্রিয় নির্মলেন্দু গুণ

১৯৭১ নিয়ে ভিন্নরকম লেখা ভিন্নরকম মূল্যায়ন। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অহেতুক বিতর্কের অবসান চাই। এ কারণেই নির্মলেন্দু গুণের নির্মোহ এবং বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়নকে স্বাগত জানাই। আমাদের অধিকাংশ লেখক গবেষকরা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না। একপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে দেবতা বানায় আর জিয়াউর রহমানকে বানায় ভিলেন। অন্যপক্ষ করে উল্টোটা। কিন্তু আমরা সাধারণ জনমানুষ জানতে চাই এমন ইতিহাস, যেখানে যার যা প্রাপ্য সেটা করা হবে। যেমনটা নিজের আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বলছেন নির্মলেন্দু গুণ। নির্মলেন্দু গুণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-সালাম নমস্কার। প্রিয় নির্মলেন্দু গুণ আমরা আপনার কাছ থেকে আরো অনেক ঘটনা, সত্য ঘটনা জানার অপেক্ষায় আছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না। ১৯৭১-এর ইতিহাসের সঙ্গে জানতে চাই আপনার জীবনের মজার মজার ঘটনাগুলোও।

শরীফ হোসেন, রাসেল মাহমুদ,
মীর আশরাফ আলী, জিনাত রহমান, আফরিনা বেগম
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

গুণদার গুনীপনা

হঠাৎ করে পাঠককে চমকে দেয়া যেন সাপ্তাহিক ২০০০ এর স্বভাব। তবে গত দুই সংখ্যায় দুটি চমক পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব আনন্দিত। এক নম্বর হলো নির্মলেন্দু গুণের নিজের অভিজ্ঞতায় মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর বয়ান। আমি মনে করি, যেকোন পাঠকের জন্য এটি বহুল আরাধ্য একটি বিষয়। কারণ গুণদার ব্যাখ্যাভঙ্গি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণী ঝোঁক বেশ সুপাঠ্য ও নির্ভর যোগ্য। আশা করি তিনি তাঁর এই রচনা বিরতিহীন জারি রাখবেন।

যোবায়রা রত্মা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।